১৩৪৫১

সাহিত্যে
রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ

প্রথম পর্ব

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ভূমিকা

রামমোহন ভারতের প্রাণগঙ্গার নতুন ভগীরথ। রবীন্দ্রনাথে সেই প্রাণ-প্রবাহিণীর সীমাহীন সাগর-সঙ্গম। এ তো শুধু ব্যক্তিজীবনের জড়তা থেকে জাগরণ নয়, এ ঋদ্ধির পথে জাতির পরম তীর্থযাত্রা। কিংবা বলা যায়, রামমোহন প্রভাতের সূর্যোদয় আর রবীন্দ্রনাথ মধ্যাহ্নের পূর্ণদীপ্তি। জহ্নু-কন্যার উৎস থেকে মোহানায় অগ্রগতি বা উদয়ভানুর মধ্যদিনের মিহিরে পরিণতি উনিশ শতকের বাঙালীর নতুন জীবনায়নের রূপক। তখন জাতীয় অস্তিত্বের নানা দিগন্তে বিচিত্র আলোকসজ্জা, অচেতচিত্তে চৈতন্যের বহ্নি-সঞ্চার। সাহিত্যও এই আলোর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। গদ্যে রামমোহন, ভবানীচরণ, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, ভূদেব, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র ইত্যাদি যেন এক একটি আলোকস্তম্ভ। ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের দ্বিধা কাটিয়ে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন ও বিহারীলাল কাব্যের ছন্দে আনন্দের গান গেয়েছেন। নাটকের পাদপ্রদীপের আভায় উদ্ভাসিত মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইত্যাদি। আর রবীন্দ্রনাথে শুধু সাহিত্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম নয়, ত্রিধারার দিগন্তপ্রসারী বিস্তার। এই তো বাঙলা সাহিত্যের সোনার ফসলের ইতিহাস, সাহিত্যে বাঙালীর আত্মোপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ বা রেণেসাঁস সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। সম্প্রতি কোন কোন মহলে নানা যুক্তি দেখিয়ে একে অস্বীকার করার চেষ্টা দেখা যায়। রেণেসাঁস বলতে কী বোঝায় তা নিয়েও বাক্-বিতণ্ডার অন্ত নেই। আবার কেউ কেউ য়ুরোপের ছকে বাঙলার রেণেসাঁসকে মিলিয়ে নিয়ে তখনকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় অত্যুৎসাহী। এই দুই দলের কারো সঙ্গেই আমার মতের পুরো মিল নেই। আমি যেমন পাশ্চাত্যের ঢঙে ও আদর্শে বাঙলার রেণেসাঁসকে হুবহু মিলিয়ে দেখার পক্ষপাতী নই, তেমনি উনিশ শতকের জাতীয় উজ্জীবনকে নিছক মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভাববিলাস বলে উড়িয়ে দিতে চাইনে। সত্য বটে, রামমোহন থেকে যে ইংরেজী প্রভাব আমাদের দেশে যুগান্তর আনলো তা চিরাগত লৌকিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও খাপছাড়া ;

তাতে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার বদলে মুখ্যতঃ ইংলণ্ডের অর্বাচীন ভাব-তরলতার পরিচয় বেশি। শুধু তাই নয়, এ জাগরণকে কম-বেশি নাগরিক মধ্যবিত্তের খণ্ডিত জীবনায়নও বলা যেতে পারে। এ সবই ত্রুটি, কিন্তু তা সত্ত্বেও নঙর্থক দৃষ্টি বর্জন করা উচিত। ষোড়শ শতকে চৈতন্যের জীবন ও কর্ম একটা আলোড়ন এনেছিলো, কিন্তু সেই আলোড়ন লৌকিক তাগিদ থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্যেই প্রাণবান ও সমৃদ্ধ। সেই দূর অতীতের বৈষ্ণব রেনেসাঁসের পরে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রাণাবেগ স্তিমিত ও স্তব্ধ হয়ে এলো, টিকে রইলো একটা বন্ধ্যা তামসিকতা নিয়ে বাঙলা দেশের গয়ংগচ্ছ চলার আভ্যাসিকতা। এই সৃষ্টিহীন প্রাণপ্রবর্তনাহীন জাতীয় চরিত্রে—হোক না কেন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চরিত্রে—পুরুষার্থ ও জীবিত-চেতনা আবার সঞ্চারিত হয় উনিশ শতকে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই সময়ে একটা বস্তুনির্ভর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির আত্মপ্রকাশ এবং নানামুখিন চিন্তা ও কর্মের সূচনা। সমাজের দাসত্ববন্ধন থেকে মন ও বুদ্ধির মুক্তি শুধু সমষ্টির ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তির ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তাই উনিশ শতকের বাঙলার নব জাগরণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিতন্ত্রের স্ফুরণ। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে চিন্তা ও কর্মে যে সাড়া এলো, তা-ই শতাব্দীর শেষদিকে রবীন্দ্রনাথের সর্বাশ্রয়ী ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে একটা বহুব্যাপক জাতীয় চেতনা ও উপলব্ধিতে পরিণত। অতএব আমার মনে হয়, উনিশ শতকী রেনেসাঁসকে বাঙলাদেশের ইতিহাসের দিক থেকে যে কোন ভাবেই হোক স্বীকার করে নেওয়া ভাল, তার সম্পর্কে উদাসীনতা বা অত্যুৎসাহ উভয়ই বর্জনীয়।

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। রামমোহন থেকে রেনেসাঁসের সূচনা কেন ধরা হলো? ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সময় থেকে কেন নয়? এর উত্তরে বলতে চাই, যে সমন্বয়ের আদর্শ (synthesis) আমাদের রেনেসাঁসের মূল কথা, রামমোহনে তার প্রথম নিদর্শন। তাঁর মতো কর্মীপুরুষ ও চিন্তাবীর জন্মেছিলেন বলেই আমাদের জাতীয় জীবনের নানা বৃত্তে আলোড়ন আসে, তাঁর সামাজিক চেতনা ও বিশ্বচেতনাতেই আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। এঁর তুলনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা নগণ্য। দ্বিতীয়তঃ, যে হিন্দুকলেজ রেনেসাঁসের ইতিহাসের মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু তার প্রতিষ্ঠা ও রামমোহনের কলকাতায় আগমনের সময়-সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। তাই রামমোহন থেকে আমাদের আলোচনার শুরু। নিছক সাহিত্যের দিক থেকে রামমোহনের চেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের দান অধিক, কিন্তু এ গ্রন্থে সাহিত্যকে জাতীয়

জীবনের অন্যান্য দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাইনি বলেই মৃত্যুঞ্জয় থেকে আলোচনা আরম্ভ হয়নি। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে মনীষীদের জন্ম, তাঁরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই সাহিত্যিক হয়েছেন। তাঁদের সৃষ্টির পেছনে রসের তাগিদ ছিলো না, হিতব্রতের একটা উপায় হিসেবেই সাহিত্য তাঁদের কাছে অনুশীলনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

প্রথম পর্ব যেখানে শেষ করেছি, তার একটা তাৎপর্য আছে। কাব্যে মধুসূদন, উপন্যাসে বঙ্কিম ও নাটকে মধুসূদন-দীনবন্ধু শুধু বিষয়-ভাবনা নয়, রূপকর্মের দিক থেকেও পুরো আধুনিক। তাঁদের শিল্পীসত্তা ও সৃষ্টিপ্রতিভা অসংশয়িত ও অ-তর্কিত। শুধু সাহিত্য রূপেও তাঁদের রচনা সুসিদ্ধ, জীবনের অন্যান্য কীর্তি থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে উপভোগ করা যায়। কিন্তু তার পূর্ববর্তী সাহিত্য সম্পর্কে একথা ঠিক বলা যায় না। রামমোহন থেকে রঙ্গলাল পর্যন্ত সাহিত্যের ধারা বৃহত্তর জাতীয় চিন্তার অনুগামী এবং সেদিক থেকেই তাদের সার্থকতা। ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে (যেমন রঙ্গলাল) লেখকদের সৃষ্টিশীলতা পুরো প্রশংসা দাবি করতে পারে না। ইংরেজী সাহিত্যের রেস্‌টোরেশান্‌ যুগটা যেমন ছিলো প্রধানতঃ গদ্যের, তেমনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। বিচিত্র জ্ঞানচর্চা, বিতর্কমূলক আলোচনা, যুক্তি ও ব্যঙ্গের অনুশীলন, সাময়িক পত্রের প্রভাব। রসকল্পনা, হৃদয়ানুভূতি ও রোমান্টিক ধ্যান-ধারণা নয়—বুদ্ধিধর্মিতা, যুক্তিপ্রবণতা, জ্ঞানান্বেষণ ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের জয়জয়কার। ইংলণ্ডে যেমন ষ্টীল, এডিসন, ডেফো, গিবন, বার্ক, জনসন, সুইফ্‌ট, পোপ তেমনি বাঙলা দেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল ইত্যাদি। ওদেশে ট্যাটলার ও স্পেকটেটর, এদেশে সমাচার-দর্পণ, সম্বাদ-কৌমুদী, তত্ত্ববোধিনী, সংবাদ-প্রভাকর, বিবিধার্থ-সংগ্রহ ইত্যাদি। তুলনা টানবার জন্য নয়, উনিশ শতকের প্রথমাংশের বাঙলা সাহিত্যের স্বরূপ বোঝানোর জন্যই অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তবে স্বীকার করতেই হবে, সাহিত্যের দিক থেকে আলোচ্য যুগের প্রথমার্ধের চেয়ে দ্বিতীয়ার্ধ অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

গ্রন্থের আলোচনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কারণ সেই ব্যক্তিতন্ত্রের স্ফুরণের যুগে ব্যক্তিত্বের মহারথেই সাহিত্যের শোভাযাত্রা। সুতরাং রচিত গ্রন্থমাত্রেরই তালিকা এ বইয়ে পাওয়া যাবে না। যেভাবে যতটুকু বললে লেখকদের

বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সহজ হবে, তেমনিভাবেই আলোচনা করেছি—তাঁদের পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীকে বিচারের বিষয় করিনি। তার জন্য পাঠকেরা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' দেখে নিতে পারেন। আর একটি কথা। আলোচ্য পর্বে নাটকের আলোচনা করা উচিত ছিলো, কিন্তু রচিত নাটকগুলির সঙ্গে কোন বড়ো ব্যক্তিত্ব (এমন কি নাটুকে রামনারায়ণও নন) জড়িত নেই বলে আমার এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচার-বিবেচনায় নাটকের কোন স্থান হয়নি। দ্বিতীয় পর্বে মধুসূদনের ভূমিকায় প্রথম পর্বের নাট্য-প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করার ইচ্ছা রইলো। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত 'অনাধুনিক (আধুনিক-পূর্ব অর্থে) সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ঐতিহ্য' মূল বিষয়-পরিকল্পনার প্রাক্-ভাষণ, এর সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে আধুনিক যুগের বিশিষ্টতা ধরা পড়বে। সুতরাং অধ্যায়টিকে অনাবশ্যক মনে না করলে খুশি হবো।

আমি সামান্য ব্যক্তি, পাণ্ডিত্যের অহমিকা আমার নেই, তা দাবি করার উপযুক্তও নই। উনিশ শতকের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি, তাতে ত্রুটি আছে কিনা পণ্ডিতেরা বলতে পারেন। তবে আমার দিকে থেকে এইটুকু বলার আছে, আমি ইচ্ছা করে ফাঁকি দিইনি, সততার সঙ্গে মতামত ব্যক্ত করতে চেয়েছি। গ্রন্থ-রচনায় আমার ঋণ সকলের কাছে, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে এপর্যন্ত যা পড়েছি তার প্রভাব হয়তো দুর্নিরীক্ষ্য নয়। আর প্রবন্ধগ্রন্থ মাত্রই বহু পাঠন-পাঠনের ফল, তা কথাসাহিত্যের মতো স্বকপোলকল্পিত হতে পারে না। কিন্তু উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিয়ে লেখাকে ভারাক্রান্ত করার পক্ষপাতী আমি নই, গ্রন্থশেষে এক বিরাট তালিকা দিয়ে নিজের পাঠের পরিধি জাহির করতেও আমার মন সায় দেয় না। তাই পরিশিষ্টে শুধু নামাবলী রচনা করে ঋণ স্বীকার করার চেষ্টা করেছি। আমার এই লেখা যদি যুগটিকে বুঝতে কিছুমাত্র সাহায্য করে তবেই আমি কৃতার্থ। এছাড়া আমার আর কিছু দাবি নেই, আর কোন প্রত্যাশা নেই।

এই গ্রন্থের নামকরণে পরামর্শ পেয়েছি অগ্রজ-প্রতিম অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের কাছে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার স্ত্রী গীতা সিংহ রায়ের অনুকূলতা ছাড়া নানা পারিবারিক দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত থেকে বইটি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। সহকর্মী অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দিয়েছেন, নানা ভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন অধ্যাপিকা

মঞ্জু সেনগুপ্ত। তাঁরা দু'জনই আমার স্নেহভাজন, তাই ধন্যবাদ দিয়ে আনুষ্ঠানিক কর্তব্য পালনের প্রয়োজন নেই। এই ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ-প্রকাশে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন মলয়েন্দ্রকুমার সেন, তাতে তিনি বাঙলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। বই সরবরাহ করে লেখায় সাহায্য করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের সুকুমার মিত্র, স্নাতকোত্তর বিভাগের রবীন্দ্রনাথ মিত্র ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সনৎকুমার গুপ্ত। তাঁদের ধন্যবাদ।

বিবেকানন্দ কলেজ
কলিকাতা-৮ জীবেন্দ্র সিংহ রায়
১২ই জানুয়ারী, ১৯৬০

সূচী

তপতী সোম

মাধবী বসু

মানসী পাল

সহোদরাসু

১ অনাধুনিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ঐতিহ্য

বাঙলা দেশের ভৌগোলিক সীমা একদিন বহুবিস্তৃত ছিলো। উত্তরে হিমালয় আর নেপাল-সিকিম-ভুটান, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা আর গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়, পশ্চিমে রাজমহল থেকে শুরু করে ময়ূরভঞ্জের অরণ্যভূমি। এই বিরাট প্রাকৃতিক সীমায় গড়ে উঠেছিলো প্রাচীন বাঙলার কয়েকটি জনপদ। তাদের নাম পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ ইত্যাদি। কখনও কখনও সাময়িক যোগাযোগ ঘটলেও এই সব জনপদ মোটামুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলো।

সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে রাজা শশাঙ্কের আমলে প্রথম বাঙলা দেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা হয়। তিনি বিচ্ছিন্ন জনপদগুলিকে একসূত্রে গাঁথবার সূচনা করেন, মালদহ-মুর্শিদাবাদ থেকে উৎকল পর্যন্ত নিজের শাসন বিস্তৃত করতে তৎপর হন। কালক্রমে জনপদগুলির মধ্যে পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এ-তিনটির মধ্যে আবার গৌড়ের মহিমা সবচেয়ে বেড়ে যায়। শশাঙ্কের আমল থেকে সেন রাজত্ব পর্যন্ত সকল রাজাই গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হওয়ার আশা পোষণ করতেন। কিন্তু গৌড় আপন ছত্রচ্ছায়ায় অন্য সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ করার বিপুল প্রয়াস করা সত্ত্বেও বঙ্গ আপন পৃথক সত্তা বজায় রাখতে পেরেছিলো। শুধু তাই নয়, সমগ্র বাঙলা দেশকে নিজের নামের আড়ালে ঢেকে রাখার যে গৌরব গৌড়ের কাম্য ছিলো, মুসলমান রাজত্বে বঙ্গকে সেই গৌরব অর্জন করতে দেখি। তারপর থেকে আমাদের দেশ গৌড় নামে নয়, বঙ্গদেশ নামেই পরিচিত।

দেশের পর আসে জাতির কথা। স্বীকার করতে হবে, বাঙালী জাতির ইতিহাস জটিল। এবং কিছুটা অস্পষ্ট। যে জনপদগুলি থেকে বাঙলা দেশের উৎপত্তি তা কোমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম ইত্যাদি নামগুলি প্রথমতঃ কোমবাচক ছিলো, কালক্রমে সেই সব কোমের অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম ইত্যাদি কৌম জনপদের সৃষ্টি করে। এই কোমগুলি অবশ্যই আর্যবংশ থেকে উৎপন্ন হয়নি। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, মগধ, চের ও পাণ্ড্য কোমদের 'পক্ষীবিশেষ' বলা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, পুণ্ড্র জনপদের লোকেরা 'দস্যু' মাত্র। 'বৌধায়ন ধর্ম-সূত্রের' মতে, পুণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ ইত্যাদি কোমের আবাস আর্যবহি-র্ভূত দেশে এবং সেখানে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আয়রঙ্গ সূত্রে আছে, জৈন ধর্মগুরু মহাবীর রাঢ়ে উপস্থিত হলে তাঁর ওপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। এই সব নানান উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, কোমগুলির বাস ছিলো আর্যদেশের অনেক বাইরে এবং আর্যদের সঙ্গে আর্যেতর বিভিন্ন কোমের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিলো না।

বাঙলাদেশের আর্যেতর বিভিন্ন কোমের জনসাধারণ প্রধানতঃ অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির মিলনে উৎপন্ন। এই কারণেই বোধহয় মনু-সংহিতা বলেছেন, পুণ্ড্ররা ব্রাত্য এবং দ্রাবিড়, শক, চীন ইত্যাদি জাতির সমপর্যায়ভুক্ত। অষ্ট্রিকগোষ্ঠী আগে বাঙলাদেশে বসবাস করতে শুরু করে, তার পর আসে অধিকতর সভ্য দ্রাবিড়গোষ্ঠী। আমাদের দেশের মাটিতে শুধু এই দুই গোষ্ঠীর মিশ্রণেই অনার্য পর্বের বাঙালী জাতির উৎপত্তি হয়নি, তার সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার মঙ্গোলীয় বা ভোটচীন জাতির কয়েকটি শাখা এসে মিলিত হয়েছে। সুতরাং প্রাক্-আর্য যুগের বাঙালী জাতির গড়নে তিনটি উপাদান ছিলো—অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়।

প্রাক্-আর্য যুগের এই তিনটি উপাদানের মধ্যে অষ্ট্রিকরা ছিলো প্রাচীন নিষাদ এবং বর্তমান কালের কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল,

বাঁশফোড়, মালপাহাড়ী ইত্যাদির পূর্বপুরুষ। এরা কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস ও তাম্রকেশ (এই অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর আগে নিগ্রোবট জনেরা এদেশে বাস করতো। তারা কালক্রমে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশে যায়। পশ্চিম সীমান্তবর্তী রাজমহলের বাগ্দী ও সুন্দরবনের নিম্নশ্রেণীর মৎস্য-শিকারীদের মধ্যে এখন নিগ্রোবটদের চিহ্নমাত্র আছে)। অন্যদিকে দ্রাবিড়রা দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘ ও মধ্যোন্নতনাস, মধ্যমাকৃতি, সঙ্কীর্ণ-কপাল, বাদামীবর্ণ। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ লোক, বিশেষ করে তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম ও কানাড়ীভাষীদের মধ্যে আজও এই ধারা প্রবহমাণ। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ গোষ্ঠীও দ্রাবিড়রক্তসম্ভূত। মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর ছিলো চ্যাপ্টা নাক, উন্নত গণ্ডাস্থি, বঙ্কিম চক্ষু, উদ্দণ্ড কেশ এবং কেশবর্জিত দেহ ও মুখমণ্ডল। উত্তরপূর্ব আসাম ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বোড়ো বা মেচ জাতি এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলের কোচ, রাজবংশী (বা বাহে), ত্রিপুরার চাকমা ও টিপ্‌রাই এবং আরাকান-চট্টগ্রামের মগেরা এদের বর্তমান পুরুষ।

বাঙলার জনসাধারণের এই অনার্যপ্রবাহে একদিন এসে মিললো আর্যধারা। কিন্তু বৈদিক দীর্ঘমুণ্ড আর্যরা (Inner Aryan) নয়, অবৈদিক যজ্ঞধর্মবিরোধী গোলমুণ্ড বহিরার্যরাই (Outer Aryan) বাঙলাদেশে বসতি স্থাপন করে। এদেরই বলা হয় অ্যাল্‌পো-দীনারীয় আর্য। বৈদিক আর্যদের মুখাবয়ব দীর্ঘ, সুদৃঢ় এবং সুগঠিত, নাসিকা সঙ্কীর্ণ ও সুউন্নত, মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ হলেও গোলের দিকে ঝোঁকবিশিষ্ট। কিন্তু অবৈদিক আর্যরা ছিলো গোলমুণ্ড উন্নতনাস। সুতরাং নরতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালী হচ্ছে—কোলিণ্ড (অষ্ট্রিক), মেলানিড (দ্রাবিড়), পূর্ব-ব্রাকিড (অ্যাল্‌পো দীনারীয় আর্য) ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণ মাত্র। এই বিচিত্র সংকর জনসাধারণ নিয়ে বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাসের পদসঞ্চার।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বাঙলার জনপ্রবাহে যে সব জাতি

আপন আপন রক্তধারা মিশিয়েছে, তাদের কথা বলা হলো। নানা ধারা ও উপধারার সংঘাত ও সমন্বয়েই বাঙালীর জন-সাংকর্যের সৃষ্টি, সন্দেহ নেই। কিন্তু যতক্ষণ না সেই জন-সাংকর্যের অন্তর্গত নানা বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক ঋদ্ধির সন্ধান নেবো, ততক্ষণ বাঙালীর সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণ করা যাবে না। অবশ্য সমন্বিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল মৌল-অমৌল উপকরণ এবং গুণাত্মক প্রকাশ সহজেই ধরা যায় না, কারণ সমন্বয়-প্রক্রিয়ায় তাদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে থাকে। সমন্বয়ের এমনি নিয়ম যে, নূতনতর সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রাচীনতর সংস্কৃতির কোন স্পষ্ট চেহারা বর্তমান না-ও থাকতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এমন অনেক বস্তুর সৃষ্টি হয় যার মধ্যে সৃষ্টির উপকরণগুলিকে আর স্পষ্টতঃ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেডিয়াম ও ক্লোরিণের রাসায়নিক সংমিশ্রণে লবণ তৈরী হয়, অথচ লবণের মধ্যে সোডিয়াম ও ক্লোরিণের আলাদা কোন অস্তিত্ব বা স্থান থাকে না। এই উদাহরণ সংস্কৃতির রূপক। সমাজ ও সংস্কৃতির বাস্তব উপকরণের সমবায়ে যে নবতর সমাজ ও সংস্কৃতির জন্ম, সেখানে পূর্বতন সংস্কৃতি আপনাকে নিঃশেষে বিলীন করে দেয়। সমাজের পরিমাণগত (quantitative) রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গুণাত্মক (qualitative) ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করে—কিন্তু সেই নতুন আত্মপ্রকাশে পূর্বতন রূপের আদলটা আর ধরা যায় না। এই গুণাত্মক বিকাশকে মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

বাঙালীর সংস্কৃতির রাসায়নিক সংশ্লেষের বস্তুগত উপাদান এবং তাদের গুণাত্মক বিকাশের স্বরূপ নির্ধারণ স্পষ্টতঃই কঠিন। তবু ভাষাতত্ত্ব, নরতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, আচার-অনুষ্ঠানতত্ত্ব ইত্যাদির অনতিস্পষ্ট সাক্ষ্যে তার একটা দিগ্‌দর্শন করার চেষ্টা হয়ে থাকে। তা থেকে বাঙালীর সংস্কৃতির মোটামুটি কাঠামোটা ধরা যেতে পারে।

উনিশ শতক পর্যন্ত বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি ছিলো একান্ত-

ভাবেই গ্রামীণ। এই গ্রামীণ সংস্কৃতির ভিত্তিতে দেখা যায় কৃষিকে। মৌসুমী বায়ুর আশীর্বাদে ও অজস্র নদনদীর স্নেহধারায় বাঙলার সমতল ভূমিতে প্রচুর ফসল ফলে থাকে। সোনার বাঙলা নামের কারণও তা-ই। এই কৃষির মধ্যে আবার ধান প্রধান। তার ফলে বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গে ধানের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য—আমাদের লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ধান, কোজাগরী পূর্ণিমায় আঁকা আল্পনায় লক্ষ্মীর চরণ-চিহ্নের পাশে ধানের শীষ, শুভদিনের আশীর্বাদে ধান-দূর্বা। বাঙলার এই ধান্যবৃত্তীয় কৃষিসভ্যতা একদিকে যেমন বিশেষ জলবায়ুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অন্যদিকে তেমনি অষ্ট্রিক প্রভাবের প্রমাণ দিয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে, অষ্ট্রিকরাই এদেশে লাঙ্গল ও ধানচাষ প্রবর্ত্তন করেছিলো। দীর্ঘমুণ্ড দ্রাবিড়রা যে গম ও যব চাষের প্রবর্তন করে, বাঙলা দেশ তা গ্রহণ করে নি। বাঙলার জলবায়ুতে গমের চেয়ে ধান ভাল হয় বলেই নয়, অষ্ট্রিক প্রভাবের প্রবলতাও তার অন্যতম কারণ। অষ্ট্রিক জনের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে ধানের প্রাধান্য এই জাতীয় সিদ্ধান্তের পরিপোষক। দ্বিতীয় কথা, অষ্ট্রিক-জন-বিস্তৃতির ক্ষেত্রে অধিবাসীরা এখনও রুটি খেতে ভালোবাসে না, ভাত খেতে অভ্যস্ত। এই তথ্যটিও বাঙলার কৃষিসভ্যতায় অষ্ট্রিক প্রভাবের উদাহরণ। বাঙালীর প্রিয় খাদ্যের তালিকায় নারকেল, বাতাবি লেবু, সুপারি, লাউ, বেগুন, কলা, পান, হলুদ ইত্যাদি রয়েছে এবং এই সমস্ত অষ্ট্রিকরাই প্রথম বাঙলার মাটিতে ফলাতে শুরু করে। পূজোর দিনে পাট কাপড়, শীতের দিনে কম্বল আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ। আমাদের নদী, খাল ও বিলের দেশটিতে বর্ষাকালে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ডোঙ্গা, ডিঙ্গি ও ভেলা। রান্নায় আমরা—অষ্ট্রিক প্রভাবমণ্ডলের লোকেরা—সরষে, নারকেল ও তিলের তেল ব্যবহার করি ; অথচ এই মণ্ডলের বাইরে ঘিয়ের ব্যবহারই বেশি দেখা যায়। স্মর্তব্য, এসমস্তই বাঙালীর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে অষ্ট্রিকদের স্মৃতিফলক। বাঙলায় তেমন স্বৈরতন্ত্রী রাজা কোনোকালেই ছিলো না। তাই এদেশের শিথিল

রাষ্ট্রীয় বন্ধনে যে সামাজিক গণতন্ত্রের প্রকাশ লক্ষণীয়, তা কি অষ্ট্রিকদের পাঞ্চায়েতী গণতন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না? সকলের চেয়ে বড়ো কথা—অষ্ট্রিকরা 'সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণযুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, দায়িত্বহীন, কিছু পরিমাণে অলস, উৎসাহহীন, দৃঢ়তাবিহীন ও সংহতি শক্তিতে হীন ছিল। কিন্তু লাঘব স্বীকারের মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই।' ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর চরিত্রেও কি এই সব দোষ-গুণ কম-বেশি পরিমাণে দেখা যায় না? আমরা হিন্দুরা পরলোক ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি, মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে থাকি। পশু আর পক্ষী, পাথর আর পাহাড়, বৃক্ষ আর ফলে দেবত্ব আরোপের চেষ্টা গ্রাম্য লোক আর মুণ্ডা-সাঁওতালদের মধ্যে দেখা যায়। এই সমস্তই নিঃসন্দেহে অষ্ট্রিক জনের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের স্মৃতিবহ। আমাদের ব্রতপূজা ও ধর্মানুষ্ঠানে সিঁদুর, কলাগাছ, সুপারি, নারকেল, হলুদ, দূর্বা, কলা, ধান ইত্যাদির ব্যবহার,—ধান ও কড়ির আচার,—গায়ে হলুদ, পানখিলি ইত্যাদি অষ্ট্রিক সংস্কৃতির অনুবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং বাঙালীর জীবনযাত্রায় অষ্ট্রিকদের প্রভাব অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে, সন্দেহ নেই।

ভারতে কৃষিসভ্যতা অষ্ট্রিকদের দান, কিন্তু নাগরিক সভ্যতা দ্রাবিড়দের সৃষ্টি। মহেঞ্জোদাড়ো আর হরপ্পার আবিষ্কার, কুট-উর-পুর শব্দগুলির ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্য দ্রাবিড়দের নাগরিক সভ্যতার স্মৃতি আজও বহন করে। কিন্তু বাঙালীরা অষ্ট্রিকদের গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিসভ্যতাই আঁকড়ে রইলো, দ্রাবিড়দের নাগরিক জীবনযাত্রা তাদের মনোহরণ করেনি। তাই বাঙলার ইতিহাস নগরবৃত্তীয় নয়। সমগ্র ভারতের ইতিহাসে কান্যকুব্জ, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, বিদিশা, হস্তিনাপুর, শ্রাবস্তী, পাটলিপুত্র ইত্যাদির যে স্থান, তেমন স্থান বাঙলার কোন নগর (এমন কি গৌড় ও

তাম্রলিপ্তও নয়) অধিকার করতে পারেনি। নানা খনিজ বস্তুর ব্যবহার, বিচিত্র অস্ত্রোপকরণের আবিষ্কার, অবসর বিনোদন ও আরাম উপভোগের অনেক বস্তুর সমাবেশে দ্রাবিড়দের উন্নত ও সমৃদ্ধ সভ্যতার পরিচয় আছে—কিন্তু বাঙলার মাটিতে তার প্রভাব কতটুকু? আসল কথা, আমাদের সমাজবিন্যাস ও জীবননীতিতে—এক কথায় সংস্কৃতিতে—দ্রাবিড়ী নাগরিকতার বিশেষ ছাপ নেই। দ্রাবিড়দের প্রিয় খাদ্যের মধ্যে একমাত্র মাছকেই বাঙালীরা গ্রহণ করেছে (বাঙলাদেশে বেশি পাওয়া যায় বলেই বোধহয়)—মেষ, শূকর ও মুরগীর মাংসকে গ্রহণ করেনি। তবে দ্রাবিড়ী মৃৎশিল্প, চিত্রকলা, রেখাঙ্কন, চারু ও কারুশিল্পকে বাঙালী আত্মসাৎ করে ফেলেছে—'রূপ' ও 'কলা' দ্রাবিড়ী শব্দ দুটি বাঙালীর সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রে চিরদিনের আসন করে নিয়েছে। কিন্তু এদের কর্মানুরাগ, উদ্যমশীলতা ও সংঘশক্তির আদর্শ বাঙালীদের প্রভাবিত করেনি। অবশ্য আমাদের অধ্যাত্মজীবনে দ্রাবিড়দের সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বহুপূজিত শিব, উমা, বিষ্ণু, শ্রী ইত্যাদি দেবদেবী এবং মন্দির, পশুবলি ও মূর্তিপূজা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মাধ্যমে দ্রাবিড়দের ভাবলোক থেকে বাংলাদেশে চিরায়ত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। দ্রাবিড়দের মাতৃকাপূজা ও সর্পপূজার পরিণতি হচ্ছে শক্তিপূজা (চণ্ডীমঙ্গল) ও মনসাপূজা (মনসামঙ্গল), তাদের লিঙ্গপূজা শিবপূজার সঙ্গে মিলেমিশে রূপ নিয়েছে শিবলিঙ্গপূজার। প্রাচীন বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে যে তন্ত্র, যোগধর্ম ও আনুষঙ্গিক সাধনপদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়—যার পরিণতি বৌদ্ধ ও শৈব সহজিয়া সাধনায়, বাউল গানে এবং অন্যান্য অস্পষ্ট ও মরমী (mystic) ধর্মতত্ত্বে—তার ভাবলোক আর্য-সংস্কৃতির ভাবলোক থেকে পৃথক বলেই মনে হয় এবং অনিবার্যভাবেই দ্রাবিড়ী সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (অবশ্য অষ্ট্রিকদেরও কিছু প্রভাব আছে—যেমন লিঙ্গপূজায়)। কেউ কেউ বলেন,

অস্পৃশ্যতা ও শ্রেণী-পার্থক্য দ্রাবিড়দের কাছ থেকেই এদেশে সঞ্চারিত হয়েছে। দ্রাবিড়দের সমাজ ছিলো মাতৃতান্ত্রিক, তারই প্রভাব ও প্রেরণায় প্রাগাধুনিক জীবন ও সাহিত্যে মাতৃশক্তির প্রাধান্য দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, দ্রাবিড়রা ছিলো ভক্তিবাদী ও মরমী, কর্মশীল, আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন ও শ্রমদক্ষ, নৃত্যকলা, গীত ও কারুশিল্পে নিপুণ। বাঙালীর চরিত্রে এদের শিল্পানুরাগ ও ভক্তিধর্মের ছাপ আছে বটে, কিন্তু তাদের আস্তিক্যবুদ্ধি ও কর্মশীলতার কোন ছাপ পড়েনি।

সংস্কৃতির দিক থেকে বাঙলাদেশে মঙ্গোলীয় জাতির দান উল্লেখনীয় নয়। তাদের সভ্যতা অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় সভ্যতার চেয়ে হীন ও নিষ্প্রভ ছিলো বলে উত্তর-পূর্ব বাঙলার জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে তারা আত্মরক্ষা করেছে। তবু স্থানীয় কিছু কিছু প্রবাদে, ছড়ায়, জায়গার নামে ও অনুষ্ঠানে মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

অ্যাল্‌পো-দীনারীয় গোষ্ঠীর অবৈদিক আর্যরা প্রথমে উপনিবিষ্ট হয় বরেন্দ্রভূমিতে (উত্তরবঙ্গে), সেখান থেকে তারা কালক্রমে ছড়িয়ে পড়ে রাঢ় ও সুহ্ম দেশে (পশ্চিমবঙ্গে)। অনার্য জন ও সংস্কৃতির প্রাধান্য বেশি থাকায় ও চলাচলের অসুবিধার জন্য বঙ্গের (পূর্ববঙ্গের) আর্যীকরণ সকলের শেষে সম্পন্ন হয়। বৈদিক আর্যদের চেয়ে এই অবৈদিক আর্যরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নিকৃষ্ট ছিলো, সন্দেহ নেই। এই নিকৃষ্ট আর্যরা ব্রাত্য বা পতিত হলেও বাঙলাদেশে আসার আগে দ্রাবিড়দের ভাষা ও সভ্যতা আত্মসাৎ করেছিলো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপনিবিষ্ট আর্যদের প্রধান গুণ ছিলো আত্মসাতের প্রবণতা, স্বীকরণ-ক্ষমতা। এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙলাদেশে প্রথমে আসে জৈনধর্মী ব্রাত্য আর্যরা, তার পরে আসে বৌদ্ধধর্মী ব্রাত্য আর্যরা, সকলের শেষে (খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে)

আসে ব্রাহ্মণ্যধর্মী আদি-নর্ডিক আর্যরা। মৌর্যযুগে মগধের বণিক-সম্প্রদায়, রাজপুরুষ, সৈন্যসামন্ত ও ছন্নছাড়াদের দ্বারা যে আর্যসংস্কৃতির (জৈন ও বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী আর্যসংস্কৃতি) বিস্তার চলতে থাকে, গুপ্তযুগে সেই সংস্কৃতিকে বাঙলাদেশ অঙ্গীকার করে নিয়েছিলো বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মী আর্যসংস্কৃতির প্রসার গুপ্তযুগে শুরু হয়ে পালযুগের মধ্য দিয়ে সেনযুগে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অ্যাল্‌পো-দীনারীয় ও মিশ্র আদি-নর্ডিক আর্যরাই 'সৃজ্যমান বাঙালী জনকে একটা নূতন মানসরূপ দান' করেছে এবং অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়ী 'মন ও প্রকৃতির ওপর চন্দনানুলেপন' ছড়িয়ে দিয়েছে। আর্যদের এই প্রচেষ্টাই দান করেছে বাঙালীকে, বাঙালী চরিত্রকে 'স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য।' 'ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল ......শৃঙ্খলাসম্পন্ন, সুদৃঢ়রূপে সংঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্ম-সমাহিত, বাস্তবসভ্যতায় কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ, অথচ নূতন...... সদাচেষ্টিত এমন আর্যজাতি' এক ঐক্যবিধায়ক কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিসূত্রে অনার্য বাঙালী জনকে বাঁধবার চেষ্টা করলো, দেশের মানুষ আর সংস্কৃতিকে বিশিষ্ট রূপ দিতে প্রয়াস পেলো। কিন্তু গভীরতর বিচারে দেখা যায়, বাঙালী সংস্কৃতির বাইরের আর্যরূপ সত্ত্বেও তার ভেতরে অনার্য উপাদানের পরিমাণটাই যেন বেশি রয়ে গেলো।

সুতরাং বাঙলা দেশের জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক সমন্বিত আদর্শের সাগর-সঙ্গম। কিন্তু একথা সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও খাটে না কি? কেমন করে আদি-নর্ডিক আর্যদের (ব্রাত্যষ্টোম যজ্ঞের ব্যবস্থা সত্ত্বেও) বিশুদ্ধ রক্তপ্রবাহে এসে ধ্বনিত হলো বিচিত্র রক্তধারার স্রোতোধ্বনি, কেমন করে বৈদিক ধর্ম অনার্য আচার-অনুষ্ঠান, ভয়-বিশ্বাস, সৃষ্টি-পুরাণ, ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা-ভাবনার সঙ্গে মিলেমিশে পৌরাণিক ধর্ম হয়ে উঠলো—এই সব সমন্বয়ের কাহিনীই ভারতবর্ষের সভ্যতা ও

সংস্কৃতির ইতিহাস। সুতরাং বাঙলা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য কোথায়? আগেই বলেছি—আর্যধর্ম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনার্যধর্মকে আত্মসাৎ করে যতটা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, বাঙলাদেশে ততটা পারেনি। দ্বিতীয়তঃ যে কোমতন্ত্র থেকে বাঙলাতন্ত্রের উদ্ভব তা-ও বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য-স্বভাবের মূলে কাজ করেছিলো বলে মনে হয়। তৃতীয়তঃ বাঙলা ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ হওয়ায় ভারত-সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ আক্রমণ তার প্রান্তীয় চেতনাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারেনি। এখানে অনার্য উপাদানের প্রাচুর্য এখনও স্পষ্ট করেই বিশ্লেষণ করা যায়। অতএব বাঙলাদেশের আর্যীভবন অনেকটা বহিরঙ্গীয়, অন্তরঙ্গীয় নয়। বাঙলাদেশে ভারতীয় সাধনার ঐক্যের তত্ত্ব যেমন স্বীকার করে নিতে হয়, তেমনি বঙ্গীয় সাধনার স্বাতন্ত্র্যও অস্বীকার করবার উপায় নেই। অন্যভাবে বলা যায়, বাঙালীর সমন্বয়-সাধনার মধ্যেও বাঙালীয়ানা আছে। দুই অণু হাইড্রোজেন ও এক অণু অক্সিজেন মিলে জল হয়; আবার দুই অণু হাইড্রোজেনের সঙ্গে দুই অণু অক্সিজেন মেশালে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড্ হয়ে যায়—এই দুটিই রাসায়নিক মিশ্রণের উদাহরণ; তবু মৌলিক উপাদানের ভেদ নয়, তাদের পরিমাণ-ভেদের জন্যই দুটি স্বতন্ত্র বস্তুর উদ্ভব ঘটে থাকে। বাঙালীর জন-সাংকর্যে, তার সংস্কৃতি-সাংকর্যে যে মৌলিক-অমৌলিক উপাদানগুলি আছে তাদের বিশেষ পরিমাণগত সংস্থানের জন্যই ভারতীয় ঐক্যধর্মী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীর সংস্কৃতি একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ না করে পারেনি।

কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটা স্পষ্ট করতে চাই। সংস্কৃত পুরাণে উপ-পুরাণে মহাভারতে ভাগবতে বিষ্ণুর নানা অবতার-রূপের কথা জানা যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দে যে দশাবতারের উল্লেখ আছে তা এই সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের প্রথম সমন্বায়িত বিধিবদ্ধ রূপ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু হাল-এর গাথা সপ্তশতীতে

রাধার যে উল্লেখমাত্র আছে, ভাসের বালচরিতে, ব্রহ্ম ও বিষ্ণু পুরাণে ও ভাগবতে গোপীবৃন্দের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার যে বর্ণনা আছে সেই অলক্ষ্যপ্রায় ঐতিহ্য যে গীতগোবিন্দের রাধা-কৃষ্ণলীলার মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের রাধাবাদ ও শুদ্ধা ভক্তির তত্ত্বে পরিণত হলো তা গৌড়বঙ্গের জন-মানসের বিশিষ্টতার পরিচায়ক।

একদা সংস্কৃত রচনায় বৈদর্ভী ছিলো বিশুদ্ধ মার্গের রীতি, তাতে প্রসাদ, মাধুর্য, সৌকুমার্য ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ঘটতো। কিন্তু এই সর্বভারতীয় রচনারীতি বাঙলাদেশে আদৃত হয়নি। তার বদলে সপ্তম-অষ্টম শতকে এদেশে গড়ে উঠলো গৌড়ী রীতি। এই রীতি 'অক্ষরডম্বর' (বাণভট্ট), যে সকল গুণের সদ্ভাবে বৈদর্ভী রীতি সেই সকল গুণের বিপর্যয়ে এর সৃষ্টি (দণ্ডী)। অলঙ্কারময়, আড়ম্বরযুক্ত ও পল্লবিত গৌড়ী রীতির উদ্ভব প্রশংসনীয় না হলেও বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য-সচেতন মনীষা, স্বকীয় প্রকৃতি ও প্রবণতা, রুচি ও দৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে যখন গৌড়ী রীতির উদ্ভব সেই সময়েই রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বাধীন গৌড় গড়বার চেষ্টা চলতে থাকে। সুতরাং এই গৌড়তন্ত্র বিশিষ্ট বাঙলাতন্ত্রের নামান্তর মাত্র।

এখানে ভাষার প্রসঙ্গও উত্থাপন করা সঙ্গত। বাঙলার সংস্কৃতিতে আর্য-ঐতিহ্য আছে, সন্দেহ নেই,—কিন্তু তাতে লোকায়ত (অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়) ঐতিহ্যই অধিক অনুস্যূত। কিন্তু সংস্কৃতির মুখ্য বাহন বাঙলা ভাষার আর্য-গোত্র বিশেষ তাৎপর্যবহ। ঐতিহাসিক বিচারে আজ সুপ্রমাণিত যে, বাঙলা ভাষা ভারতীয় আর্যভাষার সন্তান। অবশ্য তাতে অনার্য উপাদান কিছু কিছু প্রবেশ করেছে। বাঙলা ভাষার রূপে-ধ্বনিতে, শব্দভাণ্ডারে ও বাক্যগঠনপদ্ধতিতে অনার্য ছাপ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তবে স্মরণ রাখতে হবে, আর্য ভাষা বাঙলায় অনার্য ভাষার প্রভাব শুধু আধুনিক স্তরেই (N.I.A) বিস্তৃত হয়নি, সংস্কৃত (O.I.A) এবং পালি-প্রাকৃত

স্তরেও (M.I.A) অনুপ্রবেশ করেছে। সে যাই হোক, বাঙলা ভাষার অনার্য উপাদান এসেছে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় উৎস থেকে। সুতরাং বাঙালী যেমন সংকর জাতি, তেমনি বাঙলাও সংকর ভাষা (মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে যে সব বিদেশী শব্দ বাঙলায় প্রবেশ করেছে, তাদের কথাও এখানে স্মরণীয়)। কিন্তু একটা পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। বাঙালীর জনসাংকর্যে, আমরা আগেই দেখেছি, অনার্য উপাদান বেশি, কিন্তু তার ভাষা-সাংকর্যে আর্য-উপাদানের তুলনায় অনার্য-উপাদানকে নগণ্য বলা যায়। এর কারণ কি? আমার মনে হয়, বিভিন্ন জাতি ভেঙেচুরে যে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হলো (এ-জাতির মানসরূপ দান করেছে আর্যরা), তার মানস-সংস্কৃতি আর্যভাষার শ্রুতিমাধুর্য ও উচ্চারণ-সৌকর্যের অনুরাগী না হয়ে পারেনি। অষ্ট্রিক ভাষা অসুর ভাষা, তার 'র' ও 'ল'-কারপ্রবণতা, 'অস্ফুট, অব্যক্ত ও কর্কশ' রূপ ও শ্রুতি যে-কোন মানসধর্মী জাতির কাছে আগ্রাহ্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যে উচ্চারণগত কারণে কাব্যমীমাংসাকার রাজশেখর গৌড়জনকে সরস্বতীর জবানিতে প্রাকৃত ছাড়তে বলেছিলেন (গৌড়স্ত্যজতু বা গাথামন্যা বাহস্তু সরস্বতী ইত্যাদি), হয়তো সেই কারণেই সমগ্র বাঙালী জাতিই অনার্য ভাষা ছেড়ে আর্য ভাষার দিকে ঝুঁকেছে। কারণ যা-ই হোক, আর্য ভাষার এই বিজয় একটা বিরাট ঘটনা—যেহেতু এই ভাষা-বিজয়ের পথ ধরেই আর্য-সংস্কৃতি বাঙলাদেশে প্রবেশ করেছে।

॥ দুই ॥

ইতিহাস মাত্রই মানুষের ইতিহাস। শিল্প মানুষের অনুপম সৃষ্টি, তাই শিল্পের ইতিহাসের অর্থ মানুষের ইতিহাস। আবার মানুষই বিজ্ঞানের জন্মদাতা, তাই বিজ্ঞানের ইতিহাস বলতেও

বোঝায় মানুষেরই ইতিহাস। দেবতাবাদের যুগ পেরিয়ে এসে আজ আমরা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই—মানুষ সমস্ত জাগতিক কর্মধারার উৎস—শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি সব কিছুরই মর্মমূলে রসসিঞ্চন করেছে মানুষের জীবন। আর মানব-গোষ্ঠীর এই যে বিচিত্র কর্মপ্রবাহ তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, তারা একে অন্যের পরিপূরক এবং তাদের সামগ্রিক পরিচয়েই মানুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

একটা বিশেষ ভূখণ্ডে কালের পথে চলতে চলতে ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে কতই না মানসিক ও বাস্তব রিকৃথ জমে ওঠে! জীবনপ্রবাহ কিছুই ফেলে যায় না, যা পায় তা-ই আহরণ করতে করতে চলতে থাকে। সেই সঞ্চয়ের বস্তুগত উপকরণ যদি জীবন জমিয়ে না-ও রাখে, তবু তার ভাবগত তাৎপর্য সে আত্মসাৎ করে নেয়। সি. এস্. লুইয়ের ভাষায় বলা যায়, ট্রেনের চলা আর মানব সমাজের চলার মধ্যে পার্থক্য আছে। ট্রেন ইচ্ছে করলেই চলতে পারে না, আর চলতে চলতে সে কিছু সঞ্চয়ও করতে পারে না। কিন্তু মানুষ জীবন্ত বলেই খুশি মতো চলতে ফিরতে পারে, তার পথের সঞ্চয়ও অনেক জমে ওঠে। আমাদের মনের ওপর তুরপনেয় চিহ্ন কিছু না রেখে কিছুই অতীত হয়ে যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জাতীয় জীবনের চলমান প্রবাহ মাত্রই স্মৃতিবহ। এবং সেই বহুকালব্যাপক স্মৃতিধারাকেই ঐতিহ্য বলা যায়। ইতিহাস সত্যকথিত ঐতিহ্যের পূর্ণব্যক্ত স্বরূপ-চিত্র।

মানুষের বিচিত্র কর্মের মধ্যে তার নানা পরিচয় ছড়িয়ে থাকে। সাহিত্য মানুষের মহত্তম সৃষ্টি—তাই সাহিত্যেও মানুষ স্বপ্রকাশ। অন্যদিকে জাতির জীবন যে পথে যেমন রূপে অগ্রসর হয়, ঠিক তেমনিভাবে সাহিত্যের সৃজনকার্য চলতে থাকে। সাহিত্যের সঙ্গে জাতির জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের জন্যই যেমন সাধারণ ইতিহাসে দেশ ও দেশজনের ঐতিহ্যের পূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাসেও জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

সুতরাং ঐতিহ্যের রূপালোকে জাতির প্রাণবত্তার পরিচয় নেওয়াই সাহিত্যের ইতিহাসকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মোটামুটি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বাঙলা সাহিত্যের পদযাত্রা শুরু হয়। তারপর থেকে হাজার বছর ধরে বহু বিচিত্র খাতে তাকে চলতে দেখি—কখনও নতুন ভাবের রসধারায় তার পরিপুষ্টি, কখনও গতানুগতিকতার উষর ক্ষেত্রে তার পরিক্ষীণতা। পরিবৃত্তি (innovation) আর অনুবৃত্তির (convention) চড়াই উতরাই পেরিয়ে, কখনও ঋজু, কখনও বঙ্কিম পথরেখায় অগ্রসর হতে হতে বাঙলা সাহিত্য আধুনিক কালের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। আমাদের দেশ সমাজবৃত্তীয় নয়। এই কারণে প্রাক্-আধুনিক কালে রাজ্যের উত্থান পতনে, রাষ্ট্রনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝায় আমাদের সমাজমুখী মনের রাজ্যে বিশেষ কোন আলোড়ন দেখা দেয়নি। যদি মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন না হয়, যদি তার প্রকৃতিতে হাওয়া বদল বা ঋতুবদল না ঘটে, তবে সাহিত্যের স্বাদে ও সৌরভে, রূপে ও চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসে না। আধুনিক-পূর্ব যুগে একমাত্র চৈতন্যদেব ছাড়া আর কেউ জাতির চৈতন্যে নতুন আলোর উৎকণ্ঠা জাগাতে পারেন নি, আমাদের অভ্যস্ত সমাজ-মানসে চিড় কাটতে পারেন নি। তাই ষোড়শ শতাব্দী বাঙলা সাহিত্যের স্বর্ণ-যুগ। এই সোনার ফসলের কালটা বাদ দিলে সমগ্র প্রাগাধুনিক পর্বে দেখা যায় থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। আসল কথা, সমাজমানুষের জীবনে বৈচিত্র্যপ্রবণতা আর ঋদ্ধিসাধনা না থাকলে সাহিত্যে তা বিবৃত হতে পারে না। ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হলো সতেরো শ' সাতান্নোয়—ইতিহাসে এটা একটা বড়ো ঘটনা নিশ্চয়—কিন্তু জাতির মানসে আর সাহিত্যের প্রকৃতিতে নূতনের ডাক পৌঁছোতে আরও এক শ' বছর লেগেছিলো। তার কারণ ইংরাজরা ধীরে ধীরে এদেশে শাসনের শিকড় ছড়িয়েছে এবং সমাজকে দীর্ঘদিন অনালোড়িত ও অনুদ্‌বেজিত রাখতেই চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইংরেজ-শাসনের ফাঁকে ফাঁকেই পাশ্চাত্ত্যের উদ্দীপ্ত

দিগন্তের ছবি বাঙালীর কাছে ধরা পড়লো। নূতন কালের জ্ঞান-গঙ্গার ভগীরথ রামমোহন জাগরণের ডাক শোনালেন চতুর্দিকে। এমনি করে যে রেণেসাঁসের সাড়া জাগলো তার ফলে বাঙালীর জীবনে এলো নূতন বেগ, নূতন স্বপ্ন—এলো নূতন যুগ। এই নবযুগের জীবনবৈচিত্র্য ও মানসসমৃদ্ধি জন্ম দিয়েছে নূতন সাহিত্যের—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

কিন্তু যদি প্রাগাধুনিক কালের মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে রাখি, তবে দেখতে পাই—তাতে জীবনবৈচিত্র্য ন্যূন, গতানুগতিকতার ভাব দৃঢ়মূল, প্রত্যয়পট বর্ণবিরল, মানসপ্রবণতা অভ্যাসমুখিন। তবু সেই জীবনের যা কিছু ঐতিহ্য, তার চিত্রায়ণ ঘটেছে সাহিত্যে। তাই সেই ঐতিহ্য-সূত্র নিরূপণ করতে পারলে সাহিত্যের রূপরেখা অনুধাবন করা সহজ হবে।

আধুনিক-পূর্ব বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহ্য-সূত্র হচ্ছে ধর্ম চেতনা। পৃথিবীর সকল সাহিত্যেরই সূচনা ধর্মের পরিমণ্ডলে। অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য (সপ্তম শতক থেকে) খ্রীষ্টিয়ান্ সাহিত্য। সেই সাহিত্যের সম্পাদকেরা (Anglo-Saxon Latinist clerks) এমন কিছুই সংগ্রহ করেননি যা স্পষ্টতঃ তাঁদের ধর্ম-বিরোধী। নর্মান বিজয়ের পরে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেখতে পাই—'Homilies, sermons in prose and in verse, translation of the Psalms or parts of the Bible, rules for a devout life, lives of the saints, and prayers—these fill the pages which form the mass of what may be called English Literature until about the middle of the fourteenth century.' পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক থেকে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে হিউম্যানিজমের স্ফুরণ ঘটে—জাতির জীবনে একটা নতুন বোধের সঞ্চার হয়। কিন্তু সেই মানবতাবাদ সাহিত্যকে প্রভাবিত করতে না করতেই সংস্কার আন্দোলন (Reformation) দেখা দেয়। সাহিত্যেও

সেই ধর্মনৈতিক সংঘাত সংক্রমিত না হয়ে পারে নি। তারও অনেক পরে সপ্তদশ শতকে মিল্টনে যে প্রবল ধর্মচেতনা দেখি, তাতে স্পষ্টই মনে হয়, ধর্মের আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে ইংরেজী সাহিত্যের দীর্ঘদিন লেগেছিলো। ইংরেজের জীবনে বৈচিত্র্য অনেক, তাদের সমাজমানসে ভাব-বিপ্লব ঘটেছে বারে বারে—সকলের চেয়ে বড়ো কথা, ষোড়শ শতকের প্রথমে তারা আস্বাদ পেয়েছে রেনেসাঁস আর হিউম্যানিজমের। তবু ধর্ম থেকে পরিপূর্ণ মানস-মুক্তি আসতে তাদের অনেকদিন লেগেছে। এমনি অবস্থায় বৈচিত্র্যহীন, আশাভরসাবর্জিত ও নিষ্ক্রিয় বাঙালী জাতির পক্ষে যদি আধিদৈবিক বিশ্বাস আর আনুগত্যপ্রধান ধর্মচেতনার মোহ কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লেগে থাকে, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এবার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ধর্মবৃত্ত বিশ্লেষণ করা যাক। চর্যাপদে সহজিয়া মতবাদ ও সাধনপদ্ধতির কথা আছে। এছাড়া সেকালের সাহিত্যের দুটি প্রধান ধারা—মঙ্গল ও বৈষ্ণব—উভয়ই ধর্মাশ্রিত। চৈতন্যদেব ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তৎসত্ত্বেও তাঁর জীবনীকাব্যগুলি বাস্তব জীবন রস-রসিকতার চেয়ে আধ্যাত্মিক ভাবরস অধিক প্রকাশ করে। এছাড়া প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারত-আশ্রিত অনুবাদ-শাখা দেখতে পাই। শুধু হিন্দু-বৌদ্ধদের কথা বলি কেন, সপ্তদশ শতাব্দীর সৈয়দ মর্তুজা, নসীর মামুদ, আলিরাজা, দৌলতকাজি, আলাওল, সৈয়দ সুলতান ইত্যাদি মুসলমান কবিদের রচনায় সুফী বা বৈষ্ণব ভাবের অনুবৃত্তি দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধর্মের প্রেরণা ও আবরণ আগের চেয়ে শিথিল হয়েছে, সন্দেহ নেই;—তবু জগৎ ও জীবনের প্রতি স্বাভাবিক চেতনা জাগ্রত হয়নি। লোকগীতি—সে মুসলমানীই হোক আর হিন্দুই হোক—তারও ধর্মবৃত্ত থেকে পুরো মুক্তি ঘটেনি। উনিশ শতকের ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত এইভাবে ধর্মের জের চলেছিলো, সন্দেহ নেই। এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয়,

প্রাচীন বঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রা ছিলো ধর্মবৃত্তীয় আর তারই অনিবার্য প্রভাবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনও জড়, মন্থর ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলো। বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে এই ধর্মমুখিনতা দেখা দিয়েছে জনসাংকর্যের দুই সূত্র—লোকায়ত বা অনার্য ও পৌরাণিক বা আর্য সূত্র থেকে।

কিন্তু ধর্মচেতনা কথাটা খুব ব্যাপক। আরও নির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাচীন বাঙালীর ধর্ম-প্রেরণার কতকগুলি দিক ছিলো। এক—হৃদয়ভিত্তিক ভক্তিবাদ, দুই—জ্ঞানভিত্তিক বৌদ্ধদর্শন, তিন—বুদ্ধির অতীত মরমী তত্ত্ব (mysticism), চার—জীবনভিত্তিক সাধারণ লৌকিক বিশ্বাস। এর প্রথম দুটি মোটামুটিভাবে পৌরাণিক উৎস থেকে এসেছে। ব্রহ্মসূত্রে যে নারায়ণ উপাসনার কথা আছে, তা-ই নানা সংস্কৃত পুরাণ উপপুরাণের মধ্য দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতগোবিন্দ ইত্যাদির পথ বেয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের হৃদয়ভিত্তিক ভক্তিবাদে পরিণত হয়। বৌদ্ধধর্মও আর্যধর্ম—উপনিবিষ্ট বৌদ্ধধর্মী আর্যদের কাছ থেকেই তা বাঙলা-দেশে বিস্তার লাভ করে। অন্যদিকে মরমী তত্ত্ব আর্যসংস্কৃতির ভাবলোকের সঙ্গে মেলে না, তা অনার্য-সূত্র থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। কিন্তু মরমী তত্ত্ব মণ্ডলীভুক্ত, রহস্যাচ্ছন্ন, দুর্বোধ্য ও গুহ্য ছিলো বলে তাকে সমগ্রভাবে লৌকিক জীবনাশ্রিতও বলা যায় না। বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া ও নাথপন্থী সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে দিয়ে এই তত্ত্ব এসে পৌঁচেছে আউল-বাউল গানে, নানা ধরণের সহজিয়া তত্ত্বে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যে নানা ধর্মমত, ধ্যান-ধারণা, ভয়-বিশ্বাস ও ভাব-কল্পনা বাঙলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে ছিলো—যা কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস-বৃদ্ধি, পরিবর্তন পরিমার্জন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগ পর্যন্ত বাঙালী জাতির ভেতরে দেখা গেছে—তাকেই জীবনভিত্তিক লৌকিক বিশ্বাস বলা যেতে পারে। দশম শতাব্দীর আগে সেই বিশ্বাস অলিখিত লোকগীতি রূপে জনসাধারণের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরতো। পরে তা

রূপ পেলো ব্রতকথায়, প্রবাদে, ছড়ায়, মঙ্গলকাব্যগুলির অনেক অংশে, রাধাকৃষ্ণলীলার স্থানবিশেষে।

ধর্ম ও আধিদৈবিক বিশ্বাস আধুনিক-পূর্ব বাঙলা সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অস্ফুট ও অপ্রাকৃত ভাব-ধারার মধ্যেও বাঙালীর সহজ, বস্তুনিষ্ঠ, প্রাকৃত ও প্রত্যক্ষ জীবন-ধর্ম,—দেশের মাটি-জল, আলো-বায়ুতে গড়ে-ওঠা জাতির জীবিত চেতনার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু অধ্যাত্মলোকে ভাবচারিতা নিয়ে, মাটি থেকে আল্‌গা মন নিয়ে, ভাবুকতা নিয়ে একটা জাতির ইতিহাস তৈরি হয় না। বাঙালীর ক্ষেত্রেও এ-সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাঙালীর জীবনের সংগ্রাম, তার বেঁচে থাকার দায় ও দায়িত্ব, তার ঋদ্ধিলাভের অভীপ্সা থেকে যে ভৌমচেতনা ও ইহনিষ্ঠার স্ফুরণ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী, তার কম বা বেশি প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি সাহিত্যে ঘটেছে। স্বীকার করতে হবে, সামাজিক ও ধার্মিক কারণে এবং প্রথার শাসনে আধিদৈবিক বিশ্বাসের ওপরই প্রাচীন কবিদের জোর (emphasis) ছিলো, কিন্তু পারিপার্শ্বিক যুগ, সমাজ ও জীবনের ছবিও তাতে ফুটেছে। বাঙালীর সংস্কৃত ও অবহট্‌ঠ কবিতা, মঙ্গলকাব্য, ছড়া, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি থেকে তা প্রমাণ করতে কষ্ট হয় না। অস্ট্রিক রক্ত যাদের শিরায় আছে, জীবন-রস-রসিকতা ও বস্তুনিষ্ঠা তাদের স্বভাববিরোধী নয়।

কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে জীবন-রস-রসিকতা ও বস্তুনিষ্ঠার প্রকাশ সর্বত্র সমানভাবে ঘটেনি। কোথায়ও তা অলক্ষ্যপ্রায়—যেমন সংস্কৃত কাব্যর আক্ষরিক অনুবাদে। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মতো কাব্য কবির সমসাময়িক জীবন ও পরিবেশের কোন পরিচয় বহন করে না। আবার বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবপ্রবাহের আশে-পাশে পৃথিবীর গাছপালা, মানুষের কুটির, জীবনের টুকরো দেখা যায় বটে, কিন্তু পরিণামে মন ভরিয়ে তোলে সেই দেশ যেখানে 'অভিনব কল্পতরু সঞ্চরু,' 'বিকশিত ভাব-কদম্ব'। অর্থাৎ তাতে

কালোচিত বস্তুনিষ্ঠা ও জীবনধর্মের কোন স্থায়ী রস-পরিণতি নেই। গোবিন্দদাসের অভিসার পদে কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল, জঙ্গলাকীর্ণ ও সর্পসঙ্কুল বাঙলা দেশকে দেখতে পাই। 'মত্ত দাদুরী' ও 'ডাহুকীর' দেশকেও বৃহত্তর বাঙলা বলে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ইহলোকের ছবি ফুটেছে, যে জীবনচর্যার চিত্র দেখা দিয়েছে তা সর্বভারতীয়, একান্তভাবে বাঙলা দেশের নয়। মথুরা বৃন্দাবন ভৌগোলিক অর্থে চিরকালই অবঙ্গীয়। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীর বস্তুনিষ্ঠা ও জীবন-রস-রসিকতা সীমিত, স্থায়ী পরিণামহীন ও সর্বভারতীয়।

মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙলাদেশের মাটির ধন, বাঙালী জন-জীবনের সৃষ্টি; তাতে নিঃসন্দেহে বাঙালীর জীবন-স্পন্দন অনুভব করা যায়। যে সামাজিক তাগিদে এ-কাব্যগুলির জন্ম, যে প্রাণের গরজে এদের পরিকল্পনা—তা কবিদের জীবনধর্মিতা ও ঐহিক চেতনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ বিশেষ দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার মঙ্গলকাব্যগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য. কিন্তু ভুললে চলবেনা, বিশেষ এক জীবন ও সমাজের দায় মেটাতে গিয়েই দেবতা-মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। ফলে মঙ্গলকাব্যেও প্রত্যক্ষ সমাজ-চিত্র আছে, আছে জীবন-প্রতীতি। অবশ্য তাতে আছে এক অসম্ভবের রাজ্যও—বেহুলা যে যমপুরীতে যাত্রা করেছিলেন, তা আসলে ভেলার পথ নয়—শূন্যচারী কল্পনা ও বিশ্বাসের পথ। তবু জীবনকে কেন্দ্র করেই যেন তার টানা-পোড়েন, তার বয়ন-বিস্তার। উজানী নগরের বেনেবউ সোনার সংসার পেতেছিলেন—স্বামী চাঁদবেনে ও কন্দর্পের মতো পুত্রদের নিয়ে। সে সংসারে একদিন এলো সর্বনাশ—ফলে সনকার আর্তনাদে চম্পক নগর কাঁদে। বেহুলার লোহার চাল সিদ্ধ হলো কি না হলো সেটা বড়ো কথা নয়—বড়ো কথা হচ্ছে, দুর্দশাগ্রস্ত একটা সোনার সংসারের মর্মন্তুদ আর্তি। তাই তো মনে হয়, মঙ্গলকাব্যগুলি গভীরতর জীবন-প্রেরণার সৃষ্টি।

শাক্তপদে এই জীবন-রস-রসিকতা ও বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক বোধ আরও বেশি গভীরভাবে বিতত হয়ে আছে—অন্ততঃ আগমনী ও বিজয়া গানে। সমাজ-মানস বা সমাজ-নির্ভর ব্যক্তিচেতনা থেকে এই জাতীয় গানের জন্ম। বাঙলার ঘরে ঘরে যে কান্না এমন কি আজও কিছু না কিছু শোনা যায়—তা-ই গান হয়ে শাক্তকবিদের কানে বেজেছে। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার শাসনে পারিবারিক ও সাংসারিক ক্ষেত্রে আর্তি কি কম—যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, সে সন্তানের বুকে বেদনা জাগায়; যে কন্যা অল্প বয়সে স্বামীগৃহে যেতে বাধ্য হয়, সে মাতৃহৃদয়ে হাহাকার সৃষ্টি করে! শাক্তপদাবলী এমনিতর সমাজ-বেদনারই মর্মস্পর্শী গীতিকাব্য।

এইভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—বাঙলা সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠতা ও জীবন-রস-রসিকতার নানা প্রকারভেদ আছে। যে সমস্ত কাব্য আর্য-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল এবং সংস্কৃত কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত ও নানা পুরাণসম্ভূত—তাদের মধ্যে সর্বকালীন জীবনাদর্শ প্রতিফলিত। এবং তাদের বস্তুতান্ত্রিকতায়ও বিশেষ কোন যুগ ও সমাজের রঙ নেই। সুতরাং বাঙলা সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্য হিসেবে তারা মূল্যহীন। বৈষ্ণব সাহিত্য সর্বভারতীয় হলেও তাতে বাঙলাদেশের মাটির গন্ধ একটু আধটু পাওয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক ভাবধারার ওপর, সমসাময়িক লৌকিক সমাজবোধের ওপর নয়। কোথায়ও কোথায়ও কাব্যের চরিত্রগুলি মাটির মানুষ নয়। সে ক্ষেত্রে কবিদের বস্তুনিষ্ঠতা বিচার করতে হবে অলৌকিক চরিত্র-গুলির মানবীভবনের (humanisation) পরিমাণ থেকে। গিরিরাজ মেনকার আবেগ-সূত্রে শিব-উমাকে জামাতা-কন্যারূপে গ্রহণ, শিব ও বিষ্ণুর মতো শ্রেষ্ঠ দেবতাকেও অন্তরঙ্গ মানবসম্বন্ধে বন্ধন, মর্তের ধূলি-ধূসরতায় নামিয়ে এনে দেবদেবীর মধ্যে ইহ-লৌকিক ভাব ও আবেগ সৃষ্টির প্রয়াস সেই মানবীভবনের পরিচয়

দিয়ে থাকে। কিন্তু এই মানবীভবনে আদিম মানবতাবোধ অভিব্যক্ত, য়ুরোপের রেণেসাঁস যুগের নূতন হিউম্যানিজম্ নয়।

আর রূপকথায় অতিরঞ্জিত অসম্ভব কাহিনীর অন্তরালে লোক-জীবনের বাধাবিপত্তি ও স্বপ্নকামনা, ব্রতকথায় দেবদেবীর মহিমার কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের বিবরণ, ছড়ায় লোকমনের নানা ভাবানুভূতির অভিব্যক্তি এবং প্রবাদে বাঙালীর রসপ্রেরণা, বস্তুনিষ্ঠ চেতনা, প্রাকৃত ও প্রত্যক্ষ জীবনবোধ—এককথায় বাঙালীয়ানার—প্রকাশ ঘটেছে। এই সমস্ত জনগণোদ্ভূত লৌকিক সাহিত্যের লিখিত রূপের বিশেষ কোন নিদর্শন নেই এবং ছড়া ও রূপকথা ছাড়া অন্য দুটিকে সাহিত্যও বলা যায় কিনা সন্দেহ। তৎসত্ত্বেও বাঙলা দেশের মাটির সৃষ্টি হিসেবে এদের পরিচিত আবহাওয়া ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অস্বীকার করার উপায় নেই।

পূর্বে বলেছি, ধর্ম প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা। তারপর দেখতে পেলাম, জীবন-রস-রসিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতাও বাঙলা সাহিত্যের স্বরূপভূত। এই দুই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষ বিরোধ আছে বলে মনে হয় না। একটা উদাহরণ দিতে চাই। বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যে তন্ত্রের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। যেমন বৌদ্ধতন্ত্র (বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান), বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম, শাক্ততন্ত্র, নাথধর্ম, কাপালিকধর্ম, অবধূতমার্গ ও বাউল সাধনা। কিন্তু এই সব তন্ত্র কখনই দেহাতীত বৈরাগ্যমুখিন বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গীয় বা ভাবমার্গীয় সাধনা নয়—ইহাদের ভিত্তিতে আছে দেহাশ্রয়ী কায়া-সাধনা। অদ্বয় সত্যের দ্বিবিধ রূপ যে শিব-শক্তি —যাদের অবিচ্ছিন্ন জৈবিক প্রবাহ সংসারে প্রবৃত্তির পথে নিত্য চলেছে—তা আমাদের দেহের মধ্যেও রয়েছে। দেহই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি, সমস্ত জৈবিক সৃষ্টি প্রবাহের আধার, সকল তত্ত্বের বাহন ও ধর্মসাধনার পথ। দেহের মেরুদণ্ডের নিম্নস্থা শক্তিকে উল্টো-মুখে ঊর্ধ্বগামিনী করে মেরুদণ্ডের ঊর্ধ্বস্থ শিবের সঙ্গে মিলিত

করে সত্যলাভ তন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্য। এক কথায়, ইন্দ্রিয়ের পথে ইন্দ্রিয়াতীতে যাওয়া তন্ত্রের মূল কথা। সুতরাং তন্ত্রে যে কায়া-সাধনা ও দেহভাবনা স্বীকৃত, তা বস্তুনিষ্ঠ ও জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এবং সেই কারণেই বস্তুতান্ত্রিক। কোন বিশুদ্ধ ধর্মমত নয়, তন্ত্ররঞ্জিত ধর্মকে আশ্রয় করে বাঙলা সাহিত্যের বিপুল অংশ গড়ে উঠেছে বলেই তন্ত্রবিধৃত বাস্তবতা, দেহনিষ্ঠা ও জীবনা-সক্তি তাতে দেখতে পাই। এতেই প্রমাণ হয়, একই বিষয়কে যেমন অংশতঃ ধর্মদর্শন, তেমনি অংশতঃ বস্তুনিষ্ঠার দিক থেকে বিচার করা চলে।

এই ধর্ম-প্রাধান্য প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের আরও কয়েকটি সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যসূত্র নির্ধারণ করা যেতে পারে। আমাদের সাহিত্যে মাতৃকাতন্ত্রের আধিপত্য দেখতে পাওয়া যায়। শিবের সঙ্গে গৌরীর, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কল্পনা তার বিশিষ্ট প্রমাণ। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, নাথপন্থী ইত্যাদি নানা তান্ত্রিকধর্মে কায়াসাধনায় নারী অপরিহার্য—কালচক্রযানের প্রজ্ঞা, বজ্রযানের নৈরাত্মা, সহজযানের শূন্যতা শক্তিরূপিণী। দেবতায় নয়, দেবীতেই যেন বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যের দৃষ্টি অধিকতর নিবদ্ধ। এই মাতৃতন্ত্র-প্রাধান্য অনার্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবের ফল, অবশ্য তার সঙ্গে সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতি-কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাছাড়া, বাঙলা সাহিত্যে শুদ্ধ, অমূর্ত ও বিশুষ্ক জ্ঞানচর্চা ও ধর্মদর্শনের প্রভাব দেখা যায় না। মহাযানের অবিকৃত বিজ্ঞানবাদ বা মধ্যমক দর্শন, উচ্চস্তরের সূক্ষ্ম আর্য-ভাবুকতা বা বিশুদ্ধ জৈনধর্ম বা বেদান্ত দর্শনের ছায়াপাত আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। যে ধর্মমত রসসম্ভাবনাময়, রূপাশ্রয়ী ও বর্ণগন্ধযুক্ত বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যে তারই সমাদর দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মের ক্ষেত্রে রূপ ও রসের প্রতি এই যে প্রবণতা, তার ফলে বাঙলা সাহিত্যে নীরস মুক্তিসন্ধানী বৈরাগ্য-মুখিনতার প্রকাশ অনুপস্থিত। যে মুক্তির কথা বাঙলা সাহিত্যের উপজীব্য তা অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তি। সুতরাং

দেখা যাচ্ছে, বৈরাগ্যবিমুখ ইহযোগী অধ্যাত্মসাধনা বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম ভাবসূত্র।

বাঙালীর বস্তুনিষ্ঠতা ও জীবন-রস-রসিকতা সাহিত্যেও কিছুটা রূপরসবিশিষ্টতা এনেছে। বিভিন্ন ধর্মাত্মক সাহিত্যের মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়ভাবনাকে বাঙলা সাহিত্য একেবারে অস্বীকার করেনি, এমন কি অস্পষ্ট মরমী তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে তা ধরা পড়ে। সবচেয়ে বড়ো কথা, দেবদেবীর প্রতি মানবিক দৃষ্টি-ভঙ্গি, মানুষের প্রতি জৈবিক অনুরাগ, জীবনের প্রতি আবেগ ও আসক্তি প্রাচীন সাহিত্যের রূপরসবিশিষ্টতার উদাহরণ। আমাদের কবিরা সেকালে নীরস বৈরাগ্যের জয়গান করেননি, মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিকে হৃদয় ও অনুভবের ওপর স্থান দেননি। কবিদের তাত্ত্বিক সংস্কারের উৎসে দেব-দেবীর জন্ম হয়েছে, সন্দেহ নেই—কিন্তু সেই সব দেবদেবী বিশুদ্ধ জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে নয়—অনুভবের কাঁপন-লাগা হৃদয়ের পথ বেয়েই সাহিত্যের খাস দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শুধু দেব-চরিত্রের কথাই বা বলি কেন, মানবচরিত্র-গুলিকেও রূপ ও রসের মূর্তি নিয়ে সাহিত্যযাত্রা করতে দেখি। যেখানে প্রথার আনুগত্য বেশি, ক্ষমতার ন্যূনতা দুর্নিরীক্ষ্য নয়—সেখানে সৃষ্টির মধ্যে হয়তো রূপরসবিশিষ্টতা ও হৃদয়ধর্মিতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তবু সার্থক রচনাগুলিতে এ দুটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং আধুনিক-পূর্ব বাঙলা সাহিত্যের সূত্র হিসেবে হৃদয়ধর্মিতা ও রূপরসবিশিষ্টতাকে গ্রহণ করতে হবে।

তবে অনাধুনিক যুগেই ধর্মের পরিমণ্ডল থেকে বাঙলা সাহিত্যের মুক্তির কিছু প্রয়াস দেখতে পাই—ধর্মের একটানা প্লাবনের তুলনায় তা তৃণখণ্ডের মতো তুচ্ছ হলেও সত্য ঐতিহ্য। এর প্রথম উদাহরণ মুসলমানী প্রণয়গাথা—রোসাঙের মুসলমান কবিদের রচনা। সেদিনকার আরাকানের হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইস্‌লামী সংস্কৃতির সুন্দর সাযুজ্যই ছিলো সেই সব রোমণ্টিক প্রণয়গাথার উপযুক্ত পটভূমি। সতী ময়নামতী ও চিতোরের রাণী পদ্মাবতীর কাহিনীতে একটা

সহজ জীবন-প্রতীতি ও প্রেমের তন্ময়তার পরিচয় আছে, আছে লোকজীবনের স্বভাবজ রসের স্ফূর্তি। সুফী আদর্শের রঙ যদি তাতে লেগেও থাকে, তবু তাতে ধর্মের আনুষ্ঠানিক অংশের অত্যাচার নেই। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার প্রেমগাথাগুলিও জীবনাশ্রিত মানবপ্রেমের রসাস্বাদে পরিপূর্ণ। সেই প্রেমে সাধনা আছে, আধ্যাত্মিকতা নেই। তা বিরাট আকাশের নীচে নীল বনান্ত প্রদেশে রক্তপুষ্প রঞ্জিত বন্যবীথিতে, দীনেশচন্দ্রের মতে, স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু মন্দির জুড়ে বসেনি। এর পরে নিধুবাবুর গানেও ফুটে উঠেছে মানুষের হৃদয়ের অনন্ত সম্ভাবনা, ধর্ম ও শাস্ত্রের কুহেলিকা থেকে প্রেমের মুক্তির সূচনা। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের পথে বুর্জোয়াতন্ত্রের উন্মেষের দিনে জাতির মানসিক ভাব-পরিবর্তনের এই আভাসে একটা নতুন ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত আছে।

বাঙলা সাহিত্য (এমন কি আধুনিক যুগের বিরল ব্যতিক্রমের উদাহরণ সত্ত্বেও) বুদ্ধিধর্মী নয়। অন্যভাবে বলা যায়, বাঙলা সাহিত্যে আর্যমনের প্রকাশ—Pure reason ও Practical reason খুব বেশি দেখা যায় না। বিশুদ্ধ বৌদ্ধ, জৈন, বেদ-বেদান্ত বা ব্রাহ্মণ্য মনন-সমৃদ্ধ সাহিত্য বাঙলা ভাষায় রচিত হয়নি। তবে গভীরতর ভাব ও ভাবনা, চিন্তা ও মননের যেটুকু অভিব্যক্তি আছে তা সর্বভারতীয় আর্য-সূত্র থেকেই এসেছে। বাঙলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিচার বিশ্লেষণে, ব্যাকরণ ও অভিধানচর্চায়, ধর্ম ও ব্যবহারশাস্ত্রের অনুশীলনে—বিশেষ করে মধ্যযুগের নব্য-ন্যায়ের তর্কে যে মনীষা ও বুদ্ধিবাদের পরিচয় আছে তা কখনও বাঙালীর আত্মভূত হয়নি। কোন শক্তি জীবনকে আলোড়িত করতে না পারলে, গভীরভাবে স্পর্শ করতে সক্ষম না হলে তা কখনও জীবনের সৃষ্টির ক্ষেত্রে শুচির সত্য হয়ে ওঠে না। বাঙালীর অনুশীলিত মননধর্ম কখনও সাহিত্যের জগতে সৃষ্টির সত্যে পরিণত হয়নি। এই কারণেই বাঙলা সাহিত্যে যেটুকু শক্তি সঞ্চারিত, তা বাঙালীর প্রাণশক্তির পরিচায়ক, বুদ্ধিশক্তির নয়।

বাঙলা সাহিত্য স্পষ্টতঃই শ্রেণী-চেতনার সাহিত্য। এই শ্রেণী-চেতনা একদিকে সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করেছে, অন্যদিকে আশ্রয় করেছে সামাজিক বর্ণভেদকে। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই শ্রেণী-চেতনাকে নিঃসংশয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। চর্যাপদ রচনার যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মী কবিরা সংস্কৃত ভাষাতেই কাব্য রচনা করতেন, অন্যদিকে অব্রাহ্মণ্যধর্মীরা সৃজ্যমান বাঙলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। সুতরাং বাঙলা সাহিত্যের উৎস-মূলেই দেখা যাচ্ছে ধর্মগত বিভেদ-বুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ। আর এই ধর্মকেন্দ্রিক শ্রেণী-চেতনা ছিলো বলে আমরা প্রাগাধুনিক যুগে বৌদ্ধসাহিত্য, শৈবসাহিত্য, শাক্তসাহিত্য ইত্যাদির সন্ধান পাই। বাঙলা সাহিত্যের হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের পরিকল্পনার মূলেও আছে এই একই সত্য।

দ্বিতীয়তঃ বর্ণভেদে যে শ্রেণী-চেতনার প্রকাশ, তা সামাজিক সত্য হিসেবেই বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গীভূত। কোম-বিভক্ত অনার্যদের পারস্পরিক আহারবিহারগত বিধিনিষেধে যে বিভেদের সূচনা, তা-ই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের আওতায় বিভিন্ন বর্ণ-ব্যবস্থায় বিন্যস্ত হয়। চর্যাপদে একদিকে যেমন 'ব্রাহ্মণ নাড়ি-আর' কথা আছে, অন্যদিকে তেমনি 'ডোম্বি' (ডোমনী), 'কাপালি জোই' (যোগী), 'চণ্ডাল,' 'শবর' ইত্যাদির কথা আছে। বর্ণগত বিভেদ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ছিলো বলে ব্রাহ্মণদের কাছে নিম্নবর্গের লোকেরা অস্পৃশ্য; আবার নিম্নবর্ণের চোখে ব্রাহ্মণরা 'নাড়িআ' (নেড়ে) মাত্র। কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলে শুনি—'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়। কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাড়।' কালকেতুর কাছে ভাঁড়ু দত্তের আত্মপরিচয় হচ্ছে—কুলে শীলে সে উত্তম; ঘোষ বসু মিত্রের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে; তাছাড়া 'গঙ্গার দুকূল কাছে, যতেক কায়স্থ আছে মোর ঘরে করয়ে ভোজন।' নগর-পত্তনেও বর্ণবিন্যাসের পুরো চেহারাটা দেখা যায়, এমন কি মুসলমানদের জাতিবিভাগের বিষয়েও। আর এই বিভিন্ন

বর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ মধুর ছিলো বলে মনে হয় না। ভাঁড়ু দত্ত (কায়স্থ) ও মুরারী শীলের (বেনে) বর্ণনায় শুধু নির্মল হাস্যরসই নেই, ব্রাহ্মণ মুকুন্দরামের অব্রাহ্মণ চরিত্রের প্রতি বিদ্রূপের রসও আছে।

তৃতীয়তঃ এই বর্ণ-বিন্যাস প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাসের কথা এসে পড়ে। প্রাচীন বাঙালীর ধনসম্বলের সূত্র ছিলো কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। কিন্তু নিজেদের ইচ্ছা ও শক্তি অনুযায়ী ধনোৎপাদনের পন্থা নির্বাচনের অধিকার সমাজে স্বীকৃত হলো না। এক কথায়, বাঙলাদেশে ধনাধিকার বা জীবিকা বর্ণনির্ভর। যেমন বর্ণ, তেমনি বৃত্তি। বৃত্তিসীমা যেখানে বর্ণের দ্বারা নির্দিষ্ট—সেখানে সমাজের সমস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো বর্ণবৃত্তীয় হওয়া স্বাভাবিক। তবে ধনোৎপাদনের তিনটি সূত্র থাকলেও বহুবর্ণের অস্তিত্বের জন্য অনেক শ্রেণী দেখা যায়। সুতরাং আমাদের দেশে বর্ণভেদ অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চর্যাপদে তাঁতী, ডোম ইত্যাদির খবর পাওয়া যায়—এরা বর্ণে যেমন নিম্নজাতীয়, তেমনি বৃত্তিতে ছিলো দিনমজুর শ্রেণীর ভূমিহীন কৃষিজীবী ও কারুজীবী—কেউ কার্পাস ও চীনা ধান উৎপন্ন করে, কেউ বা বাঁশের চাঙ্গাড়ি তৈরি করে, তাঁত বোনে। এদের বারে বারে উল্লেখে রাষ্ট্রের কর্ণধার, কণ্টক, আমলাতন্ত্র ইত্যাদির প্রতি একটা কটাক্ষ থাকা স্বাভাবিক। অন্যদিকে শিবায়নের কথা ধরা যাক। পুরাণের শিব অনাসক্ত ও অকিঞ্চন, কিন্তু শিবায়নের শিব ভিখারী। কেন ? কারণ তিনি অলস, কৃষিকাজে তাঁর মন নেই। কৃষক দেবতা শিবকে অক্ষম ও অযোগ্য ঘোষণা করার পেছনে উচ্চবর্গের সামাজিকের অর্থনৈতিক গূঢ় অভিসন্ধি আছে বলেই মনে হয়। আর প্রাগাধুনিক ব্রতকথায় ও মঙ্গলকাব্যে বণিকতন্ত্রের প্রাধান্য বাঙলা সাহিত্যের শ্রেণী-চেতনার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের এই মর্মগত শ্রেণী-চেতনা একটা বৃহত্তর সামঞ্জস্যে বিধৃত। জাতি ও সংস্কৃতির আলেচনায় আমরা যে

সামঞ্জস্য বা সমন্বয়ধর্মের সন্ধান পেয়েছি, বাঙলা সাহিত্যের শ্রেণী-মুখিতাও সেই বৈশিষ্ট্যের শাসন না মেনে পারেনি। শুধু শ্রেণী-চেতনার কথাই বা বলি কেন, অনাধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সামগ্রিক ঐতিহ্যে, তার নানা ভাবে ও বিশিষ্টতায় এই সামঞ্জস্যের কথাটি বড়ো হয়ে আছে। আর্য ও অনার্য, পৌরাণিক ও লৌকিক, দেশী ও বিদেশী ভাবানুষঙ্গে বাঙলা সাহিত্য তাৎপর্যময়, কোন একটি পথ ধরে আমাদের দেশজ কবিদের মন কোন কালেই অভিসার করেনি। তাঁদের সামনে বরাবরই নানা পথ, নানা চিন্তা, নানা লক্ষ্য। অথচ সব মিলিয়ে এককের সূত্র ও সমন্বায়িত আদর্শের উদ্ভব।

এবার ভাববৃত্তের আলোচনা ছেড়ে রূপবৃত্ত আলোচনা করা যাক। প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্যের রূপবন্ধের (form) ঐতিহ্য বিস্ময়কর নয়। বরং গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন। চর্যাপদের 'পদ' একটি প্রাচীন রূপবন্ধ—তার উৎপত্তি প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ কবিতা থেকে। এই 'পদ' স্বভাবতঃই জয়দেবের পদাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ; কিন্তু তাতেও শেষ পর্যন্ত প্রাকৃত উৎসের কথাই এসে যায়, কারণ গীতগোবিন্দের আদর্শও ওই প্রাকৃত কবিতা। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌', 'বিক্রমোর্বশীয়' ইত্যাদি নাটকের প্রাকৃত (এবং অপভ্রংশ) গীতগুলির সঙ্গেই জয়দেবের পদাবলীর গঠন-সূত্র গ্রথিত। এবং চর্যাপদেরও সেই একই অবয়বগত ঐতিহ্য। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে লোকসঙ্গীত বা ভাষাগীতের প্রভাবও স্মরণীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গীতগোবিন্দ ও চর্যাপদের আদর্শ প্রাকৃতগীত ও ভাষাগীত—সংস্কৃত খণ্ড কবিতা নয়। দশ-বারো চরণের মাত্রিক রীতির রাগরাগিণীসম্বলিত ছোট পদ সংস্কৃতে নেই। উদ্ভট কবিতা, শিবাষ্টক ইত্যাদির দাবি এ-প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা স্বীকার করেননি। সঙ্গীতশাস্ত্রের দিক থেকেও দেখা যায়, চতুর্ধাতু ও ষড়ঙ্গমূলক অভিজাত প্রবন্ধ-সঙ্গীতের তিনটি ধাতু ও দুটি অঙ্গ মাত্র চর্যাপদে আছে—সুতরাং পূর্ণায়ত ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের কৌলিন্য চর্যার

প্রাপ্য নয়। বরং বিষমধ্রুবা গায়নরীতি (সমধ্রুবার সঙ্গে) এবং গোণ্ড্কিরী ও শাবরীর (গোণ্ড ও শবর উপজাতির স্মৃতিবহ) মতো লৌকিক সুরের উল্লেখ চর্যাগীতির অনভিজাত লোকায়ত উৎস নির্দেশ করে।

প্রাকৃত কবিতা ও ভাষাগীত বাঙলা সাহিত্যকে দান করেছে যে রূপবন্ধ—পদ—তা বাঙলা লিরিকের গোড়ার কথা। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে আধুনিক লিরিকের সঙ্গে প্রাগাধুনিক লিরিককে এক করে ফেলার সম্ভাবনা থেকে যায়। পদের সীমায়িত পরিসর ও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিনিষ্ঠ সুর আধুনিক লিরিকের লক্ষণাক্রান্ত, সন্দেহ নেই—তবু ভাবানুষঙ্গের প্রাতিস্বিকতা ও মন্ময় বচনবিন্যাসের দিক থেকে তাদের পুরোপুরি কবিকুলের আত্মক্ষেপ বলে মনে হয় না। বরং একটা প্রথাসিদ্ধ মনোভাব ও প্রচলিত কবি-সংস্কার প্রাচীন পদাবলীর অনেকাংশে অনুস্যূত হয়ে আছে। সুতরাং 'পদগীতিই' এদের সঙ্গত অভিধা—লিরিক নয়।

এই পদগীতির আদর্শের উদ্ভব সাহিত্যের একেবারে সূচনাকালে—তারপর বৈষ্ণব পদাবলীতে তার ব্যাপক অনুসরণ। কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনেরা চর্যার সন্ধ্যা ভাষা, তাত্ত্বিক ও আনুষ্ঠানিক ভাবনিরিখ এবং প্রায় নীরস রচনারীতির চেয়ে জয়দেবের কোমল-কান্ত ও অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত পদাবলীরই ভক্ত ছিলেন—গীত-গোবিন্দের ঐতিহ্যই বরণ করে নিয়েছিলেন। তারপর পদগীতির আদর্শধারা দীর্ঘকালের খাত পেরিয়ে শাক্তপদাবলীতে রূপ নেয়। অস্বীকার করার উপায় নেই, কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, তর্জা ইত্যাদিও পদচূর্ণ বা পদরূপান্তর ছাড়া কিছু নয়। এই পদ-গীতির প্রবাহ বিচিত্র গতিতে চলতে চলতে উনিশ শতকের ঈশ্বর-গুপ্তের আমলে এসে থমকে দাঁড়ালো—নতুন রূপবন্ধের প্রয়োজন অনুভূত হলো বাঙলা কাব্যে। সুতরাং পদগীতির আদর্শ আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রবিষ্টমূল, যদিও সব যুগে তার সমান ফসল ফলেনি।

মণি গেঁথে গেঁথে তৈরি হয় মণির মালা—তেমনি পদগীতির মালা হলো অনাধুনিক পর্বের রসপর্যায় কাব্য। প্রতিটি বৈষ্ণব পদ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। আসল কথা, রসশাস্ত্রের নির্দেশনায় বৈষ্ণব মহাজনেরা পদ রচনা করতেন, তাই তাঁদের পদাবলী রসপর্যায় অনুসারে বিভক্ত এবং অনিবার্যভাবে রসের সূত্রে পরস্পর সম্পৃক্ত। 'বাল্যলীলা' থেকে 'প্রার্থনা' পর্যন্ত কবিদের রসদৃষ্টির ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস আছে বলেই পদগীতির এই জাতীয় মালাকে রসপর্যায় কাব্য বলতে চাই। কিন্তু রসের সূত্রের বদলে কাহিনীর সূত্রে বা ছকে যেখানে পদগীতির গ্রন্থিবন্ধন, সেখানেই আখ্যায়িকা কাব্যের আত্মপ্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন তার প্রথম মৌলিক নিদর্শন। চৈতন্যচরিত কাব্যগুলিও এখানে স্মরণীয়। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, সঞ্জয়ের মহাভারত, অনুবাদাত্মক দুর্গামঙ্গল এবং কৃষ্ণলীলা কাব্যগুলিও আখ্যায়িকা কাব্য—কিন্তু তাতে পৌরাণিক (সংস্কৃত) কাব্য ও শাস্ত্রের রূপাদর্শ অনুসৃত। তাই আমার প্রস্তাব, প্রথমটির নাম দেওয়া হোক লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্য, দ্বিতীয়টির চিরায়ত আখ্যায়িকা কাব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খণ্ড খণ্ড পদগীতির ক্রমান্বিত বিন্যাস এক সুস্পষ্ট আখ্যায়িকার রূপবন্ধ গড়ে তুলেছে। সমগ্র কাহিনীর দৃষ্টিকোণে প্রতিটি খণ্ড পদের যেমন মর্যাদা আছে, তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবমূর্তি হিসেবেও তাদের তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। পদগীতিসুলভ স্বনিষ্ঠতার জন্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন কোন পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি পেয়েছে। কাব্যটি থেকে বোঝা যায়, বাঙলা পদগীতি অলিখিত লোকপুরাণ ও সংস্কৃত আখ্যায়িকা কাব্যের কথাভাগের ছকে লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্যের রূপ ও রীতির জন্ম দেয়। লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্যের এই প্রাথমিক চেহারায় কালক্রমে এসে পড়ে আরও নানা প্রভাব—তার বিচিত্রাঙ্গ বিবর্তিত হয়, তার অবয়ব হয় সুগঠিত।

মঙ্গলকাব্যগুলিও লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্য—তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো তাকে শুধু পদগীতির মালা বলা যায় না, তার মধ্যে পাঁচালীর প্রেরণা রয়েছে অনেকখানি। পূজানুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ও নাচ সহযোগে যে গান করা হতো, তাকেই পাঁচালী বলা হয় (যখন গদ্যে প্রচলিত ব্রতকথা 'পদ'-এর রূপবন্ধে পদ্যে পরিণত হলো, তখনই পাঁচালীর উদ্ভব)—কালক্রমে নাচ উঠে গেলো, পাঁচালী হলো মঙ্গলগীত। মেয়েদের মঙ্গলগীতেরই বর্ধিত ও পরিপুষ্ট রূপ পুরুষদের মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যের কথাভাগে এসে মিলেছে ব্রতকথা ও আদিম পুরাণের আখ্যান—হয়তো বৌদ্ধ জাতকের গল্প, জৈন কথানক, ব্রাহ্মণ্য পশুকাহিনী ও সংস্কৃত কাহিনী কাব্যও দূরাগত গৌণ ঐতিহ্যরূপে কাজ করেছে। তার পাঁচালী সুরের মধ্যে ক্রমে ধ্বনিত হয়েছে মঙ্গলরাগ, পঞ্চ লক্ষণযুক্ত সংস্কৃত পুরাণ প্রভাব বিস্তার করেছে তার বহিরঙ্গে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মঙ্গলকাব্যের কায়ার সঙ্গে পদগীতির সম্পর্ক কতটুকু? তার উত্তরে বলতে চাই, যে পাঁচালী গান থেকে প্রত্যক্ষভাবে মঙ্গলগীত ও মঙ্গলকাব্যের জন্ম, তারও উদ্ভব আদি পদগীতি থেকেই। মঙ্গলগীতের সুরের প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে কাহিনীর প্রাধান্য দেখা দেওয়ায় যেমন মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি, তেমনি পদগীতির সঙ্গে যখন বাদ্যযন্ত্র ও নাচের ঐশ্বর্য এসে মিলেছে—তখনই পাঁচালী গানের উৎপত্তি। সুতরাং পাঁচালীর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের সম্পর্ক স্বীকার করে নিলে পরোক্ষভাবে পদগীতির সঙ্গেও তার সম্পর্ক স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক আর একটি যুক্তি দিতে পারি। মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণব পদের মধুর স্পর্শে আঠারো শতকে শাক্ত পদধারার সৃষ্টি— খণ্ড খণ্ড পদগীতির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের একটা আদি-সম্পর্ক ছিলো বলেই মঙ্গলকাব্য এমন সুন্দরভাবে খণ্ড পদগীতিতে আবার রূপান্তরিত হতে পেরেছে বলে মনে হয়।

মানবদেহের যেমন নানা অঙ্গ, পূর্ণায়ত মঙ্গলকাব্য নামক

আখ্যায়িকা কাব্যেরও তেমনি চতুরঙ্গ—বন্দনাংশ, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও কবির আত্মপরিচয়াংশ, সৃষ্টিপ্রকরণ ও দেবখণ্ড এবং নরখণ্ড। বন্দনাংশের প্রথম ভাগে দেবদেবীর বন্দনা, দ্বিতীয়ভাগে দিগ্‌বন্দনা! সংস্কৃত পুরাণে এই দুই অংশই আছে—তবে মঙ্গলকাব্যের দিগ্‌বন্দনায় পৌরাণিক স্থান-মাহাত্ম্যের চেয়ে আঞ্চলিক স্থান-মাহাত্ম্যের প্রাধান্য। এই বাঙালিয়ানার মূলে বাঙালী কবির অপৌরাণিক স্বকীয়তা ও কৌমাগত আঞ্চলিক প্রীতি সক্রিয়। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও কবির আত্মপরিচয়াংশে কাব্যরচনার দৈবী প্রেরণার উল্লেখ পুরাণসম্মত—কিন্তু ভণিতার বদলে (যেমন চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদে আছে) আত্মজীবনের খুঁটিনাটি বাস্তব বর্ণনা বাঙালী কবির নিজস্ব জীবন-রস-রসিকতার পরিচায়ক—পরবর্তী-কালের স্মৃতি-সাহিত্যের (Autobiographical studies) আদিম রূপকল্প। সৃষ্টিপালা পুরাণে আছে, কিন্তু বাঙলা আখ্যায়িকা কাব্যের সৃষ্টিপালায় অনার্য, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, ইসলামী ও খৃষ্টীয় সৃষ্টিচিন্তার বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। এতে বাঙালী কবিদের সমন্বয়-মনীষার সন্ধান পাই। দেবখণ্ডে নানা পুরাণের ছায়া আছে; কিন্তু সব কাহিনী প্রায়ই লৌকিক বিশ্বাসের ঢঙে লেখা, তাতে অনেক অপৌরাণিক গালগল্পেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাছাড়া দেবখণ্ডে চাষপালা ও শিবদুর্গার গার্হস্থ্য জীবনের বর্ণনায় মর্তলোকের ছায়াপাত দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কোন কোন আখ্যায়িকায় নরখণ্ড নেই, আছে দেবতাদের মানবোচিত কার্যকলাপের কাহিনী—যেমন শিবায়নের শিব-দুর্গার আখ্যান। অর্থাৎ দেবখণ্ড ও নরখণ্ড অভিন্ন। মন্বন্তরাদির বর্ণনায় পুরাণের অনুসরণ হলেও মঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডের নানা কাহিনী—কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমন্ত, লাউসেন, বিদ্যাসুন্দর ও চাঁদ-সদাগরের আখ্যান কৌম পুরাণ ও লোকপ্রচলিত ব্রতকথা উপকথার মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছে।

সুতরাং লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্যের চতুরঙ্গ রূপবন্ধে পৌরাণিক উপাদান আছে; পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ,

বংশ, মন্বন্তর ও চরিতাখ্যানের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে তার পৌরাণিক লক্ষণের চেয়ে লৌকিক লক্ষণগুলিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বাঙালী কবির নিজস্ব পরিকল্পনায় পৌরাণিক অঙ্গগুলিরও নূতনতর সাজসজ্জা চোখে পড়ে। বন্দনাংশ থেকে নরখণ্ড পর্যন্ত আখ্যায়িকা কাব্যের রূপরেখা যে সূত্রে, যে ঢঙে এগিয়ে গেছে, তাতে পৌরাণিক ও লৌকিক আঙ্গিকের সমন্বয় ও বিবর্তনে একটা দেশজ রূপবন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। এই রূপবন্ধের চতুরঙ্গ যেখানে উপস্থিত, সেখানে যেন তা পূর্ণোপমার মতো পূর্ণপ্রস্ফুটিত; যেখানে তার এক বা একাধিক অঙ্গের অভাব, সেখানে লুপ্তোপমার মতো তার অঙ্গ-সঙ্কোচন!

'ব্রতকথার' স্বতন্ত্র রূপবন্ধের অর্বাচীন নিদর্শন মেলে। কিন্তু আমার মনে হয়, লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্যে তারও কিছুটা দান আছে। ষষ্ঠীব্রত, অষ্টলোকপালব্রত, শীতলাব্রত, লক্ষ্মীব্রত ইত্যাদি ব্রতকথায় মঙ্গলকাব্যের সব অঙ্গ নেই; তবু তাতে মানুষের সুখদুঃখ বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়—যেমন আছে মঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডে। শিবায়নের মৃগলুব্ধ ভাগে শিবরাত্রির উপবাস ও অর্চনার শেষে রাণী রুক্মিণী যে শিবরাত্রির কাহিনী—বিদ্যাধর চিত্রসেনের কথা শুনিয়েছিলেন, তা ব্রতকথা ছাড়া আর কি?

'রূপকথা' প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একটি সুন্দর রূপবন্ধ। আদি রূপকথার লিখিত রূপের সন্ধান স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না, তার আশ্রয় ছিলো লোককণ্ঠে। দীনেশচন্দ্রের অনুমান, আমাদের রূপকথার জন্ম তুর্কী আক্রমণের আগে বাঙালী মায়ের গভীরতম স্নেহ থেকে। মধুমালা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা ও ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর কাহিনী, সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠির গল্প আজও স্বতন্ত্র মর্যাদায় আমাদের আকর্ষণ করে—কিন্তু তাদের প্রাচীন রূপ অলভ্য। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য রূপকথা-উপকথাকে কম-বেশি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়

'কাজল রেখা' উপাখ্যানে রূপকথার আদল দেখতে পাই; 'মলুয়ায়' রূপকথার লক্ষণ সবচেয়ে বেশি প্রকট। যে মন পবনের নাও-এ চড়ে নায়িকা নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তা রূপকথার অতল সমুদ্রে পাড়ি দিতেই অভ্যস্ত।

এই রূপকথা-উপকথা থেকেই অনাধুনিক কালের গাথাকাব্যের (Ballad) সৃষ্টি। মুসলমানী প্রণয়-গাথাও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে, কথাপ্রধান ছড়ারও একটু আধটু দান থাকা স্বাভাবিক। এই গাথাকাব্যের নিদর্শন আছে পূর্ববঙ্গ-গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতী, লীলাকঙ্ক ইত্যাদি কাহিনীতে। ইংরেজী court ballade-এর যেমন নির্দিষ্ট রূপবন্ধ ও অনুশীলিত অঙ্গসজ্জা দেখতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত বাঙলা গাথাকাব্যগুলিতে তা নেই। তবু গীতি-আখ্যানগুলির মোটামুটি পুরো চেহারা আমরা বুঝে নিয়েছি। এই কাহিনীগুলির সঙ্গে কোন কোন কবির নাম জড়িত। প্রাচীন ইংরেজী ballad-এর বিশ্লেষণে শুনতে পাই—'It has even been supposed that a ballad is the spontaneous and joint composition of a group of people. Reflection shows, however, that this theory has little plausibility. There could be agreement for the purpose of poetry among a number of people only in the sharing of a passion, and the work of an artist or several successive artists has to be recognized in a ballad of any length. It was artists, however primitive, who interpreted the multitude. Once a ballad existed, the public did in some sort collaborate in its making, for memory altered, modified, or suppressed, and new circumstances suggested opportune additions.' পূর্ববঙ্গ-গীতিকার অন্তর্গত গাথাকাব্যগুলি সম্পর্কেও পাঠকদের এই উক্তি মনে করিয়ে দিতে চাই। তবে

ইংরেজী ballads-এর সঙ্গে নৃত্য যেমন জড়িত ছিলো, বাঙলা গাথা-কাব্যগুলির সঙ্গে নৃত্য তেমনি জড়িত ছিলো বলে মনে হয় না। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসকারের মতে প্রাচীন ballad সঙ্গীত নয়, কিন্তু 'গীতিকা' শব্দ প্রয়োগ করে দীনেশচন্দ্র পূর্ববঙ্গ গাথা-কাব্যগুলিকে সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েছেন। অবশ্য গল্পাংশ প্রাচীন ইংরেজী ballad ও বাঙলা গাথাকাব্য উভয়েই রয়েছে।

বাঙলা দেশের নিজস্ব কাব্যিক রূপবন্ধ 'ছড়া'। এর উৎপত্তি প্রাচীনতম কালেই। ছড়ার তিনটি বৃত্ত—গাথাপ্রধান ছড়া, মন্ত্র জাতীয় ছড়া ও ছেলেভুলানো ছড়া। অন্যান্য রূপবন্ধে ছড়ার যেমন দান আছে, তেমনি তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদাও আছে। ছড়ার গড়নের ইতিহাসটা একটু বিস্ময়কর। সাধারণ সাহিত্যে আগে ভাব, পরে রূপ ; প্রথমে রস, তারপর ভাষা। কিন্তু ছড়ায় রূপ থেকে ভাবের, ভাষা থেকে রসের উদ্ভব। ছড়ার তিনটি ঢঙের নিদর্শনই আমরা পেয়েছি—যদিও আদি চেহারায় নয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে যে ঘুমপাড়ানী গান আছে—তা ছড়ার অস্তিত্বের একটি প্রাচীন প্রমাণ। প্রাচীন বাঙলায় আরও নানা রকমের পদ ও গান সৃষ্টি হয়েছিলো, সন্দেহ নেই। দাঁড়ী মাঝিরা নদীর বুকে ভাটিয়ালি সুরে গান গেয়ে দাঁড় বেয়ে চলতো, রাজমিস্ত্রীরা ছাদ পেটাবার সময় গাইতো এক রকমের গান। সাঁওতাল হাঙ্গামা ও তিতুমীরের বিদ্রোহ নিয়ে অর্বাচীন কালে যে ছড়াগান রচিত হয়, তা প্রাগা-ধুনিক যুগের পল্লী বাঙলার সাধারণ মানুষের অন্তঃসলিল রসানুভবের উত্তরপুরুষ মাত্র।

আধুনিক-পূর্ব বাঙলা সাহিত্যের রূপবন্ধের এই হচ্ছে মোটামুটি পরিচয়। এর মধ্যে একটা লক্ষণীয় দিক আছে। বিচিত্র ধর্মবৃত্তে বাঙলা সাহিত্যের বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যেমন একটা সমন্বয়ের আদর্শ আছে, বাঙালীর জাতি-মানসে যেমন সাংকর্যের কথাটি বড়ো হয়ে আছে—তেমনি সেকালের সাহিত্যের রূপবন্ধেও সমন্বয় বা ঐক্যের আদর্শ হয়েছে স্বীকৃত। সকল সম্প্রদায়ের

লেখকরাই তখনকার সাহিত্যের রূপবন্ধ নির্বাচনে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হতেন—বৈষ্ণব সাধকের যা আঙ্গিক, মুসলমান কবির আঙ্গিকও তা-ই, শাক্তদের মাধ্যমের সঙ্গে শৈবদের মাধ্যমের কোন পার্থক্য নেই। কাব্যে এই উদার রূপ-সাধনার সমুত্থান ঘটেছিলো বলেই আমরা সেকালের সৃষ্টিতে একটা নিগূঢ় সমাস্বাদ্যতার সন্ধান পাই।

নতুন কালের রূপরেখা

বাঙলার মাটিতে ইংরেজ শাসনের শিকড় একদিনে ছড়িয়ে যায়নি, ধীরে ধীরে বণিকধর্মী রাজতন্ত্র আপন অধিকার বিস্তার করেছে। পলাশীর যুদ্ধে তার আনুষ্ঠানিক সূচনা—কিন্তু তার আগেই জাতির মেরুদণ্ড গিয়েছে ভেঙ্গে, নবাবী শাসনের ব্যর্থতায়। তা না হলে হাজার হাজার জনতার ভিড় মুর্শিদাবাদের পথে ক্লাইভের মুষ্টিমেয় সৈন্যকে ঢিল ছুঁড়েই নিকেশ করে দিতে পারতো, বখতিয়ার খিলজির আঠারো সেনার দাপটের মুখে গৌড়বঙ্গের অধিবাসীদের মতো অপদার্থতার ইতিহাসে বিশ্বজোড়া নাম কিনতো না। প্রথমে কয়েকটি অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের তদারকি, তারপর বাঙলা বিহার উড়িষ্যায় দেওয়ানি, ক্লাইভের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা, কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মধ্য দিয়ে বণিকের মানদণ্ড দেখা দিলো রাজদণ্ড রূপে। অন্যদিকে দিশি অর্থনীতি চূরমার হয়ে গেলো, আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য হলো সংকটাপন্ন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মরিনি আমরা—এ কবির সঙ্কীর্ণ আত্মরতি মাত্র, আসলে মরেছে বাঙলার কৃষক, মরেছে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি। অন্যদিকে বণিক ইংরেজের ব্যবসায়ে সাহায্য করে দেখা দিলো এক নতুন আর্থিক সম্প্রদায়—বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি ইত্যাদি। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বাঙলার বাজারে বিলিতি শিল্পজাত দ্রব্য ছড়িয়ে পড়লো, তার চাহিদা বাড়াবার জন্যে দেশীয় শিল্পের কণ্ঠরোধ করা হলো। অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির বদলে এলো শাসক-ঘেঁষা শোষণমূলক অর্থনীতি।

তাতে নিম্নশ্রেণীর দারিদ্র্য বাড়লো, নবাবী আমলের বৃত্তিধারী মধ্যবিত্ত হলো জীবিকাহীন।

সুতরাং উনিশ শতকের গোড়ায় দেখি, দেশের বুকে ইংরেজ শাসন ও আর্থিক শোষণ। শিক্ষার বালাই ছিলো না বললেই চলে। নবাবী আমলের সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের আশ্রয়ে শিক্ষাসংস্কৃতির যেটুকু চর্চা ছিলো, হাল আমলের ধনতান্ত্রিক জমিদারের অনাগ্রহে তা-ও বন্ধ হয়ে গেলো। কোম্পানীর বাজেট-দাক্ষিণ্যে সংস্কৃত (কাশী) আর মাদ্রাসা (কলিকাতা) কলেজ স্থাপিত হলো বটে—তবু জনশিক্ষার প্রসার ঘটলো না, বার্ষিক বরাদ্দ লাখ টাকাও খরচ হলো না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভূমি-কৌলিন্যের বদলি কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগে গ্রামভারী মূর্খতা নিয়ে দেশ দুঃস্বপ্ন দেখছে।

শিক্ষার পিঠ পিঠ আসে সাহিত্য-সংস্কৃতির কথা। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে উচ্চশ্রেণীর জীবনের আদর্শ নিম্নমুখী, ষড়যন্ত্র-লোভ-লালসার পঙ্কে কলঙ্কিত; জনসাধারণ আশাভরসাহীন, দিক্‌ভ্রান্ত। কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের জাদুস্পর্শে সমাজে আলোড়ন আসেনি, রাজনৈতিক পরিবর্তন কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করেনি। ফলে সাহিত্যেও চলেছিলো বৈষ্ণবগীত আর মঙ্গলকাব্যের ক্ষীণ গতানুগতিকতা, রসরুচিবর্জিত টপ-তর্জা-খেউড়-পাঁচালী-কবিগানের স্থূলতা। কবিদের মানসিক তপশ্চর্যার কোন সাক্ষ্য সাহিত্যে নেই, এক ধরণের আদিরসপ্রবণতা ও রিরংসাপ্রিয়তাই বিস্তারলাভ করেছিলো। শাক্ত পদাবলী, রামপ্রসাদ ও নিধুবাবুর গানের শোধিত ভক্তিমাহাত্ম্য ও জীবন-প্রতীতির কথা মনে রেখেও এ-মন্তব্য করা যেতে পারে। বাঙলা গদ্যেরও তখন শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি—শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চত্বরে নিতান্তই 'হাঁটি হাঁটি পা পা' অবস্থা।

ধর্মক্ষেত্রেও সঙ্কটের অন্ত ছিলো না। হিন্দুরা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, বিচিত্র শাস্ত্র-উপশাস্ত্রের ঘূর্ণাবর্তে বিভ্রান্ত।

কৃত্রিম বিধিনিষেধের অজস্র উপলখণ্ডই তখন সমাজের খাত ভরিয়ে রেখেছে, যথার্থ ভক্তির স্রোত গেছে শুকিয়ে। উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলেই আচারনিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ নয়। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, মায়াবাদের ছুতো ধরে অনেকে তখন ইহকালের কর্তব্যকর্মকে এড়িয়ে চলেছে। দীর্ঘকালের প্রাণহীন হিন্দুধর্মে সংশয় আর জিজ্ঞাসা ভেতরে ভেতরে জেগে উঠছে। সেদিনের এই বিকৃত ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহের ফাটল ধরে খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণের নিগূঢ় জাল পাততে দেখি। তাঁরা স্কুল প্রতিষ্ঠার নামে, বিনামূল্যে বাইবেল বিতরণের ছলে, নির্ভরযোগ্য জীবিকা-সংস্থানের অজুহাতে ধর্মপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ও অবিকৃত ছিলো না।

আসল কথা, সেই যুগের বাঙালীর জীবনাদর্শে ঘুণ ধরেছিলো—তা জিজ্ঞাসার অভাবে, কৌতূহলের অনস্তিত্বে স্থবির ও আড়ষ্ট হয়ে এসেছিলো। কারণ 'জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়তা। যেমন জীবনীশক্তির নিরুদ্যমেই অস্বাস্থ্য, তাতেই যত রোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, তেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই ভালোমন্দ সমস্ত কিছুকেই বিনা প্রশ্নে অলস ভীরু মন যখন মেনে নিতে থাকে তখনই মনুষ্যত্বের সকল প্রকার দুর্গতি। জড়ের মধ্যে যে অচল মূঢ়তা, মানুষের মন যখনই তার সঙ্গে আপসে সন্ধি করে তখন থেকে জগতে মানুষ মনমরা হয়ে থাকে, জড়রাজার খাজনা জুগিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধ্বংস হয়ে। পঙ্গু মনের ছিলো না আত্মকর্তৃত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিলো। সে যা শুনেছে তাই মেনেছে, যে বুলি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই বুলিই সে আউড়িয়েছে।…নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নূতন প্রণালীতে বর্তমানকালীন সংসার-সমস্যার সমাধান করার দ্বারা আত্মাবমাননায় তার সংকোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের ধারা এদেশে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল

দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলেনি, পিছনের কালকেই ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করেছে—চিন্তাশক্তি যেটুকু বাকি ছিল সে অনুসন্ধান করতে নয়, অনুসরণ করবার জন্যেও।'

তবে সেদিনকার সামাজিক অবস্থার মধ্যেই একটা পরিবর্তনের আভাস-ইঙ্গিত নিহিত ছিলো। সব কিছু যেন একটা চরম অবস্থার শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলো। এর পরে হয় নতুন দিকে মোড় ফিরতে হবে, নয় ধ্বংস হতে হবে। পরিস্থিতিটা ছিলো দ্বিধা, সন্দেহ, সঙ্কট আর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। রামমোহনের আত্মপ্রকাশ এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের দিনে।

রামমোহনের ধ্যানে ও কর্মে নতুন কালের নয়া জীবনবাদ কতখানি আত্মপ্রকাশ করেছিলো, সে আলোচনা 'রামমোহন' প্রসঙ্গে হবে। কিন্তু সমসাময়িক কতকগুলি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সংস্কার দানের কথা উল্লেখ না করলে তখনকার বাঙলাদেশের মানসিক মুক্তির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রামমোহন কলকাতায় আসেন ও ধর্মান্দোলন শুরু করেন আঠারো শ' চোদ্দয়, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় সতেরোয় এবং প্রথম বাঙলা সংবাদপত্রের প্রকাশ ঘটে আঠারোয়। বিশেষ কোন এক সন-তারিখে নতুন যুগের অঙ্কুর হঠাৎ গজিয়ে ওঠে না, অভিনব জীবনাদর্শ পূর্বের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা স্বয়ম্ভু শক্তিও নয়—তার জন্য জাতির মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকে অনেকদিন আগে থেকেই, তবু রামমোহন-হিন্দু-কলেজ-সংবাদপত্রের নতুনবৃত্তেই নবজাগৃতির ব্যাপকতর সূচনা, সন্দেহ নেই। আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলো, শ্রীরামপুর মিশন তাদের অন্যতম। আগের কথা বাদ দিয়ে উনিশ শতকের শুরু থেকে চতুর্থ দশক পর্যন্ত মিশনের কার্যকলাপ বিচার করলে দেখা যায়,—বাঙালীর পারত্রিক কল্যাণই শুধু নয়, তাদের ঐহিক মুক্তিও যেন মিশনারীদের কাম্য ছিলো। তাঁদের বাইবেলের

অনুবাদ ও সাময়িক পত্র সম্পাদনের পশ্চাতে দেখি ধর্মের এষণা; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন, প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙলা কাব্যপুরাণের পুনঃপ্রকাশ, ব্যাকরণ-অভিধান ইত্যাদি রচনায় (খৃষ্টানধর্মের সঙ্গে বিজড়িত) লোক-কল্যাণের আদর্শটিও দেখতে পাই। 'India must be won to christ'—এ কথা মিশনারীদের প্রকাশ্য সঙ্কল্প, কিন্তু এই সঙ্কল্পেই বিদেশী সংস্থাটির সার্থকতা সন্ধান করলে চলবেনা—বৃহত্তর বিশ্বের প্রতি, নানা জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্বন্ধে কৌতূহল জাগানোর মধ্যে সেই সার্থকতা সন্ধান করতে হবে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০০) কথাও একটু উল্লেখ করতে চাই। বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে এর বিশিষ্ট স্থান অনস্বীকার্য, কিন্তু সংস্কৃত ও মুসলমানী কাব্য, কাহিনী, ব্যাকরণ, অভিধান ও শাস্ত্রের মুদ্রণের দ্বারা কলেজটি প্রাচ্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ হয়ে উঠেছিলো। আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা এখান থেকেই—যদিও দেশজ শিক্ষার্থীরা তার সুযোগ পায় হিন্দু কলেজের আমলে।

নবযুগের মর্মমূলে বেগসঞ্চারের কাহিনীতে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী (১৮১৭), কলিকাতা স্কুল সোসাইটী (১৮১৮), গৌড়ীয় সমাজ (১৮২৩), লেডিজ সোসাইটী ফর্ নেটিভ্ ফিমেল এডুকেশন (১৮২৪) ও অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েসনের (১৮২৮) কথা বড়ো হয়ে আছে। স্কুল বুক সোসাইটী পাঠযোগ্য বইপত্র মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব নেয়, মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করে তরুণদের মনে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জাগায়—আর তারই অনিবার্য পরিণতিতে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসে স্কুল সোসাইটী। ১৮১৯ সালের ১৩ই মার্চের সমাচার-দর্পণ থেকে জানতে পারি—'কলিকাতা স্কুল সোসাইটী সকল বাঙ্গলা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন…। বোধ হয় যাদৃশ তাহাদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর ২ প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা…পণ্ডিত গুরু

মহাশয়দিগের সাহায্য করিবেন।' 'এই স্কুল সোসৈয়িটি স্থাপন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ পূর্ব্বে হওনের সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতো হিন্দুকলেজের ছাত্রদের যে পর্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই···(৮ই মার্চ, ১৮২৩)।' মনে রাখতে হবে, ইতিপূর্বে স্কুল বুক সোসাইটী সম্পর্কেও পত্রিকাটির সংবাদ ছিলো উৎসাহজনক —'পাঠশালার পুস্তকাদি প্রস্তুত করণ সম্প্রদায়···সম্প্রদায়েরদিগের কর্ম্ম এই পাঠশালার কারণ উপযুক্ত পুস্তকাদি এতদ্দেশীয় ভাষাতে ও অক্ষরে প্রস্তুত করা···ইহাতে এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র লোকের জ্ঞান যেমত অস্তমিত আছে তাহাতে এমত ভরসা হয় যে এই নিবন্ধ ও অন্য ২ নিবন্ধ দ্বারা সে জ্ঞানোদয় হইবে (১৮১৮)।'

'এতদ্দেশীয় লোকেদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে' গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা। স্কুল বুক সোসাইটীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জন আষ্টেক বিশিষ্ট দেশীয় ব্যক্তি আর সকলে ছিলেন ইংরেজ—কিন্তু গৌড়ীয় সমাজে এসে যোগ দিলেন দেশের প্রগতিবাদী ও সংরক্ষণশীল অনেক ব্যক্তি—একদিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর দল, অন্যদিকে রাধাকান্ত, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও ভবানীচরণের গোষ্ঠী। প্রগতিবাদীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও সংরক্ষণশীলতার দিকেই যেন সমাজের ঝোঁক ছিলো বেশি, তবু সনাতন বিদ্যা ও সমাজচিন্তার মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় সমাজ বাঙালীর নিজেকে চেনার কাজে সহায়তা করেনি কি? ব্যাকরণাদি নানাবিধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 'এক অপূর্ব্ব বিদ্যালয়' সংস্কৃত কলেজ। এই কলেজটিকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর চিন্তাজীবী ও লেখকের আবির্ভাব তখনকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই।

অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েসান ডিরোজিওর অমর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এবং অতি-প্রগতিবাদী চিন্তা ও কর্মের উৎস। হিন্দু-

কলেজ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর এই সংস্থাই ছিলো ডিরোজিওর নতুন বাণী ঘোষণার কেন্দ্র। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ীর যুগ্ম-সম্পাদনায় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভাও (The Society for the Acquisition of General knowledge) যুগগত জ্ঞানচর্চায় ও সামাজিক সমস্যার মূল্যায়নে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। উনিশ শতকের গোড়াতেই স্ত্রীশিক্ষার দিকে বিদ্বৎ-সমাজের চোখ পড়ে। লেডিজ সোসাইটী ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশনের কার্যধারার পুরো খবর আমরা পাইনি বটে, কিন্তু অনুমান করতে পারি, তার দান। সংবাদপত্রের ভূমিকা স্থানান্তরে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এখানেও সংবাদপত্রের উদার কর্ষণক্ষেত্রের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

মোট কথা, রামমোহনের আমল থেকে যে নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা ও চিত্তসঙ্কটের পূর্ণ প্রকাশ, তারই প্রতিক্রিয়া ও পরিণতিতে এই সব নানা সংস্থার সাহসিক পদযাত্রা।

রামমোহনের মৃত্যু ঘটে উনিশ শ' তেত্রিশে। তাঁর জীবিতকালে তিনি ছিলেন একটা ইনষ্টিটিউসান, শক্তি ও প্রভাবের উৎস—তাঁকে কেন্দ্র করে জাতীয় জীবনে নানা ধারা বইতে আরম্ভ করে। কিন্তু রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে সমাজে ও ধর্মে তাঁর প্রভাব ক্রমশঃ কমে আসে। ধর্মের ক্ষেত্রে রাজার বড়ো দান ব্রহ্মসভা—তাতে এককালে লোকের আকর্ষণ দেখা গেছে বেশ। কিন্তু রামমোহনের তিরোধানের পরে তা রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশের মতো মুষ্টিমেয়ের গায়ে ঠেকনা দিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে রইলো—রাত্রিতে বেদীর সামনে টিম্ টিম্ করে ছু' একটি আলো জ্বলতো বটে, ব্রহ্মসঙ্গীতও গাওয়া হতো বটে—কিন্তু আগের মতো সেই জৌলুস যেন আর রইলো না। বন্ধু আর অনুবর্তীরা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা হয়তো হারালেন না, কিন্তু সেই শ্রদ্ধা কাজে দেখানোর চেষ্টা দেখা গেলো কমই। শোনা যায়, প্রসন্ন ঠাকুরের মতো অনেকেই বাইরে রাজাপন্থী ছিলেন, কিন্তু ভেতরে পৌত্তলি-

কতার প্রশ্রয় দিতেন। এই অবস্থায় চলতে চলতে ব্রহ্মসভার ক্ষীয়মাণ অঙ্গে বেগ সঞ্চারিত হলো সেদিন, যেদিন দেবেন্দ্রনাথ (ঠাকুর) ও তাঁর বন্ধুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেন, ব্রাহ্মসমাজের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠা হলো। সেটা তেতাল্লিশ সালের কথা। শুধু তাই নয়, ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের মূল ভিত্তির পরিবর্তন ঘটলো। সূচনায় যে উপনিষদের পক্ষপুটে এই ধর্মের আশ্রয় দেখি, তার ভিত্তি গেলো টলে। ব্রাহ্মরা দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, উপনিষদে এক ঈশ্বরের কথা নেই, এক ঈশ্বরের সঙ্গে নৈতিক ও প্রেমের সম্বন্ধের কথাও নেই। তাই অবশেষে ব্রাহ্মধর্মের নতুন ভিত্তির সন্ধান পাওয়া গেলো—দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়—'দেখিলাম যে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের উপনিষদ-ভিত্তিক ব্রাহ্মধর্ম দেবেন্দ্রনাথের আমলে হৃদয়ভিত্তিক ব্রাহ্মধর্মের রূপ নিলো, রাজার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরিণত হলো মহর্ষির অদ্বৈতবাদে।

ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিলো অন্যদিকেও। আঠারো শ' উনচল্লিশে দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী সভার সূত্রপাত হয়। এ-সভা ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়। শুধু তাই নয়, য়ুরোপে রেণেসাঁস যুগে যেমন ক্ল্যাসিক্যাল বিদ্যার চর্চা আবার শুরু হয়েছিলো—তত্ত্ববোধিনীর (সভা ও পত্রিকা) উৎসাহে বাঙলা দেশেও ব্যাপকভাবে প্রাচীন জ্ঞান উদ্ধারের কাজ (যা রামমোহন প্রথম সূচনা করেন) ও প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রয়াস দেখা গেলো। নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায়ও তার উৎসাহের অন্ত ছিলো না। ছেচল্লিশে হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র উনিশ বছরের যুবক রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্ম হলেন, সমাজে তাঁর আর অক্ষয় দত্তের প্রতিপত্তি শুরু হলো। কিন্তু ক্রমে আবার সঙ্কট ঘনিয়ে আসতে দেখি। অক্ষয় দত্তের কলম রামমোহনের বিচারের ধারাকে শাস্ত্র থেকে নামিয়ে আনলো বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ যুক্তিবাদী অনুসন্ধানী জীবনের সাধনাই অক্ষয়কুমারের একমাত্র সাধনা হয়ে

দাঁড়ালো। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর যুগে দেবেন্দ্রনাথ নিলেন যুক্তিবাদ নয়, নীতিবাদ—ভৌমচেতনা ও ঐহিকবাদ নয়, ভগবৎ-চেতনা ও ঈশ্বরবাদের পথ। ফলে দুজনেব মধ্যে ভাবগত বিচ্ছেদ ঘটলো—কিন্তু সেই সঙ্কট-কালে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে চললো ব্রাহ্মসমাজ। আবার ব্রাহ্মসমাজের শিরায় শিরায় রক্তের জোয়ার আর চাঞ্চল্য এলো আঠারো শ' সাতান্ন সালে—সেদিন সেকালের বিরাট পুরুষ কেশবচন্দ্র সেন সমাজে যোগ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-ভক্তির ঝড়ো হাওয়া এলো, ব্রাহ্মসমাজ হয়ে উঠলো দেশের গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠান। ব্রাহ্মসমাজকেন্দ্রিক ও রামমোহনপন্থী এই আদর্শের ধারাকেই রিফর্মেসান আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

তারপর আসে কাউণ্টার-রিফর্মেসানের কথা। শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরা আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুর হীনত্ব প্রচারে ব্রতী হয়। তখন তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায়, সনাতন ধর্ম সংরক্ষণের তথাকথিত পবিত্র দায়িত্ব অঙ্গীকার করে একটা প্রাচীনতন্ত্রী দল আত্মপ্রকাশ করে। মিশনারীদের আক্রমণের মুখপত্র ছিলো—'সমাচার-দর্পণ' ও 'গস্‌পেল ম্যাগাজিন'; হিন্দুরা বের করলেন 'সম্বাদ কৌমুদী'। যুদ্ধ বেধে উঠলো, উভয় দিক থেকেই বাছা তীক্ষ্ণ শর নিক্ষিপ্ত হলো—এই পারস্পরিক কলহ-কলরবে আর কিছু না হোক হিন্দুদের নিজেদের চেনার সুযোগ ঘটেছিলো। রামমোহন মিশনারী আক্রমণ কালে রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের দলে ছিলেন—তার কারণ, এটা তাঁর কাছে জাতীয় মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার প্রশ্ন হিসেবেই দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু যখন তিনি নিজে ধর্মগত নব্যন্যায় ও হিতবাদী বস্তুনিষ্ঠা প্রচার করতে শুরু করেন—তখন সেই প্রাচীনপন্থী দলের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ না ঘটে পারেনি। তাই মিশনারী আক্রমণের কালে যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সহকর্মী, নতুনতর কুরুক্ষেত্রে তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর প্রধানতম শত্রু। যে প্রাণের গরজে ভবানীচরণ ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, সেই প্রাণের গরজেই চিরাচরিত হিন্দু-

ধর্মের ওপর রামমোহনের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে পারেননি। ভবানীচরণ শুধু কচ্ছপবৃত্তির সাধনা করেননি, প্রয়োজনবোধে ছোবল মারতেও কসুর করতেন না। রামমোহনের 'ব্রহ্মসভার' প্রতিদ্বন্দ্বী 'ধর্মসভার' প্রতিষ্ঠা রাজার তথাকথিত কালাপাহাড়ী অভিযানের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ ছাড়া কিছু নয়। 'মনুসংহিতা', 'উনবিংশ-সংহিতা', রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব', 'নব্য স্মৃতি' তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারা মতে পুনর্মুদ্রিত করে তিনি যেন রাম-মোহনের প্রভাবরোধী·বালির বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। কলিকাতা কমলালয়, নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস, দূতীবিলাস ইত্যাদি গ্রন্থগুলি তাঁর সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শরে-ভরা তূণ বিশেষ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভবানীচরণের সাহিত্য সাধনা, সংবাদপত্র সম্পাদনা ও সামাজিক আন্দোলন তখনকার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষা, কিছু বা আত্মপ্রতিষ্ঠার বিপুল প্রয়াসের প্রমাণ।

ভবানীচরণ ছাড়া এদলে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও আরও অনেকে। এঁরা শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন বলেই কলম নিয়ে এগিয়ে এলেন—তাঁদের অর্থ, সাহস ও প্রেরণা যোগালেন তখনকার দিনের হিন্দুসমাজের অর্থশালী নেতা রাধাকান্ত। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে প্রাগ্রসর চেতনার পরিচয় দিলেও রাধাকান্ত সতীদাহ নিরোধ আন্দোলনের ঘোর বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেন নি। এমন কি আইন পাশ হয়ে গেলেও সতীদাহ প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে সনাতনীদের যে দরখাস্ত বিলেতে পেশ করা হয়, তাতে রাধাকান্তের ভূমিকা বিশিষ্ট। আর শাস্ত্রবেত্তারাও রামমোহনের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে খোলাখুলি গালাগালি করতে ছাড়েন নি---তার প্রমাণ আছে কাশীনাথের 'পাষণ্ড পীড়নে'। ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে রামমোহনের ভক্ত ছিলেন বটে, তবে সামাজিক ও ধর্মগত আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণই প্রাচীনপন্থী। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতায়, সম্বাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় সেই প্রাচীনতন্ত্রের

স্বাক্ষর আছে। এইভাবে রক্ষণশীলতার ধারা আক্রমণাত্মক নতুন ভাবের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে চললো। হিন্দু কলেজের ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই ধারারই উত্তরসাধক। সুতরাং দেখতে পাই, রামমোহনের আমল থেকে যে নব্যতন্ত্রী রিফর্মেসান চলেছিলো, তারই প্রতিকূল একটা কাউণ্টার-রিফর্মেসানের ধারা সমাজে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে আগাগোড়াই বর্তমান ছিলো।

এই রক্ষণশীল ধারা জয়ী হতে পারেনি বটে, তবু তার গুরুত্ব অস্বীকার করে লাভ নেই। হয়তো এর ভূমিকা গতানুগতিক ও যুগবিরোধী, হয়তো বা সেই অর্থেই নেতিবাচক—তবু সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তার মূল্য ধরা না পড়ে পারে না, এক কথায় তাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা জানি, প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়া থাকে, প্রত্যেক অস্ত্যর্থক শক্তির পশ্চাতেই একটা নঙর্থক শক্তি কাজ করে—অন্যথায় মূল শক্তির সক্রিয়তা বজায় থাকে না, তা কার্যকরী হয় না। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক গুণের সংঘর্ষ ও মিলনই তো নতুন সৃষ্টির অপরিহার্য সর্ত। উনিশ শতকে নবযুগের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির যে উজ্জীবন শুরু হয়েছিলো, রক্ষণশীলতার বিপরীত খাত কি তাকে বিপথ থেকে রক্ষা করেনি? বিরোধিতার গায়ে ঘর্ষিত হয়েই কি নবযুগের সন্ধানী শায়ক তীক্ষ্ণধার হয়নি? বঙ্কিমের কালে দেখি, —সমন্বায়িত আদর্শের সাগর-সঙ্গম, অনেক পথে বিপথে পরিক্রমার শেষে, অনেক স্খলন-পতন-ত্রুটির খোঁচ-খাঁচ ডিঙ্গিয়ে সমাজ ও জীবনের আদর্শ এক নির্দিষ্ট খাতে বইতে শুরু করেছে। দেশের জীবনধারা ঘাটের বদলে আঘাটায় যে পৌঁছোল না, তার কিছুটা কৃতিত্ব এদের দিতেই হবে।

এবার রেভেলিউসানের (?) কথা বলা যাক। রামমোহনের মহাপ্রয়াণ যেমন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান। এই দুই উজ্জ্বল

ঘটনার অন্তবর্তীকালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ধারা কখনও শ্লথ গতিতে, কখনও বা অপেক্ষাকৃত বেগবান স্ফূর্তিতে এগিয়ে গেছে বটে—তবু তা দেশের প্রধান ভাবধারা ছিলো বলে মনে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, এ সময়ে দেশের নেতৃত্ব করেছেন ডিরোজিওর শিষ্যের দল। সেদিন হিন্দু কলেজের চত্বরে এক উনিশ কুড়ি বছরের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকের প্রতিভার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে কতকগুলি প্রাণের প্রদীপ জ্বলেছিলো—তাদেরই বিদ্যুচ্ছটায় কেউ চোখে পেয়েছিলেন আলো, কারও বা ঘটেছিলো দৃষ্টিবিভ্রম। সেই সব উল্লসিত জীবনের জলকল্লোল হিন্দু কলেজের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র কলকাতায়, কিছু বা বৃহত্তর বাঙলায় সাড়া তুলেছিলো, চমক সৃষ্টি করেছিলো। ইতিহাস এদের নাম দিয়েছে ইয়ং বেঙ্গল। ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শ ভালো কি মন্দ তার বিচার আসছে পরে—কিন্তু তার আগে স্বীকার করে নিতে হবে, সেদিনের ইয়ং বেঙ্গলের স্মরণীয় আবির্ভাবকে।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে ঢুকেছিলেন সহকারী শিক্ষকরূপে। পরে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক পদ লাভ করেন। তিনি ছিলেন কবি, বায়রণের বিশেষ ভক্ত, দর্শনে গভীর জিজ্ঞাসু—হিউম্ আর কাণ্টের অথরিটি, জাত-পড়ুয়া—অধ্যয়নে অধ্যাপনায় তাঁর কোন ক্লান্তি ছিলো না। সব চেয়ে বড়ো কথা—তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক ; ছাত্রদের মনে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল জাগিয়ে তোলা যদি শিক্ষকের প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে অধ্যাপক ডিরোজিওর তুলনা মেলা ভার। ক্লাশে, নিজের গৃহে, অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েসেনের সভায় তাঁর কণ্ঠে যে কথা ঘুরে ফিরে বাজতো, তা হচ্ছে—জিজ্ঞাসু হও ('I watch the gentle opening of your minds'), বিচার করো, সত্যনিষ্ঠ হও ('to live and die for truth')। তাঁর এই আলোর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন য়ুরোপের জ্ঞানের ভাণ্ডার, উপহার

দিয়েছিলেন আপন দীপ্ত প্রাণের মণিকা। তাঁর চিন্তায় কথায় আচরণে ছিলো নবযৌবনের উদ্দামতা, বলিষ্ঠ জীবনের অসঙ্কোচ, সংশয়বাদী মনের বিচারপ্রবণতা; তাই অচলায়তন হিন্দু সমাজের সন্তানেরা মধুমত্ত ভৃঙ্গের মতো ডিরোজিওর চার পাশে ভিড় করেছিলো—আপন আপন চিত্তবিকাশের আশায় ও আনন্দে। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন, মহেশচন্দ্র ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণা মুখুজ্যে, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

দেশকে রাতারাতি বিলেত বানিয়ে তোলার স্বপ্ন এঁদের অনেকে দেখতেন। যুগ যুগান্তরের জীবনযাত্রা প্রণালী, পারিবারিক বন্ধন, ধর্মের আনুগত্য ও নানা বিচিত্র সংস্কারের দাসত্ব থেকে মুক্তির আনন্দে ইয়ং বেঙ্গল উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলেন, সন্দেহ নেই। শুধু গরম গরম বক্তৃতাতেই এঁরা ক্ষান্ত ছিলেন না, লোক দেখিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খেতেন, দেবদ্বিজকে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা ও ঠাট্টা করতেন, খৃষ্টান সমাজের সঙ্গে হামেশা মোলাকাত করতে কুণ্ঠিত হতেন না। এক কথায়—কম-বেশি অনাচার করাটাই যেন তাঁদের আচার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। দক্ষিণা মুখুজ্যে বর্ধমানের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীকে বিয়ে করলেন—এ তো যে সে বিয়ে নয়, একই সঙ্গে বিধবা বিয়ে, অসবর্ণ বিয়ে ও আইনমাফিক বিয়ে। তার আগে গুজব রটেছিলো তিনি মেম বিয়ে করছেন। এর চেয়ে বিপ্লবাত্মক আর কি হতে পারে? রামগোপাল ঘোষকে রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, 'ইংরাজীওয়ালাদিগের অনভিষিক্ত রাজা।' চোস্ত ইংরেজীয়ানা তিনি রপ্ত করেছিলেন, পুরোদস্তুর বিলেতি হওয়াতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন অসামান্য গৌরব। প্রথম বিধবা বিয়েতে তিনি সবান্ধব সাড়ম্বরে বরযাত্রী হয়েছিলেন। উদ্দীপনাময় বক্তৃতায় তিনি হিন্দু সমাজের কুসংস্কারকে আক্রমণ করতেন—

যুবক সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করতেন চাঞ্চল্য। রেভঃ কৃষ্ণমোহন খৃষ্টান হয়েছিলেন। হিন্দু সমাজের নিন্দা করতে গিয়ে তিনি নাটক লেখেন, খৃষ্টান ধর্মের প্রসার কামনায় 'হিন্দু ধর্ম খৃষ্টান-ধর্মের পূর্ব সূচনা' নামক এক অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করেন। সেকালে যারা খৃষ্টান হতেন, তাদের পেছনে থাকতো কৃষ্ণমোহনের প্ররোচনা বা প্রেরণা। সেজন্যই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের তিনি ছিলেন প্রধান শত্রু। মহেশ ঘোষও খৃষ্টধর্ম নিয়েছিলেন এবং হাকিমী নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেন। রসিককৃষ্ণ গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করতে অস্বীকার করে সেকালে দেশে আলোড়ন তুলেছিলেন, রাধানাথ করেছিলেন গোমাংস খাওয়ার পরোক্ষ সুপারিশ। ইয়ং বেঙ্গলের এই তথাকথিত অনাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার বিবরণ ও তার প্রতিক্রিয়ার কথা পাওয়া যায় সেকালের সংবাদপত্রে। হিন্দু কলেজের ছাত্রের পিতা আর্তনাদ করতেন—'কি ঝকমারি কর‍্যে তোরে হিন্দু কালেজে দিয়েছিলাম', 'তোর জন্য আমার জাতিকুলমান সমুদয় গেল', 'এক ঘর‍্যে হইয়াছি ধর্মসভায় যাইতে পারি না।' তাদের এই 'গেল গেল' রবে একদিন ডিরোজিওর বিচার হলো, তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, তথাকথিত হিঁদুয়ানীর জয় হলো।

কিন্তু আজকের দিনে নিরপেক্ষ বিচারে মনে হয়—ইয়ং বেঙ্গলের এই উচ্ছৃঙ্খলতারও একটি কারণ আছে। দীর্ঘ দিন আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থা ও পরিবারতন্ত্রের কাছে ব্যক্তিতন্ত্র আপনাকে বিকিয়ে দিয়ে বসেছিলো, ব্যক্তিজীবন বিশিষ্ট ইউনিট হিসেবে আপন মর্যাদা পায় নি। তাই ইয়ং বেঙ্গলের ইতিহাস হচ্ছে পরিবারের শাসন ও সমাজের দাসত্ব থেকে ব্যক্তির প্রথম মুক্তির ইতিহাস। এবং তাতে উচ্ছ্বাস ও স্বেচ্ছাচারিতা, অতি-সাহস ও স্পর্ধা থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমাজে গতি সঞ্চারের কৃতিত্ব এঁদের দিতে হবে—ইয়ং বেঙ্গলের (এবং রামমোহনের) আলোড়নের ফলে দেশ অন্ততঃ ভাবতে

শিখেছে, নড়ে বসতে জেনেছে। তৃতীয়তঃ যুক্তি ও বুদ্ধির মন্ত্র প্রচারে, একটা যুক্তির আবহাওয়া সৃষ্টিতে ইয়ং বেঙ্গল সমর্থ হয়েছিলেন। চতুর্থতঃ সত্যানুরাগ, জীবনের শ্রেয়বোধ, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও ন্যায়বিচারের আদর্শ, সর্বমুখী ঔদার্য তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়েছে—সত্যি কথা বলতে কি, 'the college boy was a synonym for truth।' তাইতো গুরু ডিরোজিও বলেছিলেন—'And how you worship truth's omnipotence!' পঞ্চমতঃ স্কুল প্রতিষ্ঠায়, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে, বহু বিচিত্র বিদ্যাচর্চায় (স্মরণীয় : রামগোপালকে 'এজুরাজ' অর্থাৎ এডুকেটেড-দিগের রাজা বলা হতো), নানা সমাজসংস্কারমূলক কর্মপ্রচেষ্টায় ও সাহিত্যানুশীলনে ইয়ং বেঙ্গলের দান স্বীকার করে নিতেই হবে।

॥ দুই ॥

এবার আলোচ্য সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির অন্যান্য দিকের খতিয়ান নেওয়া যাক। রামমোহনের পরে শিক্ষার প্রসার ঘটলো বেশ কিছু। রাজা আমহার্ষ্টকে ইংরেজী ও আধুনিক শিক্ষার সপক্ষে চিঠি লিখেছিলেন আঠারো শ' তেইশে। তেত্রিশের সনদে সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতীয় নিয়োগের নীতি স্বীকৃত হওয়ায় বিলিতি শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হলো। লর্ড মেকলে কিছুকাল পরে সদম্ভে ঘোষণা করেন, ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষা নেটিভদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবে। কিন্তু আসলে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করবার জন্য একদল ভারতীয় দাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বর্ণে যারা কালো য়ুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা দিতে গিয়ে তাদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনাও জাগিয়ে ফেললেন শাসকসম্প্রদায়। ইংরেজী সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-রাজ-

নীতির সূত্রেই প্রাগ্রসর চিন্তা ও নতুন জগতের সঙ্গে তাদের পরিচয় হলো। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে আছে, হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়ানো হতো—একদিকে বেকন, সেক্সপীয়র, মিল্টন, পোপ, গ্রে, ইয়ং—অন্যদিকে ইউক্লিড, বীজ-গণিত, ত্রিকোণমিতি, কনিক সেকসন্‌, মিশ্রগণিত, মেকানিক্‌স্‌, অ্যাষ্ট্রোনমি এবং আরও কত কি! ইতিহাসের নামে ভারতীয় পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা ছিলো না—হিউমের 'হিষ্টরি অব ইংল্যাণ্ড' আর রাসেলের 'মডার্ণ য়ুরোপ', গিবনের 'রোমান এম্পায়ার' আর এলফিন-ষ্টোনের ইণ্ডিয়া, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস সেদিন পড়ানো হতো। শিক্ষার পুরনো রীতির সঙ্গে সঙ্গে এই নব্য রীতির প্রচার দেশের পক্ষে ফলপ্রসূ হয়নি কি?

রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য ও অনুবর্তীরা ধর্মের ব্যাপারে ততটা না হোক, শিক্ষার ব্যাপারে বেশ উৎসাহী ছিলেন। জোড়া-সাঁকোর দ্বারকানাথ আর তেলেনিপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ, রাজা কালী শঙ্কর ঘোষাল আর প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী আর দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এর ফলেই চৌত্রিশ সালের মধ্যে গোটা বিশেক মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো। ইয়ং বেঙ্গলের কেউ কেউ, বিশেষ করে রেভারেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন, দক্ষিণা মুখুজ্যে, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইত্যাদি শিক্ষা বিস্তারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে রাজনারায়ণ, ভূদেব, প্যারী সরকার, আনন্দ বসু, গিরীশ দেবের নামও করা যেতে পারে। উনপঞ্চাশে বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন বালিকা বিদ্যালয়—বেথুন স্কুল—বাঙলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে যার দান অসামান্য। তারপর ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তর এলো সাতান্ন সালে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায়।

এই সময়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার দৌড় কতখানি দেখা দিয়েছিলো, তারও হিসেব নেওয়ার দরকার আছে।

আমরা দেখেছি, রামমোহনের দৃষ্টিতে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব বিধাতার আশীর্বাদ, ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধির সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। তাঁর বন্ধু ও শিষ্যের দলও গুরুর এই মত পোষণ করতেন। শুধু রাজকার্যে ভারতীয়দের দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্নটাই তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তায় স্থান পেতো। স্মরণ করতে হবে, রিফর্ম বিল পাশ করাবার জন্য রামমোহনের উৎকণ্ঠা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজাগণের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে বিলেতে তাঁর সাক্ষ্য। তবে তিনি নীলকরদের পরোক্ষ সমর্থন করেছেন, বিলেতের সাক্ষ্যে কোম্পানীর কড়া সমালোচনা করেন নি, দেশের পল্লী অঞ্চলে য়ুরোপীয়দের বসবাস সমর্থন করেছেন। আসলে তখনকার দিনের রাজনৈতিক সুবিধাবাদের দিক থেকে এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন তিনি ও তাঁর শিষ্যের দল অনুভব করেন নি। দ্বারকানাথের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য : the happiness of India is best secured by the connection with your great and glorious country··· whose noble solicitude for the welfare and inprovement of millions. ইয়ং বেঙ্গলের অনেকেই ভারতে ইংরেজ শাসনের সমর্থক ও শাসকদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দিশি জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনেই ইংরেজের শাসন ব্যবস্থা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

এ হলো চিত্রের একদিক। অন্য দিকে দেখি, ভারতীয় প্রজাদের অসামান্য দুঃখ কষ্ট, শাসকদের নির্মম অত্যাচার। চব্বিশ সালে সাহেবদের নীলের চাষের সুযোগ দেওয়া হলো—প্রথম দিকে চাষীদের অসুবিধা না হলেও অবস্থা খারাপ হতে দেরি হলো না। নীলকরদের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ ধীরে ধীরে জমে উঠছিলো। তেতাল্লিশে যখন বাঙলা দেশে পৃথক শাসন ব্যবস্থা ও সরকারী দপ্তরখানার পত্তন হয়, তখন থেকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের চেতনা সঞ্চার হতে থাকে। সাহেবদের এদেশে বিচারের ব্যবস্থার জন্য যে ব্ল্যাক

অ্যাক্টসের প্রস্তাব হয়,তারই মধ্যে খানিকটা শাসক-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রামগোপাল ঘোষের মতো একজন ইয়ং বেঙ্গল এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। ডিরোজিওর ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তীর 'কুইল' পত্রিকা, বিলেত থেকে আগত উদারনৈতিক ইংরেজ জর্জ টমসনের বক্তৃতা, ইণ্ডিয়া সোসাইটী ও ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা, ইংরেজী বাংলা নানা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের প্রচলন রাষ্ট্রীয় স্বাধিকারবোধ ও জাতীয় চেতনা সৃষ্টিতে কিছুটা সমর্থ হয়েছিলো। দেশের নানা ক্ষেত্রে এই ভাবে যে দেশাত্মবোধ ও অসন্তোষের সঞ্চার হচ্ছিলো, সাতান্নর সিপাহী বিদ্রোহে হয়তো তারই প্রকাশ আছে।

আমরা দেখেছি, রামমোহনের আবির্ভাব কালে দেশজ অর্থ-নীতির ভিত নষ্ট হয়ে গেছে—ইংরেজ রাজত্বে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য বা বেনিয়ানি-মুৎসুদ্দিগিরির সুযোগে নতুন এক আর্থিক সম্প্রদায় গড়ে উঠছে। পূর্বে যেখানে সামাজিক মর্যাদা ছিলো বংশগত কৌলিন্যে, সেখানে হাল আমলে তার ভিত্তি হলো আর্থিক কৌলিন্য। আর সেই অর্থোপার্জনের অধিকার শুধু বিশেষ শ্রেণীর (অর্থাৎ বৈশ্যের) ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হলো না, তার অধিকার ব্যাপ্ত হলো সকল শ্রেণীর মধ্যে। যেখানে মধ্যযুগে প্রত্যেক শ্রেণীর পেশা ও সামাজিক রূপ (social status) ছিলো স্থির, সেখানে সব কিছুই নবযুগের বেগে অস্থির হয়ে গেলো। এটা যে একটা কত বড়ো সামাজিক বিপর্যয় বা রূপান্তর তা ভাবতেও অবাক লাগে।

অন্যদিকে এই সময়ের মধ্যেই আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে কলকাতা। ইংরেজের রাষ্ট্রিক ও অর্থ-নৈতিক বিলিব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে খাপ খায়নি—তাই কলকাতা হলো বিত্ত ও বিদ্যার, শাসন ও শোষণের পীঠস্থান। গ্রাম্য পঞ্চায়েত আর জমিদারের বৈঠকখানার বদলে রাজধানীতে গড়ে উঠেছে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত। গ্রামীণ বাঙলা

সাহিত্যকে সর্বতোভাবে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে দেখি ঈশ্বর গুপ্তের আমলে। ডালহৌসির শাসনকালে ডাক ও তার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো, রেলপথ সমস্ত দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করলো। পূর্তখাতে সরকারের খরচ বেড়ে গেলো অনেক। শুধু তাই নয়, নতুন যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোট খাটো কলকারখানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, কোটি কোটি টাকার মূলধন বিনিয়োগের সুযোগে এক নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও উদ্ভব ঘটলো। নবাবী আমলের বৃত্তিধারী মধ্যবিত্তের সঙ্গে এদের পার্থক্য অনেক। এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে আমাদের মোটামুটি পরিচয় হয় ছাপান্ন সালের মধ্যেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বের সংহতি (consolidation) ঘটেছে, ঘটেছে উন্নতি। সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বিক্ষোভও জমা না হয়ে পারে নি। সমাজ-চেতনায় তীব্রতর হয়েছে নতুন পক্ষে চলবার, নতুন জীবন গড়বার আহ্বান। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নবজাগরণের ব্যাপ্তি ঘটেছে দিকে দিকে, একটা গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়েছে ব্যক্তি ও সমষ্টি-মানসে। জীবনের পরিধি বিস্তৃত হয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে, তার চতুর্দিকে গণ্ডি যাচ্ছে ভেঙ্গে ভেঙ্গে। ঋদ্ধির এক নতুন দিগন্তে মানুষের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ, উদার উন্মুক্তির আহ্বানে তখন সে সতত চঞ্চল। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, বিক্ষোভ-বিপর্যয় আলোড়ন-আন্দোলনের ভেতর থেকে জেগে উঠছিলো একটা যৌবনবেগ, নয়া শক্তি। এক কথায়, রামমোহনের যুগ আরও এগিয়ে এসে একটা নূতনতর যুগের সৃষ্টি করে চলেছে।

৩ রামমোহন

এক অজন্মার কালে জন্মেছিলেন রামমোহন—তৃণলতাগুল্মের সমাজে বলিষ্ঠ বনস্পতি। দেশের মরামাটিতে তখন সুস্থ জীবনের সজীবতা নেই, জীবনে নেই প্রাণের বন্যা, প্রাণে নেই চৈতন্যের বহ্নিকণা। অচেতচিত্তের অভিশাপ নিয়ে ব্যক্তিমানুষ তখন মরণদশায় ধুঁকছে। আর গোষ্ঠীমানুষের পরিণতি ছিলো শুধু অপরিমিত সংখ্যার যোগফলে, সমগ্রের সঙ্গে অংশের যুক্তিসম্মত সম্বন্ধবিন্যাসে নয়। অনৈক্যের রন্ধ্রপথে সামাজিক শক্তির সঞ্চার হয় না, আরোপিত ঐক্যও অস্থিজ দৌর্বল্যের জন্যেই নঙর্থক—একমাত্র শ্রেণীগত সংঘাত-সংযোগে পরিবর্তমান ও প্রাণবান সমাজ-ধারায় শক্তির স্ফুরণ। সেদিনের বাঙলার সমাজে তা ছিলো না আর ছিলো না বলেই অন্ধ তামসিকতা ও অপবিদ্যার আধিপত্য ছিলো। তার পূর্বের ইতিহাসে দেখিতে পাই, নবাগত মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙলার জনসমাজ ভক্তির স্বর্ণমুদ্রায়—ভয়ে-ভীরু মানুষের শেষ তুরুপে—কিছু সাড়া জাগিয়েছিলো। কিন্তু ইংরেজ শাসনের উদয়কালে তা-ও নয়, শুধু আচার-নিয়মের জঞ্জালে বাঙালীর প্রাণধারা একচক্ষু হরিণের মতো ঘুরে মরছিলো। লৌকিক সমাজে আদিম প্রাণের গরজ কিংবা উচ্চমহলে বুদ্ধির মঞ্চচূড়ায় স্বাধিকারবোধের প্রশ্রয় থাকলেও তখনকার ইতিহাস এমন করুণ হতো না।

এমনি দিনে রামমোহন এসেছিলেন—পায়ের তলায় মানবতার শক্ত মাটি, পশ্চাতে আত্মবিশ্বাসের মেরুদণ্ড, সামনে সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট, অন্তরে কঠিন সাধনার আস্থা, বাহুতে অফুরন্ত কর্মশক্তি

নিয়ে। তাঁর কণ্ঠে ছিলো নৈয়ায়িক তার্কিকতা, দৃষ্টিতে ছিলো অর্বাচীন বিজ্ঞানবুদ্ধি। পরিবর্তনের অনিবার্যতায় তাঁর সন্দেহ ছিলো না, ইতিহাসের রূপরেখা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর পুরুষার্থ যুগধর্মের অনুকূলতায় দ্বিধা করেন নি। এমনি করে জাতির প্রাণ-পিপাসায় নতুন ভাবের জোয়ার বইয়ে দিলেন রামমোহন—এ যুগের ভগীরথ।

রামমোহন পরম বৈষ্ণবের সন্তান, ব্রাহ্মণকুলের বংশধর। প্রাক্-যৌবনেই কুলধর্ম ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিনি পিতার বিরাগভাজন হন। কিন্তু তাতেও তিনি পেছিয়ে যান নি। আসল কথা, ভক্তিরসমদির ও উচ্ছ্বাসধর্মী বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে তাঁর মনের ধাতের মিল ছিলো না। তিনি প্রথমে সংস্কৃত পড়েছিলেন, তারপর আরবী ফারসী ; একদিকে বেদ-বেদান্ত, অন্য দিকে কোরাণ। পরবর্তীকালে খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রও রামমোহন অধ্যয়ন করেন—গ্রীকে নিউ টেষ্টামেণ্ট, হিব্রুতে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট। কিন্তু নির্বিচারে ধর্মশাস্ত্রের শাসন মেনে নেওয়ার মানসিক প্রবণতা তাঁর ছিলো না। প্রথম যৌবনে মোতাজেলা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে, বিগত যৌবনে তন্ত্রের কাছ থেকে বুদ্ধি ও যুক্তির দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। গ্রীক গণিতশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র তাঁকে যুক্তিধর্মেই আস্থাবান করে তুলেছিলো। তাই ভগবানের প্রতিভূ দালাই-লামাকে বিদ্রূপ করতে, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত চৈতন্যকে নিন্দা করতে, বেদান্তকে মেনে নিয়েও শঙ্করভাষ্যকে অস্বীকার করতে রামমোহন দ্বিধা করেন নি। শুধু তাই নয়, বাইবেলের যে অংশ অলৌকিক গালগল্পে পরিপূর্ণ, তিনি তাকে গ্রহণ করতে আপত্তি করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মকে অলৌকিক ও অলীক বিশ্বাসের ধূম্রজাল থেকে উদ্ধার করা রামমোহনের জীবনের অন্যতম সাধনা ছিলো।

বেদ-বেদান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, আছে অদ্বৈতবাদের জয় ঘোষণা। ইসলামে একেশ্বরবাদ স্বীকৃত। খৃষ্টানদের মধ্যেও

ত্রিত্ববাদের (Trinitarianism) বিরোধিতা রয়েছে, রয়েছে একত্ববাদী (Unitarians) সম্প্রদায়। হিন্দুদের ব্রহ্মবাদ, মুসলমানদের 'মুত্তহ্‌হিদীন'-তত্ত্ব ও খৃষ্টানদের ঐক্যতত্ত্ব রামমোহনকে আকৃষ্ট করেছিলো। তাই তিনি বেদ আর বেদান্ত, বাইবেল আর গীতা, কোরাণ আর অ্যারিষ্টটল পাঠ করেছিলেন—এদের কয়েকটির সঙ্গে বাঙালী জাতির পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দুসমাজে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি লেখনী ধারণ করতে দ্বিধা করেন নি—ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, চারি প্রশ্নের উত্তর, গোস্বামীর সহিত বিচার, পথ্যপ্রদান, কবিতাকারের সহিত বিচার, সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্তসার ইত্যাদি রচনা করেন। গৃহস্থের ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার অধিকার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। খৃষ্টানধর্মের পরিহার্য ও পরিত্যাজ্য অংশের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদের প্রমাণ আছে ব্রাহ্মণ সেবধি ও সম্বাদকৌমুদীর পৃষ্ঠায়, পাদরি ও শিষ্য সংবাদে এবং The Precepts of Jesus—the Guide to Peace and Happiness ইত্যাদি গ্রন্থে, Unitarian Society প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে। তাঁর ইসলাম-ধর্ম-জিজ্ঞাসার উদাহরণ আছে নানা আরবী-ফারসী রচনায়, 'তুহ্‌ফাতুল্ মুত্তহ্‌হিদীন' গ্রন্থে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মকে সত্য, যুক্তি ও নীতির ওপর প্রতিষ্ঠা করা রামমোহনের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো। তাঁর প্রিয় একটি ফারসী বয়েতের কথা হচ্ছে—'ধর্ম জীবের সেবা ভিন্ন আর কিছু নয়। জপমালা, আলখাল্লা ও আসনে ধর্ম নেই।' শুধু তাই নয়, ধর্মের ক্ষেত্রে নিরালম্ব বিশ্বাসবাদ, পলায়নবাদ (escapism) ও মায়াবাদের ('which teach···to believe that all visible things have no real existence') বদলে সৃষ্টিচেতনা (cosmic consciousness), ঐহিক চেতনা (worldly consciousness) ও হেতুচেতনা অঙ্গীকার করার সঙ্কল্প তাঁর ছিলো। তবে মনে রাখতে হবে, পারত্রিক মুক্তিলাভের প্রেরণায় নয়, বাঙালীর নতুন জীবন-সংগঠনের প্রয়োজনে, সমসাময়িক

সামাজিক তাগিদে তিনি ধর্ম-আন্দোলন চালিয়েছিলেন। তার কারণ, ধর্মকে জীবন ও কর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাস ও চর্চার বিষয় হিসেবে তিনি কখনও দেখেন নি, তিনি ধর্ম ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় চেয়েছিলেন।

রামমোহনের ধর্মমতের এই আলোচনা একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। তাঁর স্ত্রী নাকি একদিন প্রশ্ন করেছিলেন—'ওগো, জগতে কোন্ ধর্মটি সত্য?' রামমোহন নাকি উত্তর দিয়েছিলেন—'জানো তো, গরু নানা রঙের হয়। কোনটার রঙ কালো, কোনটার সাদা। কিন্তু তাদের দুধ এক রঙেরই হয়, নানা রঙের হয় না। তেমনি সম্প্রদায়ভেদে ধর্ম বিচিত্র রকমের—কিন্তু তাদের মূল সত্য একই।'

রাজার ধর্ম-আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। সতীদাহপ্রথা নিবারণ তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। বিশেষ কারণ ছাড়া বহুবিবাহ করা অপরাধজনক বলে তিনি মনে করতেন—কারণ একাধিক বিয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আত্মহত্যার ঘটনাবলী। আসল কথা, রামমোহনের সামাজিক বোধ অত্যন্ত প্রখর ছিলো, সতীদাহ ও বহুবিবাহকে তিনি সামাজিক শক্তির অপচয় বলেই মনে করতেন। তাছাড়া, নারীত্বের এর চেয়ে বড়ো অমর্যাদা আর কিছুতেই হতে পারে না। বেন্থাম মিলের ভক্ত, হিউম্যানিজমের পূজারী ও মানবমুক্তির উপাসক রামমোহন এই দুই বিষয়ে আন্দোলন চালিয়ে আপন চারিত্র শক্তিরই পরিচয় দিয়েছেন। সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি সরকারের কাছে দরবার ও দরখাস্ত করেন, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তর্কাতর্কি করেন—সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদ রচনা করেন। হিন্দু নারীর দায়াধিকার দাবিও রামমোহনের একটি মহৎ প্রচেষ্টা। তাঁর মতে, শাস্ত্রানুসারে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী ও সন্তানদের সমান অধিকার আছে। এই ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বিধবারা বঞ্চিত বলেই সহমরণের ঘটনা

অবিরল, কারণ আর্থিক দুর্গতি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ ভালো। অন্যদিকে স্ত্রীকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হয় না বলেই পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করতে দ্বিধা করে না। সুতরাং নিজের সামাজিক ন্যায় ও নীতিবোধের তাগিদে, সহমরণবিরোধী আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে রামমোহন দায়াধিকার ও বহু-বিবাহনিরোধক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কন্যাপণের কদাচার সম্পর্কেও তাঁর মন সচেতন ছিলো। বিয়ের আর্থিক লেনদেন সমস্যার পরিণতি হচ্ছে বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা গ্রহণ ও তরুণীর অকাল বৈধব্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের সামাজিক আন্দোলন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়—তা সুচিন্তিত ও ব্যাপক সমাজচেতনারই প্রকাশ মাত্র। কুসংস্কার, কদাচার ও অবিচারের হাত থেকে নারী-সমাজের মুক্তি মানবাধিকারের (human rights) ক্ষেত্রে একটা বড়ো রকমের চার্টার। জাতিভেদ প্রথা তাঁর মর্মদাহের কারণ হয়েছিলো, 'বজ্রসূচি' গ্রন্থে তার দৃষ্টান্ত আছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রামমোহনের দান যুগান্তকারী। 'ইংরেজের হাতে পড়ে আমাদের জীবনের ও মনের যে আমূল পরিবর্তন ঘটবে, ভারত সভ্যতা যে নবকলেবর ধারণ করবে এ সত্য সর্বাগ্রে রাজা রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। সে যুগে তিনি ছিলেন একমাত্র লোক, যাঁর অন্তরে ভারতের ভবিষ্যৎ সাকার হয়ে উঠেছিল। তাঁর সমসাময়িক অপরাপর বাঙলা লেখকের লেখা পড়লে দেখা যায় যে এক রামমোহন রায় ব্যতীত আর কোনও বাঙালীর এ চৈতন্য হয়নি যে, নবাবের রাজ্য কোম্পানীর হাতে পড়ায় শুধু রাজার বদল হল না, সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনের মহাপরিবর্তনের সূত্রপাত হল। ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন সব নবশক্তি এসে পড়ল যার সমবায়ে ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষে একটি নূতন সভ্যতা গঠিত হবে। এবং সে সকল শক্তি যে কি এবং তার ভিতর কোন কোন শক্তি আমাদের জাতিগঠনের সহায় হতে পারে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন।···জাতীয় মনকে অবিদ্যার মোহ থেকে

উদ্ধার করবার জন্য রামমোহন রায় এদেশে ইউরোপীয় শিক্ষাকে আবাহন করে নিয়েছিলেন। যে-জ্ঞান সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু ছেরেপ কল্পনামূলক সে জ্ঞান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। রামমোহন রায় আবিষ্কার করেন যে, ইউরোপীয়দের অন্তত দুটি শাস্ত্র আছে, সত্য যার ভিত্তি। এক বিজ্ঞান আর ইতিহাস। এই বিজ্ঞানের প্রসাদে এ বিশ্বের গঠন ও ক্রিয়ার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় আর এই ইতিহাসের কাছ থেকে মানব সমাজের উত্থান-পতন পরিবর্তনের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়।...রামমোহন রায় দেশের লোককে এই সত্যমূলক ইউরোপীয় শাস্ত্রমার্গে সাধনা করতে শিখিয়ে গিয়েছিলেন।'

তাই সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে লেখেন, সংস্কৃত শিক্ষা 'to load the minds of youths with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society'. বেদান্ত শিক্ষাও যুগের উপযোগী নয়— 'Nor youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence' তাই তিনি অনুরোধ করেন 'to instruct the natives of India in Mathematics, Natural philosophy, chemistry, Anatomy and other useful sciences which the natives of Europe carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.' অর্থাৎ দর্শনমূলক সূক্ষ্ম শিক্ষায় নয়, বাস্তবধর্মী ব্যবহারিক শিক্ষার তিনি ভক্ত ছিলেন, কারণ দেশবাসীর মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক জীবনের উন্নতি তিনি কামনা করতেন। য়ুরোপের উন্নতির মূলে, রামমোহন দেখেছিলেন, খৃষ্ট ধর্মের প্রভাব নয়, লোকশিক্ষার প্রভাব। সামাজিক ও নৈতিক

অবনতির মূলে যে অবিদ্যা, গণমুখী শিক্ষাই তার উপযুক্ত প্রতিষেধক। অবশ্য গুরুমশায়ের পাঠশালা, মৌলবীর মক্তব ও পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী বন্ধ করে দেওয়ারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সরকারী সাহায্যে সীমায়িত ক্ষেত্রে তাদের অবস্থিতিতে তাঁর আগ্রহ ছিলো।

যাঁদের উদ্যোগে ইংরেজী শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, রামমোহন তাঁদের অন্যতম। কিন্তু পৌত্তলিক হিন্দুদের আপত্তিতে তিনি কলেজের সভ্যপদ ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি, কারণ শিক্ষার প্রসার তাঁর কাম্য ছিলো—ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির প্রসার নয়। প্রয়োজনবোধে তিনি নিজেই অ্যাংলো-বেঙ্গলী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ; সেখানে ইংরেজীর সঙ্গে বাঙলাও শিক্ষা দেওয়া হতো এবং সে-শিক্ষা ছিলো সম্পূর্ণ অবৈতনিক। আসল কথা, রামমোহন শিক্ষাকে বাস্তব ও কার্যকর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছিলেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের পটভূমিকায় রেখে শিক্ষাকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। এই প্রয়োজনমূলক শিক্ষাচেতনায় এসে মিলেছিলো মুক্তজ্ঞানের তাগিদ। আমাদের মনকে ভাববিলাসের আবিলতা থেকে উদ্ধার করে বিচারসহ বোধ ও বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার সার্থকতাও তিনি অনুভব করেছিলেন। এক কথায়, রামমোহন রায়ের সাধনা ছিলো শুধু শিক্ষার মুক্তি নয়, জীবনের মুক্তি।

রামমোহনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ঔদার্য, বাস্তববোধ ও ঐতিহাসিক চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলো। ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের মধ্যে জীবনের পরিধি বিস্তারের যে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি ছিলো, তা তিনি বুঝেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব তাঁর চোখের সামনে সাম্য ও স্বাধীনতার এক অদৃষ্টপূর্ব দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো। আমেরিকার স্বাধীনতার আন্দোলন পরাধীনতার অভিশাপ সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করেছিলো, সন্দেহ নেই। তুরস্কের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রীসের প্রতি সহানুভূতি ও নেপল্‌স্‌বাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশে তিনি কার্পণ্য করেন নি।

ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লাভের ঘটনায় তাঁর আনন্দ হয়েছিলো, স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধ ও সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রামমোহন আন্দোলন করতে দ্বিধা করেন নি। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে দেশবাসীর জন্য নানা অধিকার অর্জনের বিষয়েও তিনি ছিলেন তৎপর। অন্যদিকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে তিনি বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করতেন—কারণ ইংরেজ জাতি নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভক্ত, সামাজিক সুখবিধায়ক, নিরপেক্ষ সাহিত্য ও ধর্মজিজ্ঞাসার অনুরাগী। সবচেয়ে বড়ো কথা, ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ধনতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনা, বৈষয়িক সমৃদ্ধির সুযোগ। মনে রাখতে হবে, তখনকার দিনে এই জাতীয় চিন্তা প্রাগ্রসর চেতনা ও প্রগতিশীলতারই লক্ষণ ছিলো। আর একটি কথা। তাঁর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের অন্তরালেও ছিলো রাজনৈতিক সুবিধা ও স্বার্থের চিন্তা, সামাজিক সুখশান্তির আকাঙ্ক্ষা। তিনি বলেছিলেন—'I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus, is not well calculated to promote their political interest.' অতএব, 'It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort'.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রামমোহন স্পষ্টতঃই যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা বৃহত্তর অর্থে সামাজিক সমস্যা। কিংবা তাকে বাস্তব সমস্যাও বলা যেতে পারে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, আমাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবনে ক্লেদকালি জমেছে প্রচুর—তাই তা গতি হারিয়েছে, হয়ে পড়েছে অচল অনড়। কিন্তু এই ক্লেদাক্ত সমাজদেহকে পরিচ্ছন্ন করার সমস্যাটাকে তলিয়ে দেখতে গিয়ে তিনি আরেকটা সমস্যার সামনে পড়লেন—সেটা হলো জ্ঞানের

সমস্যা। স্বীকার করতেই হবে, জ্ঞানের সমস্যার সমাধান না হলে সামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসা সম্ভব নয়।

পূর্বেই দেখেছি, রামমোহনের আবির্ভাব কালে আমাদের জিজ্ঞাসায় শৈথিল্য ঘটেছিলো। কথাটা বিশ্লেষণ না করলে জ্ঞানের সমস্যাটা ধরা যাবে না। আমরা জানি, জ্ঞানের মূলে আছে জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার টানে আসে সমাধান। আবার সমাধানের মধ্যেই থাকে নতুন জিজ্ঞাসার ভ্রূণসম্ভাবনা। এই ভাবে জিজ্ঞাসা ও সমাধানের টানাপোড়েনে জ্ঞানের বয়ন চলতে থাকে। গ্রীসে মিলেসিয়ান গোষ্ঠী একদিন প্রশ্ন তুলেছিলেন—বিশ্বজগতের ভিত্তি কি (what) ? প্রশ্নটির সূত্রে সমাধানও এক সময়ে এলো এবং জিজ্ঞাসা ও সমাধানের প্রকৃতি থেকে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের জন্ম হলো। বিশ্বের মূলে আছে জল, বায়ু ও আগুন—এই জ্ঞান তখনকার গ্রীকদের রক্তমাংসে মিশে যাবার পর, জীবনদর্শনের নিয়মেই নতুন প্রশ্ন উঠলো সোফিষ্টদের কাছ থেকে। সোফিষ্টরা বললেন—'Man is the measure of all things. This is interpreted as meaning that each man is the measure of all things, and that when men differ, there is no objective truth in virtue of which one is right and the other wrong'. কিন্তু এঁদের সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি-প্রবণতাই (argument whereever it might lead them) বড়ো হয়ে উঠেছে। তারপর বিশ্বজগতের প্রাথমিক উপাদান স্বীকার করে নিয়েও সক্রেটিস প্রশ্ন আনলেন—একই উপাদানে গঠিত বস্তুগুলির মধ্যে আত্যন্তিক মিল বা গরমিল কেন ? কেনই বা জল, বায়ু ও আগুন (why) ? বাঁচা মরারই বা তাৎপর্য কি ? তাঁর এই নতুন জিজ্ঞাসার ক্রম-পরিণতি হলো প্লেটো অ্যারিষ্টটলের দর্শন।

এ থেকেই সিদ্ধান্ত করা যায়, জ্ঞান আসলে জিজ্ঞাসা ও সমাধান-ঘটিত একটি মানসিক ক্রিয়া এবং এই ক্রিয়ার অভাবে জীবনের

গতি ও প্রগতি যায় হারিয়ে। আরেকটি কথা। শুধু জিজ্ঞাসা ও তার সমাধানের গর্ভেই জ্ঞানের জন্ম হয়না, জিজ্ঞাসা ও সমাধানের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের সঙ্গে যখন অন্তরের বিশ্বাসের ঐক্য ঘটে, তখনই জ্ঞানের মূর্তি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সেই বিশ্বাস যদি তিলে তিলে জিজ্ঞাসার চেহারা পাল্টায়, নিজের ছাঁচে তাৎপর্য সৃষ্টি করে সত্যের বিকার ঘটায়, জীবনযাত্রার একঘেয়ে ছকে সংস্কারের বেড়া তৈরি করে—এক কথায়, সত্যের চেয়ে বিশ্বাসটা বড়ো হয়ে ওঠে, তখনই জ্ঞান বন্ধ্যা হয়, জীবনে দুর্গতি আসে, সমাজে জাগে বিকৃতি। এই কারণেই জিজ্ঞাসার এতো মূল্য। মনে রাখতে হবে, এই জিজ্ঞাসার যেমন ব্যবহারিক রূপায়ণ ঘটে, তেমনি ঘটে তার বিমূর্ত প্রকাশ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের সামাজিক অভ্যুত্থান ও যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতির ফলে মানুষের জিজ্ঞাসা যখন বদলে গেলো, অ্যারিষ্টটলীয় তত্ত্বনির্ভর নৈয়ায়িক ছকে যখন ফাটল ধরলো, যখন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে 'কেন ঘটে' থেকে 'কেমন করে ঘটে (how)' প্রশ্নের উদ্ভব হলো—তখন তত্ত্ব দিয়ে বিচারের রেওয়াজ গেলো উঠে, শুরু হলো তথ্য দিয়ে তথ্যের বিচারের পালা। এইভাবে তথ্যঘটিত ও পর্যবেক্ষণসমৃদ্ধ নতুন জ্ঞানের প্রবাহ পূর্ববর্তী জ্ঞানের বেড়া ডিঙিয়ে নতুন সীমানায় ছড়িয়ে পড়লো—তার সামাজিক প্রকাশ দেখা গেলো সকল রকমের ক্রিয়াকর্মে। অন্যদিকে জ্ঞানের বিমূর্ত প্রকাশ দেখি প্রতীকী গণিতশাস্ত্রের চর্চায়—তার মধ্যে ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যের কোন স্থান নেই, পর্যবেক্ষণের কোন মূল্য নেই ; মুখ্য শুধু বিমূর্ত চিন্তা ও সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব। প্রথমটাকে যদি বলা যায়, ব্যবহারিক জ্ঞান (practical knowledge), তবে দ্বিতীয়টাকে বলতে হয় শুদ্ধ জ্ঞান (pure knowledge)। দর্শনের এই ইতিহাস থেকে প্রমাণ করা যায়, জ্ঞানের মূলে আছে—'Dialectic, that is to say, the method of seeking knowledge by question and answer.'

দেশের দিকে তাকিয়ে রামমোহনও বুঝতে পেরেছিলেন—

জীবন ও সমাজের অগ্রগতির পেছনে আছে যে জিজ্ঞাসার তাগিদ, তা জাগিয়ে তুলতে হবে। ডায়লেকটিকের দ্বারা প্রাণ ও গতির সঞ্চার করতে পারলে সামাজিক সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে। বিশ শতকে জড়ভাবের প্রতিষেধক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী নানা উপায়ে তর্ক-বিতর্কের আবহাওয়া আনতে চেয়েছিলেন—তেমনি নবযুগের উষাকালে রামমোহন মিশনারী আর পণ্ডিতসমাজ, সরকার আর আধা-সরকারের সঙ্গে তর্ক জুড়েছিলেন, বিচারে বসেছিলেন, আলাপ আলোচনা করেছিলেন—একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্যে। কৌতূহল জাগুক, জ্ঞানের জন্ম হোক; জাতি চলতে শিখুক, বিচার করতে শিখুক—এই মহত্তর ও গভীরতর লক্ষ্যই রামমোহনের সমস্ত কর্মৈষণার পেছনে সক্রিয় ছিলো না কি? এর তুলনায় বিশেষ বিশেষ সত্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াসের তাৎপর্য গৌণ।

এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে কি বোঝা গেলো? রামমোহন আকাশ-কুসুম নন, নিরালম্ব ধূমকেতুও নন; তাঁর জীবনের মর্মমূলে রয়েছে ভৌম প্রয়োজনের তাগিদ, যুগ-প্রবৃত্তির ক্রিয়া, সামাজিক সংঘাত-সংযোগের ফলশ্রুতি। এই মৃন্ময় ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছিলো তাঁর বলিষ্ঠ চরিত্রসত্তা, বৃহৎ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্যে ছিলো একটি বড়ো মন, একটি সজীব প্রাণ। অবিরাম জিজ্ঞাসার প্রবণতা, ক্রম-অগ্রসরমান ঐতিহাসিক চেতনা, pure and practical reasoning সেই আন্তর-সত্তাকে নিরন্তর সক্রিয়, চলিষ্ণু ও সংগ্রামমুখী করে তুলেছিলো। তাই তো ধর্মের কুহেলী, সমাজের তামসিকতা, রাষ্ট্রের অভিশাপজালকে যুক্তির আয়ুধে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন যুযুধান রামমোহন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিলো সকলপ্রকার বন্ধন থেকে লৌকিক মুক্তি; তিনি ছিলেন একজন যথার্থ liberator। তাঁর এই উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে কোন সঙ্কোচের বিহ্বলতা ছিলো না। তাই তো তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ছিলো

আলোকিত ও উজ্জ্বল—তাঁর চরিত্রটি ছিলো ঋজু, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

তবে এই ইস্পাতের মতো কঠিন ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে, বুদ্ধিদীপ্ত বিরাট পৌরুষে সুকুমার বৃত্তি ও হৃদয়ধর্মের কোন ছাপ পড়েনি। তাই তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে ভাবালুতা ও মোহাবেশের কোন বাষ্প নেই। রামমোহনের যুক্তিধর্মী মননক্রিয়া, মোহ-নির্মুক্ত চিত্তবৃত্তি, বস্তুগ্রাহ্য চেতনা, ঐতিহাসিক সত্যদৃষ্টি ও তীব্র-তীক্ষ্ণ মনীষা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে তুলেছিলো।

রামমোহন শুধু গড় ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্ম নেননি—তাঁর অতিব্যক্তিত্ব ছিলো; তিনি সাধারণ মানুষের মতো শুধু জীবিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন মনীষীদের মতো দ্বিগুণ জীবিত। তাঁর চরিত্রে, কর্মে ও চিন্তায় যে অতিমাত্র সুর ছিলো, তাই তাঁকে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। তখনকার সমাজে কেউ ছিলেন হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বা খৃষ্টান—কিন্তু সমসাময়িক এক কৌতুকনাট্যের মতে—রামমোহন হিন্দু নন, মুসলমান নন, খৃষ্টানও নন। এতেই প্রমাণ হয়, তিনি ছিলেন আলাদা মানুষ এবং মানুষের মতো মানুষ। রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিতে আছে, রামমোহন নিজের প্রচারিত ধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্ম বলে আখ্যাত করতেন। ধর্মের এই বিশ্বজনীন রূপের কল্পনা করা তখনকার দিনের পক্ষে কম বড়ো সাহসের কথা ছিলো না।

অতিব্যক্তিত্বমাত্রই পরিবেশের সঙ্গে নিরন্তর বিরোধে লিপ্ত থাকে। বর্তমান সমাজের রূপ ভালোই হোক আর মন্দই হোক, দ্বিগুণ জীবিত ব্যক্তি তার চেয়ে সুন্দরতর সমাজের জন্য স্বপ্ন দেখেন, সাধনা করেন। শাস্ত্রে আছে, 'হওয়াই' জীবনের চরম কথা, এই 'হওয়ার' আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যেমন আছে তেমনি সামাজিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। যেমন আছি তেমন থাকতে চাইনে, অন্য কিছু হতে চাই; যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাইনে, আর কিছুতে যেতে চাই—

এই হচ্ছে জীবন আর সমাজের ভাবনা। এবং সেই ভাবনার পথ ধরেই ক্রম-অগ্রসরমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। মনীষীরা অদ্ভুতন সমাজের বুকে নখাঘাত করতে করতে, তার সঙ্গে লড়াই করতে করতে সেই নতুন সমাজ-গঠনের দায়িত্ব বহন করে চলেন।

রামমোহনও তা-ই করেছিলেন। তিনি অধিকতর কল্যাণকর, সুনিয়ন্ত্রিত ও প্রগতিশীল সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন আর তার জন্য করেছেন সমগ্র জীবনব্যাপী সংগ্রাম। তাঁর অধ্যয়ন, চিন্তা ও সাধনায়—এক কথায় তাঁর জীবনচর্যায় যে সত্য বড়ো হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে—আর কিছু হতে হবে, অন্য কিছু হওয়াতে হবে। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মনে জিজ্ঞাসা ছিলো, বিদ্রোহের ভাব ছিলো। পরে য়ুরোপীয় জীবনযাত্রা, ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তিনি এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন—সঙ্গে সঙ্গে নিজের অর্জিত ও পরিশীলিত জ্ঞানকে ব্যক্তিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শুরু করলেন।

সুতরাং ইতিহাসের আন্তর-প্রেরণায়, যুগধর্মী প্রয়োজনের তাড়নায় ও নিজের সদা-সক্রিয় অতিব্যক্তিত্বের তাগিদে রামমোহনের যে সুচিন্তিত কর্মধারা—তারই মধ্যে তাঁর জীবনের সমগ্র-দৃষ্টি অভিব্যক্ত। আর সেই সমগ্র-দৃষ্টিই তাঁর সৃষ্টিশক্তির প্রাণ-প্রবর্তনা। অন্য দিকে দেশে পরিবর্তিত অবস্থায় একটা নতুন চেতনা দেখা দিলো, পুরনো ভারতবর্ষের বুড়োশিবের মন্দিরে নতুন যুগের শঙ্খধ্বনি শুনা গেলো, তার চত্বরে নবজাগ্রত মানুষের কল-কোলাহল মুখর হয়ে উঠলো। একেই তো বলে রেনেসাঁস এবং সেই রেনেসাঁসের প্রথম পুরোহিত রামমোহন।

॥ দুই ॥

সাহিত্যে রামমোহনের দান আলোচনার আগে বাঙলা গদ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করা যাক।

বাঙলা সাহিত্যের কনিষ্ঠ সন্তান—গদ্য-সাহিত্য। অবশ্য সব দেশের সাহিত্যেই গদ্য-রচনা পদ্য-কাব্যের অনুজ। হয়তো জাতির মনে যুক্তিধর্মিতা ও বিচারবোধ দেরিতে আসে বলেই যুক্তি-চিন্তার শৃঙ্খলায় গড়ে-ওঠা গদ্যের পদক্ষেপও দেরিতে শুরু হয়। বাঙলা গদ্যের পাকা-পোক্ত ও শক্ত-সমর্থ চেহারা দেখা দিয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, যদিও তার অঙ্কুর উদ্গমের সময় আরও কয়েক শ' বছর আগে। কিন্তু প্রথম দিকের গদ্যের নিদর্শনের সঙ্গে ইংরেজী যুগের, বিশেষ করে উনিশ শতকের গদ্যের তুলনা করলে বোঝা যায়, আমাদের গদ্য-সাহিত্য ইংরেজী সংস্কৃতি ও শিক্ষার সোনার ফসল ছাড়া কিছু নয়। অন্যথায় গদ্যের শাখাপথে সবেগে বয়ে যাওয়ার জন্য বাঙলা সাহিত্যের ধারাকে প্রায় হাজার বছর অপেক্ষা করতে হতো না।

ষোড়শ শতকের আগে বাঙলা গদ্যের অস্তিত্ব ছিলো, কিন্তু তার কোন নমুনা আমরা খুঁজে পাই নি। আসামের রাজাকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন কোচবিহারের রাজা—১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে। পণ্ডিতেরা বলেন, সন তারিখের নির্দিষ্ট প্রমাণসহ এর চেয়ে প্রাচীন গদ্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। 'তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।'—এই গদ্যে আর কিছু না থাক, বাঙলা গদ্যের সাধু রূপ আছে; শব্দসজ্জায় মুসলমানী প্রভাব নেই, সংস্কৃতানুগ রচনারীতির ছাপ রয়েছে। ষোড়শ শতকে পোর্তুগীজ পাদরিদের লেখা খান-দুই খৃষ্টানী পুস্তিকার সংবাদ দিয়েছেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ

সেন। এদের ভাষার আদল আমরা দেখিনি বটে, তবে পরবর্তী কালের দোম আন্তনিও ও মানোএল-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্-এর গদ্যলেখায় তাঁদের ভাষারীতির অনুস্মৃতি অনুমান করে নিতে পারি।

এর পর সপ্তদশ শতকের বাঙলা গদ্যের বহুতর নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রথমে বৈষ্ণব সাধকদের কড়চার কথা বলা যেতে পারে। রচনাগুলি বৈষ্ণবদের তান্ত্রিক সাধনা নিয়ে লেখা। এরও অনেক আগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গদ্যপদ্যময় চম্পুর কথা শোনা যায়—কিন্তু তার নিদর্শন নেই। সতেরো শতকী কড়চায় গদ্যের উদাহরণ—'তুমি কে। আমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ব বস্তু হৈতে। তত্ত্ব বস্তু কি। পঞ্চ আত্মা।' এই প্রশ্নোত্তরময় নরোত্তমী গদ্যপ্রচেষ্টায় ছোট ছোট বাক্যের ফুলঝুরি আছে, কিন্তু বাক্যগঠনপ্রণালীর বিস্তৃত পরিচয় কোথায়? তাই সাহিত্যের দিক থেকে এ-সব উদাহরণ যেমন একেবারেই মূল্যহীন, তেমনি ব্যাকরণ বা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও বিশেষ মূল্য বহন করে না। সহজিয়া গদ্যগ্রন্থ 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তির' গদ্যনিদর্শন উদ্ধৃত করা যেতে পারে, কিন্তু ভাষার দিক থেকে তা নরোত্তম দাসের 'দেহকড়চার' চেয়েও অস্ফুট।

সতেরো শতকের দলিলপত্রে মুসলমানী বাঙলার—যাকে বলতে পারি আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্যপূর্ণ গদ্যের নমুনা আবিষ্কারে আমাদের ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। বাঙলাদেশের প্রত্যন্ত ভূমি কোচবিহারের চিঠিপত্রে মুসলমানী ভাষার আক্রমণের প্রমাণ নেই, কিন্তু ইসলামী প্রভাবমণ্ডলের দলিলপত্রে আরবী ফারসী শব্দের আধিক্য পারিপার্শ্বিক কারণের প্রতি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঢাকা অঞ্চলের একটি দলিলের ভাষা উদ্ধৃত করা যাক—'হকীতকমজুকর শ্রীজুত জসোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ত

আছিল রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ সেবকেরা আপনার আপনার ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল রাত্রি দিন চৌকী দিতেছিল শ্রীরামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুসানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মধ্যে পরগণা পরগণাতে দেওড়া ও মুরুত তোড়িবার আহাদে হুজুর থাকীয়া পরোওনা লইয়া আর আর পরগণাতে দেওড়া ও মুরুত তোড়িতে লাগীল।' এখানে মুসলমানী শব্দসজ্জা, উপভাষার স্পর্শ ও প্রাচীন পদ-সংস্থান-রীতির বৈয়াকরণিক তাৎপর্য আছে, আর সাধারণ পাঠকের কাছে ভাষার অপেক্ষাকৃত সরলতার মূল্যও না থেকে পারে না। তখনকার (১৬৯৬ খৃঃ) একটি চুক্তিপত্রে ঢাকাই মৌখিক ভাষার সাক্ষাৎ মেলে।

সতেরো শতকের দোম আন্তনিওর কথা আগে উল্লেখ করেছি। ভূষণার জমিদারের ধর্মান্তরিত পুত্র ছিলেন দোম আন্তনিও, 'জেন্টুদিগের' প্রতিনিধি একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে একজন রোমান্ ক্যাথলিক ধর্মযাজকের কথোপকথন নিয়ে তিনি 'ব্রাহ্মণ রোমান্ ক্যাথলিক সংবাদ' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। রোমান হরফে মুদ্রিত এই বইটি সাধারণ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিলো বলে মনে হয় না। পূর্ব বাঙলার উপভাষার ছাঁচ বইটিতে রয়েছে, মুসলমানী শব্দের ব্যবহারও খুবই কম—সব মিলিয়ে সাধুভাষার রূপরেখাই এখানে দ্রষ্টব্য। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে 'ব্রাহ্মণ রোমান্ ক্যাথলিক সংবাদ' অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'ব্রাহ্মণ রোমান্ ক্যাথলিক সংবাদ' সতেরো শতকের শেষ দিকের লেখা হলেও মুদ্রিত হয়েছিলো আঠারো শতকের পঞ্চম দশকে (১৭৪৩)। এই সালেই মানোএল-দা-আস্সুম্প্সামের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' ছাপা হয়, যদিও লেখা হয় নয় বছর আগে। প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিমায় খৃষ্টধর্ম বইখানিতে আলোচিত, ভাষায় ঢাকাই উপভাষার ছাপ সুস্পষ্ট, মুসলমানী শব্দসম্ভারও বিশেষভাবেই উপস্থিত। রচনার নিদর্শন থেকে গ্রন্থটির ভাষা সম্পর্কে ধারণা

করা যাবে—'দুই পহর রাইত্রে বেপারীএ মেলা করিল বনের মৈধে ডাকাইতে তাহার লাগাল পাইল। পালাদিতুর ঘরের কাছে তাহারে ধরিয়া বধিল। জিনিষ ডাকাতি করিয়া নিল।...তাহার পরে হাকিমের স্থানে আরজ করিল।'

আঠারো শতকের ইংরেজী আমলের উল্লেখ করার মতো গদ্যরচনার বিশেষ নিদর্শন কোথায়? হ্যাল্‌হেডের বাঙলা ব্যাকরণ ইংরেজীতে লেখা, কিন্তু উদাহরণ হিসেবে কিছু বাঙলা শব্দেরও ব্যবহার তিনি করেছিলেন। ১৭৭৮ সালে বইটি মুদ্রণের সময় প্রথম বাঙলা টাইপ প্রস্তুত করা হয় বলেই বাঙলা মুদ্রণের ইতিহাসে গ্রন্থটির একটা স্থান আছে। শতাব্দীর শেষ দিকে খান তিনেক আইন গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিলো—কিন্তু তাদের ভাষায় কোন উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিলোনা। তবে বাঙলা গদ্যের ইতিবৃত্তে শ্রীরামপুর মিশনের (১৮০০) উল্লেখের কারণ কেরির বাইবেলের অনুবাদ। এর ধার্মিক সার্থকতা যা-ই হোক না কেন, অপূর্ণাঙ্গ, অমার্জিত ও কৃত্রিম ভাষার জন্য গদ্যের ক্ষেত্রে এর মূল্য ও প্রভাব উপেক্ষণীয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০) ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দিশি ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের পাকাপাকি বিলিব্যবস্থা করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। কিন্তু ওয়েলেসলীর এই নিগূঢ় নীতি সফল হয়নি বলেই মনে হয়—তার অস্তিত্বের জের শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চললেও রামমোহন-হিন্দুকলেজ ইত্যাদির আবির্ভাবের পর তার প্রাণ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বাঙলা গদ্যের লাভের কোঠায় কয়েকটি অঙ্ক বসিয়ে দিয়ে গেছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। তার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন উইলিয়াম কেরি। বাঙলা, সংস্কৃত ও মারাঠীর অধ্যাপনায় তাঁর খ্যাতি প্রকাশিত গদ্য-পুস্তকের মহিমার অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে। সে মহিমা, স্বীকার করতেই হবে, যতটা ঐতিহাসিক ততটা সিদ্ধিগত নয়।

এখানে কেরির নামে প্রচলিত 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাস-মালার' (১৮১২) কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটিতে সাধু ও কথ্য ভাষারীতিতে বিচিত্র বিষয়ে আলোচনা এবং দ্বিতীয়টিতে অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে অনেকগুলি গল্পের সঙ্কলন দেখতে পাই।

কলেজের উদ্যোগে বহু সংস্কৃত ও মুসলমানী গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে—রচিত হয়েছে খান তেরো বাঙলা গদ্যগ্রন্থ। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) তাদের মধ্যে সর্বাগ্রজ। বইটি কিম্বদন্তী আর ফারসী উপাদানের সাহায্যে লেখা—অনুবাদ নয়। রচনারীতি মোটেই সংস্কৃতানুগ নয়, বরং কথ্য ঢঙের; তার সাধু ভাষায় যেমন স্থানবিশেষে আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য, তেমনি স্থানবিশেষে তদ্ভব শব্দেরও ব্যবহার চোখে পড়ে। আসল কথা মুসলমানী কথাপ্রসঙ্গে তিনি দলিলপত্র, আর্জিসনদ ইত্যাদির ভাষারীতি অনুসরণ করেছেন—তাই যাবনী উপাদান সেখানে বেশি। কিন্তু মুসলমানী শব্দ প্রয়োগে তাঁর কুশলতা স্বীকার করতে হয়—বেশ একটা সরসতা, সঙ্গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। যদি কোথাও উৎকটতা থেকেও থাকে, তবু সমাসবিরলতায় তার ক্ষতি পুষিয়ে যায়। যেমন—'তাহার মধ্যস্থলে ক্রোশাধিক চারিদিগে আয়তন গড় কাটাইয়া পুরি আরম্ভ হইল সদর মফসল ক্রমে তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরি প্রস্তুত হইল।' এখানে কয়েকটি মুসলমানী শব্দ আছে, কিন্তু সমাসবদ্ধ পদ কই? 'লিপিমালার' (১৮০২) ভাষার আদর্শ 'এদেশীয় চলন ভাষা' ও 'লেখাপড়ার প্রকরণ'; —আরবী ফারসী শব্দের সংখ্যা অনেক কম, বাঙলা ইডিয়মের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। গ্রন্থটি পত্রাকারে প্রবন্ধ, মাঝে মাঝে পদ্য আছে। সুতরাং সব মিলিয়ে রামরাম বসুর গদ্য-ভাষার প্রশংসাই কর্তব্য। অবশ্য সকলে তা স্বীকার করেন না।

গোলকনাথ শর্মার হিতোপদেশ (১৮০২), তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' (১৮০৩), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫), চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫) ও হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষার' (১৮১৫) কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের প্রথমটিতে গদ্য-রীতি ও সংস্কৃত সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, দ্বিতীয়টিতে ইংরেজী অন্বয়-রীতির (syntax) অনুসরণ, তৃতীয়টিতে অপেক্ষাকৃত সরল গদ্যরীতি, চতুর্থটিতে চলনসই রচনাভঙ্গীর স্বাচ্ছন্দ্য ও পঞ্চমটিতে সংস্কৃত-ঘেঁষা রচনাদর্শ দেখতে পাওয়া যায়।

ফোর্ট উইলিয়ামী পর্বের শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—'মৃত্যুঞ্জয়...কালের হিসাব ও ক্ষমতার হিসাব, দুই হিসাবেই এই (পণ্ডিত) শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য। প্রবোধচন্দ্রিকার প্রথম স্তবকে মুখবন্ধে ভাষা প্রশংসমান প্রথম কুসুমের শেষাংশে লিখিত আছে যে, গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।' তাই তাঁর সংস্কৃতরীতির লেখায় এক কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি—যদিও এই জাতীয় ভাষাকেই তিনি 'সংস্কৃতবাহুল্য হেতুক' অন্য ভাষা থেকে 'উত্তমা' মনে করতেন। তাঁর মুখে শুনতে পাই—'যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরা অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমন সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রই পরাঙ্মুখ হন।' এই উদ্ধৃতির বক্তব্য ও ভাষা দুই-ই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু এই গ্রন্থেই সহজ সরল কথ্যরীতির সন্ধান পাই—'মোরা চাস করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ করিয়া খাবো, ছেলেপেলেগুলি পুষিব...ইত্যাদি।' এ ভাষায় জড়তা নেই, গতি আছে; ভার নেই, স্বাচ্ছন্দ্য আছে; কাঠিন্য নেই,

সরলতা আছে। কিন্তু প্রবোধচন্দ্রিকার তৃতীয় স্তবক কুসুমের অন্তর্গত এই উদ্ধৃতির পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের ভাষা এর চেয়ে কঠিন—'ইতোমধ্যে শৃগাল সাড়া পাইয়া গৃহ হইতে নির্গমনার্থ উন্মুক্ত হইয়া গুরুতর ভোজনেতে উদরভারে শীঘ্র বহির্গত হইতে পারিল না···তদনন্তর লাঙ্গলিক কৃচ্ছ্রে অগ্নি নির্ব্বাণ কবিয়া অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত হইয়া ভোজ্য দ্রব্যব্যাঘতে জতি মষ ক্রোধে শৈলীক্রমে গৃহাভ্যন্তরে গিয়া দৃঢ়তর রজ্জুতে কণ্ঠদেশ আঁটিয়া বান্ধিয়া শৃগালকে টানিয়া আনিয়া···ইত্যাদি।' এ থেকেই সিদ্ধান্ত করতে হয়, মৃত্যুঞ্জয়ের কোন নির্দিষ্ট রচনারীতি ছিলো না; ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হোক তাঁর লেখায় একাধিক রীতির বর্ত্তমানতা দোষাবহ নিশ্চয়। মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে যদি বাঙলা গদ্যের পূর্ণায়ণ ঘটতো, তবে একটা ভাষাবন্ধই তিনি অনুসরণ করতেন, কথ্যভাষাকে উচ্ছৃঙ্খলা বলে তাতেই আবার সাহিত্য রচনা করতে অগ্রসর হতেন না।

প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩) ছাড়া মৃত্যুঞ্জয় আরও চারটি বই রচনা করেন। 'বত্রিশ সিংহাসনে' (১৮০২) জটিল বাক্যের ব্যূহ ভেদ করে অর্থোদ্ধার করা কঠিন, ছেদহীন টানা লেখা থেকে বাক্যসমাপ্তি নির্দেশ করাও সহজ নয়। 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) স্থানে স্থানে সৌকর্যবিহীন—প্রকাশভঙ্গির অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য; এতে গল্পের সরসতা থাকলেও 'কোনও কোনও অংশ এরূপ দুরূহ ও অসংলগ্ন যে কোনও ক্রমে অর্থবোধ ও তাৎপর্যগ্রহ হইয়া উঠে না (বিদ্যাসাগর)।' মাঝে মাঝে সংস্কৃত মূলের আক্ষরিক অনুবাদ অন্বয়রীতিকে উৎকট করে তুলেছে। 'রাজাবলি' (১৮০৮) রচনাশৈলীর দিক থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের অন্যতম উৎকৃষ্ট সৃষ্টি—স্পষ্টতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্র নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তিনি নৈমিষ্যারণ্যে যখন যজ্ঞ আরম্ভ করেন তাহার পূর্ব্বে কিছুদিন কোনই কারণেতে আপন

স্ত্রী সীতাকে বনবাসে দিয়াছিলেন'—এ-ভাষা মোটামুটি সহনীয়, সন্দেহ নেই। 'বেদান্তচন্দ্রিকার' (১৮১৭) ভাষা সংস্কৃতানুগ ও বাক্যবন্ধ জটিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুঞ্জয়ের হাতেও বাঙলা গদ্য সুষম পদ-সংস্থান-রীতি ও সঙ্গত শব্দসজ্জার মধ্য দিয়ে ভারসাম্য, সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

সুতরাং ফোর্ট উইলিয়ামী গদ্যপ্রচেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু সে পরীক্ষায় বিশেষ কিছু কৃতিত্ব অর্জন করা গিয়েছিলো বলে মনে হয় না। তাতে ইংরেজী, সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী—এই তিনটি পদ্ধতিরই কিছু-না-কিছু অনুসরণ দেখা যায়, তার মধ্যে পণ্ডিতী রীতির প্রাধান্যও ছিলো সুস্পষ্ট—তবু সমগ্রভাবে কোন নির্দিষ্ট ভাষা-রীতি ফোর্ট উইলিয়ামী যুগে গড়ে ওঠেনি। এখানকার অকিঞ্চিৎকর পাঠ্যপুস্তকের প্রচার নিতান্তই সীমাবদ্ধ ছিলো, তাই পরবর্তী গদ্যের রূপ নির্ণয়ে এদের প্রভাব বেশ ক্ষীণ। তবে গল্প, কিম্বদন্তী, উপকথা ইত্যাদির রস এবং সামান্য পরিমাণে ইতিহাস-চেতনার (যা পরবর্তীকালের প্রধানতম যুগচেতনা) সাক্ষ্য এদের মধ্যে আছে। এবং তাতে বাঙলা গদ্যের পক্ষপুটের বিস্তার ঘটেছিলো। যদিও বেশি নয়।

ফোর্ট উইলিয়ামী পাঠ্যপুস্তকের সাহিত্যিক মূল্য যেমন বিশেষ নেই তেমনি স্কুল বুক সোসাইটীর (১৮১৭) পাঠ্যগ্রন্থগুলির তাৎপর্যও স্বীকার করা যায় না। 'নীতিকথা' 'মনোরঞ্জনেতিহাস' ও 'হিতোপদেশ'-এর ভাষাদর্শে দাঁড়ির পরিবর্তে ফুল্ষ্টপের চমকপ্রদ প্রয়োগ ও বিষয়ের নানামুখিনতা ছাড়া আর কি উল্লেখ করার আছে?

॥ তিন ॥

রামমোহনের রচনার সাহিত্যিক মূল্য গৌণ, ভাষাগত তাৎপর্য মুখ্য। বাঙলা গদ্যের অবোল বেলায় তাঁর আবির্ভাব—তখন গদ্যের কায়া-গড়নের প্রশ্নটাই বড়ো ছিলো, কান্তি-সৃজনের সময় আসেনি। সুষ্ঠু শারীর সংস্থান আগে হয়, লাবণ্য তার পরে আসে। রামমোহনের লেখায় তাই অবয়বের কারিগরি লক্ষণীয়, শিল্পের প্রসাধন নয়।

রাজার গদ্যচর্চার পেছনে সাহিত্যিক প্রেরণা ছিলো না, রসের তাগিদ ছিলো না, ছিলো না নিজের হৃদয়টিকে উজাড় করে দেওয়ার এষণা। তিনি ছিলেন কাজের মানুষ, সাহিত্যের ফুলের চাষে ব্যয় করবার মতো সময় ও সুযোগ, মন ও মেজাজ তাঁর থাকার কথা নয়। বাণীর অঙ্গনে যে মধুর রসের ভিয়েন, তার কারবারী হওয়া দূরে থাকুক—তার স্বাদ ও সৌরভ গ্রহণেও রামমোহনের একাগ্রতার প্রমাণ নেই। আসলে এই কর্মযোগী ব্যবহারিক জগতের বাইরে, প্রয়োজনের সীমার ঊর্ধ্বে, উদ্দেশ্যের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কোনদিন মানস-অভিসার করেন নি—তাই তাঁর রসবোধও সাহিত্যসৃষ্টিতে উল্লসিত হয়ে ওঠেনি। তবু যে গদ্যচর্চা করলেন, তার কারণ—'the magic hand of chance' নয়। নিজের চিন্তাকে, সামাজিক আদর্শকে, নতুন জীবনবোধকে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি সংগ্রাম করেছেন অবিচ্ছিন্ন; সেই সংগ্রামে আয়ুধ ছিলো একদিকে যুক্তির শর, অন্যদিকে কলম। যে প্রাণের দায়ে তিনি কর্মী হয়েছিলেন, সেই প্রাণের দায়েই লেখকও হয়েছিলেন। তাই রামমোহনের গদ্য কেজো গদ্য এবং সেই কেজো গদ্য নির্মাণে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়।

অলৌকিক সাহিত্য-প্রতিভা রামমোহনের ছিলো না, কিন্তু ভাষা-জ্ঞান—ভাষার নাড়ীর জ্ঞান তাঁর ছিলো, একটু বেশিরকমই ছিলো। প্রমাণ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ।' প্রশ্ন উঠেছিলো, বাঙলা

কি সংস্কৃত থেকে আলাদা ভাষা? রামমোহন বলেছেন, এক এক দেশে এক এক শব্দের উৎপত্তি। সেই সব শব্দের বর্ণগত নিয়ম, বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতিও আলাদা হয়ে থাকে। এই ভাষা-স্বাতন্ত্র্যের সূত্রই ব্যাকরণের অভিধেয়। সুতরাং বাঙলা ভাষার নিজস্ব সত্তা-সূত্র বিশ্লেষণের জন্যই রামমোহন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' লিখেছিলেন। আর বাঙলা শব্দ-ভাণ্ডার? রামমোহনের মতে, বাঙলা ভাষাতে 'আবশ্যক গৃহ-ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কতকগুলি শব্দ' আছে (অর্থাৎ খাঁটি বাঙলা শব্দ)। অন্যদিকে এই ভাষা 'সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়', তাতে সংস্কৃত শব্দেরও প্রাচুর্য আছে। দেবভাষার সন্ধি ও সমাসে জটিলতা ও আড়ম্বর দেখা যায়, কিন্তু সেই জটিল প্রকরণ বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে রামমোহন মনে করেন নি। অনেক পদের এক সমাসবদ্ধ পদে পরিণতি 'গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে না' বলে তাঁর ধারণা। তাই রামমোহন বাঙলা সমাসের উদাহরণ দিয়েছেন 'হাতভাঙ্গা' (ভগ্নহস্ত নয়), 'হাড়কাটা' (অস্থিচ্ছেদী নয়), 'বানরমুখো' (বানরমুখঃ নয়), 'ঘরপাগলা' (গৃহোন্মত্তঃ নয়), 'দৌড়াদৌড়ী।' অবশ্য সংস্কৃতের ছোট ছোট সমাসবদ্ধ পদের (যেমন চন্দ্রমুখ, জলচর, পিতৃধর্ম) উল্লেখ করতে তিনি ভোলেন নি। অন্যদিকে, তাঁর মতে, 'সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণ ভাষায় উপস্থিত করিলে তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়।' অবশ্য সংস্কৃতের রীতিক্রমেই বাঙলা ভাষায় যে সন্ধিবদ্ধ পদ দেখা দেয় তা তিনি অস্বীকার করেন নি। সমাসের অন্তঃপাতী বা প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই তিনি বাঙলার নিজস্ব টা, টি, গাছা, গোটা, টুকি, গুলা, খান ইত্যাদির ওপরই জোর দিয়েছেন। বাঙলার নিজস্ব অন্বয়রীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে ২ স্থানে যখন

যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না···।' রামমোহন জানতেন, বাঙলায় তৎসম শব্দে সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী স্বভাববাচক প্রত্যয় ব্যবহার করা যায় (মনুষ্য ত্ব = মনুষ্যত্ব)। কিন্তু তদ্ভব শব্দে স্বভাববাচক বাঙলা প্রত্যয় ব্যবহার করাই উচিত (গাজীপুর এ = গাজীপুরে, বামন আই = বামনাই)। তৎসমের বানান সংস্কৃত রীতিসঙ্গত ও তদ্ভবের বানান বর্ত্তমানের শ্রুতিসম্মত হওয়াও উচিত বলে তিনি মনে করতেন।

এ থেকে বোঝা যায়, বাঙলা ভাষার উপকরণ সম্বন্ধে, তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতের প্রভাব সম্পর্কে রাজার স্পষ্ট ধারণা ছিলো। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাঙলাকে একটা নিজস্ব ভাষা-গরিমা দান করার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিলো প্রখর। দ্বিতীয়তঃ রামমোহনের ভাষাদর্শের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় আছে।

প্রয়োজনের তাগিদে রামমোহন যে গদ্যচর্চা করেছিলেন তার বিভিন্ন দিক এবার বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমে আসে অনুবাদের কথা। রাজার অনুবাদের ভাষায় স্বাধীনতা দেখা যায় না, তা মূলানুগ ও বিশ্বস্ত। আকর গ্রন্থের ভাবকে যথাযথ পরিবেশনের ইচ্ছার জন্যই তিনি ভাষার ক্ষেত্রে মৌলিকতা দেখাবার চেষ্টা করেন নি। যেমন—

'কঠোপনিষৎ—সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে *চক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে* *লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।*

অনুবাদ—সূর্য্য যেমন জগতের চক্ষু হইয়া অপরিষ্কৃত বস্তু-সকলকে লোককে দেখাইয়া ও আপনি অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্গ দ্বারা অন্তর্দ্দোষ অথবা বহির্দ্দোষ কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহেতে প্রবেশ করিয়া লোকের দুঃখেতে লিপ্ত হয়েন না…।'

এই অনুবাদ অক্ষরে অক্ষরে মূলের সঙ্গে না মিললেও নিঃসন্দেহে মূলানুসারী। তবে বক্তব্য পরিস্ফুটনের জন্য মাঝে মাঝে গূঢ় শব্দের ব্যাখ্যা আছে, যে অর্থ সঙ্কেতিত তাকে স্পষ্ট করবার জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য মূলে জটিলতা নেই বলে অনুবাদেও জটিলতা নেই।

আরেকটি উদাহরণ ঃ

'মুণ্ডকোপনিষৎ—যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনা-গ্রয়ণমতিথিবর্জিতঞ্চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি॥ কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বা॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তির অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অমাবস্যা যাগে এবং পৌর্ণমাসী যাগে রহিত হয় আর চাতুর্মাস্য কর্ম্মে বর্জিত হয় আর শরৎ ও বসন্তকালে নূতন শস্য হইলে যে যজ্ঞ করিতে হয় তাহার অনুষ্ঠান যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম না করে এবং অতিথিসেবারহিত হয় ও মুখ্য কালে অনুষ্ঠিত না হয় আর বৈশ্বদেব কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় কিম্বা অযথাশাস্ত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ঐ যাগ কর্ত্তার সপ্ত লোককে নষ্ট করে অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা যে ভূরাদি সপ্ত লোককে সে প্রার্থনা করিত তাহা প্রাপ্ত হয় না কেবল পরিশ্রম মাত্র হয়। কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী এই সাত প্রকার অগ্নির জিহ্বা আহুতি গ্রহণের নিমিত্ত লেলায়মান হয়।'

লক্ষ্য করা দরকার, শেষ শ্লোকটির অনেকটা আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন রামমোহন। কিন্তু প্রথম শ্লোকটি মূলে জটিল বলে

অনুবাদও জটিল হয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যঞ্জিত অর্থ প্রাঞ্জল করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে টীকাভাষ্য করতে হয়েছে ('কিম্বা,' 'অর্থাৎ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে তার প্রমাণ আছে)। তাতে বাক্যাংশগুলির জটিলতা বেড়েছে, সমগ্র বাক্যের বাণীবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে, ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ থাকেনি।

অন্যদিকে—

'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম এক দ্বিতীয়রহিত হয়েন॥ নান্যেহতোস্তি দ্রষ্টা। ব্রহ্ম বিনা আর কেহ ঈক্ষণ কর্ত্তা না হয়॥ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। সংসারে ব্রহ্ম বিনা অপর কেহ নাই॥ তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্মা। নাম রূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন॥ নামরূপে ব্যাকরবাণি। যাবৎ নাম রূপের জন্যতা হয়।'

এখানে মূলের ভাষা আপ্তবাক্যের মতো সংক্ষিপ্ত, ঋজু ও স্পষ্ট,—তাই রামমোহনের অনুবাদও সেই ধরণের। পদবিন্যাসের মধ্যে শিথিলতা নেই, জটিলতাও অনুপস্থিত।

একটা কথা এখানে স্পষ্ট হওয়া দরকার। রামমোহনের গদ্য-রচনায় ভাষাবোধের পরিচয় আছে। মনে রাখতে হবে, এই বোধে প্রবুদ্ধ না হলে লেখক সার্থকতা লাভ করতে পারেন না। রাম-মোহনের ভাষাবোধ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, মূলের আদর্শ অনুযায়ী তাঁর অনুবাদের ভাষা কোথায়ও ছড়িয়ে যায়, কোথায়ও বা ঘনিয়ে আসে (condensed)। বাক্যের জাল স্থানে এলানো, স্থানান্তরে গুটানো। ভাষায় প্রবুদ্ধি না থাকলে এমনিতর হতো না, একই আদর্শের ছাঁচে তার রূপের আদল দেখা দিতো। রামমোহনের অনুবাদ মূলানুসারী বলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে শাস্ত্রবাক্যের গাম্ভীর্য ও মহিমা রক্ষার জন্যই তিনি অনুবাদকে ইচ্ছানুযায়ী স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল করবার চেষ্টা করেন নি। মনে রাখতে হবে, শাস্ত্রের অনুবাদে এই লক্ষ্য আজ পর্যন্ত অনুসৃত হচ্ছে।

রামমোহনের অনুবাদের ভাষার সঙ্গে তাঁর বিচার ও বিতর্কের ভাষার পার্থক্য আছে। এখানে তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন;

আদর্শ সামনে রেখে তাঁকে চলতে হয়নি, মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা করবার দায়ে ভাষার কোঁচায় হোঁচট খাবার সম্ভাবনা তাঁর ছিলো না।

তিনটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

'প্রবর্তক।—স্বামী বর্ত্তমনে ও অবর্ত্তমানে অনেক প্রভেদ আছে যেহেতু স্বামী বর্তমান থাকিলে নিকটেই থাকুন কিম্বা দূরদেশেই থাকুন স্ত্রী সর্ব্বদা স্বামীর শাসনেই থাকে নিঃশঙ্ক হইতে পারেনা স্বামীর মৃত্যু হইলে পর শাসন থাকে না সুতরাং নিঃশঙ্ক হয়।

নিবর্তক।—যে শাস্ত্রানুসারে পতি বর্ত্তমানে পতির শাসনে স্ত্রীকে থাকিতে হয় সেই শাস্ত্রেই লিখেন পতি মরিলে পতিকুলে তাহার অভাবে পিতৃকুলে তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক এ ধর্ম্ম রক্ষাতে দেশাধিপতিকে নিয়ন্তা করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন তবে স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে কি তাহার অবর্ত্তমানে স্বামী প্রভৃতির শাসন ত্যাগ ও ব্যভিচারের সম্ভাবনা কদাপি নিবৃত্তি হইতে পারে না যেহেতু অনেক ২ স্থানে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেও তাহার শাসনে স্ত্রী না থাকিয়া স্বতন্ত্রা হইতেছে। কায়মন বাক্যজন্য দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবর্ত্ত করিবার কারণ শাসনমাত্র হইতে পারে না কিন্তু জ্ঞানের উপদেশ ঈশ্বরের ভয় দুষ্কর্ম্ম হইতে কি স্ত্রীকে কি পুরুষকে নিবর্ত্ত করায় ইহা শাস্ত্রে ও প্রত্যক্ষে দেখিতেছি।'

এ উদাহরণে উপযুক্ত স্থানে ছেদচিহ্ন (sense-pause) বসিয়ে পড়ে দেখুন, মনে হবে, ভাষা স্বচ্ছন্দ, সহজ ও সুগম। এতে বক্তব্যকে নিজের মতো করে গুছিয়ে বলার সার্থক প্রয়াস আছে। প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কৃত্রিমতা নেই, জড়তার বদলে এসেছে গতি—ঈপ্সিত পরিমাণ না হোক, কিছু পরিমাণ তো বটেই। রামমোহনের যুগে ভাষার প্রসাধনের সমস্যা বড়ো ছিলো না, বড়ো ছিলো অর্থবহ প্রকাশক্ষম ভাষা গড়নের সমস্যা। এখানে কি মনে হয় না, ভাষা-শরীর ভাবের প্রাণ ধারণে অনেকটা পটু হয়ে উঠেছে? এমনি করেই তো ভাষা ধীরে ধীরে বাড়-বাড়ন্ত, পাকা-পোক্ত ও শক্ত-সমর্থ

হয়ে ওঠে। অগোছাল শব্দগোছার জট ছাড়িয়ে তাকে ভাষায় বেণীবদ্ধ করবার দুরূহতা মনে রাখলে রামমোহনের কলমবাজির প্রশংসা করতেই হবে। তবে হ্যাঁ, যাঁরা গদ্যের সেই আঁতুড় ঘরে ভাষার ঠোঁটে হাসি চান তাঁদের নিরাশ হতে হবে। তবে তা কি ধানের ক্ষেতে বেগুন খোঁজার সামিল নয়? রামমোহনের গদ্যের বিষয়ের মধ্যে মিষ্টতার কোন সম্ভাবনা বা প্রতিশ্রুতি ছিলো না; তাঁর বিষয়বোধ ছিলো বলেই বাইরে থেকে মিষ্টতা আমদানী করবার চেষ্টা তিনি করেন নি।

'পাদরি।—কি বিপদ্ এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হয়। পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যে তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ কোন্ আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে ঈশ্বর নাই।

তৃতীয় শিষ্য।—আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি কিন্তু তাঁহারা কেবল এক হয়েন যাহা কহিয়াছিলেন তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্যকথা আমি বুঝিতে পারি নাই; আপনি জানেন যে আমি পণ্ডিত নহি সুতরাং যাহা বুঝা যায় তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে অতএব এই অন্তঃ-করণবর্ত্তী করিয়াছিলাম যে ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খ্রীষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছেন।'

—পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ।

শুধু এই উদ্ধৃত অংশেই নয়, সমগ্র রচনাটিতে একটা প্রচ্ছন্ন হাসি ও পরিহাসের সুর আছে—খৃষ্টীয় একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদের বিবাদের রূপ রসাল হয়ে উঠেছে। সুরের এই লঘুতায় 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদে' একটা সাহিত্যিক স্বাদ ও আমেজ দেখা দিয়েছে।

'বেদ সকল ব্রহ্মের সত্যকে কিরূপে প্রতিপন্ন করেন আর উপাধি দোষ স্পর্শ বিনা কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব কথনে বেদেরা প্রবর্ত্ত হয়েন ইহা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে পক্ষপাত পরিত্যাগপূর্ব্বক দশোপনিষদ্ বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করেন যদি

চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে এতাদৃশ প্রশ্নের পুনরায় সম্ভাবনা থাকে না।'

—গোস্বামীর সহিত বিচার।

অবশ্য এখানে আলোচনার ভাষা জটিলতার আবর্তে ঘূর্ণিপাক খেয়েছে। বাক্যের গঠনে ও শব্দের নির্বাচনে দুর্বলতা আছে—গতি আসেনি; অর্থবোধও অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। এতেই মনে হয়, ভাষা-নির্মাণে রামমোহনকে অনেক সংগ্রামের স্তর পেরিয়ে যেতে হয়েছে—তার বিবর্তনের একটা ইতিহাস আছে।

রামমোহনের মৌলিক রচনা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ।' এই গ্রন্থের ভাষা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ, সুবোধ্য ও অনাড়ষ্ট—বাক্যের গতি অসতর্ক শব্দযোজনার খোঁচে হোঁচট খেয়ে জড়তাগ্রস্ত হয়নি।

উদাহরণ:

'সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে জানিবার ও জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে, এ নিমিত্তে এক এক অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক এক বিশেষ শব্দকে দেশভেদে নিরূপিত করিয়াছেন।'

—গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

এখানে 'সুতরাং' শব্দটি বর্তমানের প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। শেষ বাক্যে 'নিরূপিত করিয়াছেন' ক্রিয়া কর্তাহীন। এছাড়া উদ্ধৃতির মধ্যে ত্রুটি নেই। সপ্রাণ বাক্যগুলি বেশ তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে গেছে—পদগুলির অন্বয়ে গৌড়ীয় রীতি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ আছে।

রামমোহনের স্বচ্ছন্দগতি ও হাস্যোজ্জ্বল রচনার আর একটি নিদর্শন ধরা যাক।

'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ ব্যাঘ্র বিড়াল তপস্বীর যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহা কাহার প্রতি শোভা পায় ইহা বিজ্ঞব্যক্তি সকলে বিবেচনা করুন। নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরি কাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্ণ পর্য্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্ব্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্ব্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড বিনা আহার হয় না।'

—চারি প্রশ্নের উত্তর।

এখানে বৈষ্ণবী বিনয় ও আচরণের বুকে রামমোহন সরাসরি ব্যঙ্গের ছুরি বসিয়াছেন - তাঁর বাঁকা ঠোঁটের ধারালো হাসিটি লেখায় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আর একটি কথা। রামমোহনের গদ্যে শব্দবিন্যাসের অনুপাত প্রশংসার স্তরে পোঁচেছে। ফোর্ট উইলিয়ামী রচনায় তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের আনুপাতিক হারে চাতুর্য ও শিল্পবোধের পরিচয় ছিলো না—কোথায়ও হয়তো আরবী-ফারসী শব্দের বাড়াবাড়ি ছিলো, কোথায়ও বা সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের। রামমোহন তাঁর লেখায় এবিষয়ে সুমিতি রক্ষা করতে পেরেছেন, সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হয়েছেন ও uncertainity of style দূর করতে পেরেছেন। শুধুই জটিল বাক্য নয়, জটিল ও সরল বাক্যের সংমিশ্রণে আপন 'বাক্য-প্রবন্ধ' গড়ে তোলায় তাঁর কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য। পাঠ্য বইয়ের বাইরে গদ্যের ব্যবহারে তিনি পথিকৃৎ।

অবশ্য তাঁর রচনায় দুরূহতা স্থানবিশেষে রচনারীতিগত—সংস্কৃত শব্দসম্ভার ও বাক্যবিন্যাসরীতি অনুসরণের ফল। সেকথা তিনি জানতেন, তাই বলেছেন—

'বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দসকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে এহার দোষ যাঁহারা ভাষা ও সংস্কৃত

জানেন তাঁহারা লইবেন না কারণ বিচারযোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না আর আমি সাধ্যানুসরে সুলভ করিতে ত্রুটি করি নাই ব্যক্তিসকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধ করিবেন আর ভাষানুরোধে কোন কোন শব্দ লিখা গিয়াছে তাহারো দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

—বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকা।

তা হলে রামমোহনের গদ্যরচনা সম্পর্কে আসল কথাটা কি দাঁড়ালো? সাহিত্য, প্রচলিত অর্থে, শিল্পীর হৃদয়ধারায় অবগাহন করেই রসাশ্রিত হয়ে ওঠে এবং সেই উৎসারিত সাহিত্য-রস সহৃদয়েরই হৃদয়সংবাদী হয়। এই যে মানব-হৃদয়, যেখানে সাহিত্যরস ঘনিয়ে আসে ও ছড়িয়ে যায়, সেখানে আবেগ ও করুণার, ভাব ও ভাবালুতার প্রাচুর্য থাকে। রামমোহনের হৃদয়ের খবর তাঁর চিন্তা ও কর্মের ইতিহাসে পাইনে, কোন দুর্বল মুহূর্তের ফাঁকেও তাঁর হৃদয়ের বিগলিত প্রকাশ ঘটতো কিনা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। পারিবারিক সম্পর্কের আওতায় কিংবা বৃহত্তর সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে রামমোহনের হৃদয়-সংবেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। তিনি মানবতন্ত্রে (humanism) দীক্ষিত ছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু মানবপ্রেমের (humanitarianism) সাধক ছিলেন কি? ব্যথার ব্যথী, দুঃখের সাথী, দুর্দিনের বন্ধু, মানুষের প্রেমিক রামমোহন কি চোখে অশ্রুর সম্ভার নিয়ে কান্নাজর্জর মানুষের দ্বারে গিয়ে কোনদিন দাঁড়িয়েছেন? কিংবা কোন ভাববিহ্বলতায় কোনদিন কি আপন সজল হৃদয়টিকে উজাড় করে দিয়েছেন? না। তিনি সমসাময়িক যুগকে, যুগের মানুষকে, মানুষের প্রয়োজনকে, প্রয়োজন সাধনের উপায়কে দেখেছিলেন বুদ্ধির নিরিখে—বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে। তাইতো রামমোহন মানবতন্ত্রী, কিন্তু সেই মানবতন্ত্রের অভ্যুদয় মস্তিষ্কের মননধর্মে, যুক্তি ও বিচারের শানানো পথে। তাঁর নিরুত্তাপ গদ্যরচনা ও সংযত

বাক্যবিন্যাস এই ন্যায়ধর্মী মননক্রিয়ারই ফল এবং তার আবেদনও পাঠকের বুদ্ধি ও নৈয়ায়িক চিত্তবৃত্তির কাছে। তাদের হৃদয়াবেগ জাগরিত করার কোন চেষ্টাই তাঁর ছিলো না।

রামমোহন ব্যবহারিক জ্ঞান ও যুক্তিজ্ঞানের ভক্ত ছিলেন বলেই শাস্ত্রকে নিজের সংগ্রামের শস্ত্র করেছিলেন, 'তাঁহার পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্রের দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন যে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ।' এসব কথা মনে রাখলে রামমোহনের রচনার কাঠিন্য ও নীরসতা অনুধাবন করা সহজ হবে। তাছাড়া বিষয় যেখানে দুরূহ, সেখানে ভাষাও কম-বেশি দুরূহ হওয়া আশ্চর্যের নয়।

রামমোহনের রচনা কিছুটা বিরস হলেও, জটিল ঠেকলেও তার বিশিষ্টতা আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে। বিষয়কে নিয়ে তাঁর যে অন্তর্ভাবনা, যে মানসিক চর্বণা এবং প্রকাশের যে ক্রম ও ভঙ্গি—তার মধ্যে একটা নিজস্বতা আছে; তাদের সব মিলিয়ে—তাদের ন্যায়সঙ্গত সম্বন্ধক্ষেপে একটা গোটা মানুষকে দেখতে পাই। এবং সেই মানুষটি হচ্ছেন রামমোহন। একেই তো বলে ষ্টাইল এবং সেই ষ্টাইলের সঙ্গে সমসায়িক অন্যান্য লেখকের ষ্টাইলের পার্থক্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অন্যভাবে বলা যায়, জড়তাধর্মী ও ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক পরিবেশে এক জ্ঞান-ভূয়িষ্ঠ প্রগতিশীল সংগ্রামমুখী ব্যক্তিত্বের যে বুদ্ধিভিত্তিক ও নৈয়ায়িক ভাব ও ভাবনা, রামমোহনের রচনায় তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে।

রাজা দেশে ভাব-বিপ্লবের সূচনা করেন, নতুন চিন্তার জোয়ারী ধারা বইয়ে দেন—এসবই সত্যি। কিন্তু সেই অভিনব প্রাণবন্যা তখনও উর্বর পলি-মৃত্তিকা ক্ষেপণ করে দেশের মাটিতে সোনার ফসল ফলায় নি, নতুন যৌবন-বন জীবন-বীথিকা রচনা করতে পারেনি। রামমোহনের যুগ ছিলো আগাছা তোলবার যুগ, ক্ষেত তৈরির যুগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। কোথাও কোথাও হয়তো নবযুগের নতুন চেতনার অঙ্কুরোদগম হয়েছিলো, কিন্তু সমগ্র-

ভাবে সেটা ছিলো ভাঙ্গাগড়ারই কাল। ফলে রামমোহনের লেখায় এক দুঃসাধ্য সংগ্রামের চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু নতুন জীবনাদর্শের আশীর্বাদ তাতে ঝলমল করে ওঠেনি—স্নিগ্ধ আলোক ফুটে ওঠেনি। তাই তাতে লাবণ্যের অভাব।

সাময়িক পত্র ও ভবানীচরণ

বাঙলা গদ্যভাষার অভিসার দূরতর পন্থায়—দলিল দস্তাবেজের শিশুশয্যা ছেড়ে, খৃষ্টানী পুস্তিকার শুশ্রূষা নিয়ে সে উত্তীর্ণা হলো ফোর্ট উইলিয়ামী রচনার বহিরঙ্গনে। কিন্তু তখনও তার বাল্যলীলা চলেছে। রামমোহনের শাস্ত্রবিচারে গদ্যভাষার প্রথম কৈশোর এলো—চারপাশের বাইরে যে বৃহত্তর জগৎ আছে, সে জগতের নতুন খবরে তাকে উন্মনা করতে লাগলো সাময়িক পত্র। বিদ্যাসাগরে দেখি তার কৈশোর উত্তরণ—বয়ঃসন্ধিকাল—দেহে রূপ এসেছে, অঙ্গে এসেছে লাবণ্য, কিন্তু তখন পর্যন্ত প্রাণ ও মনের স্পন্দন বুঝতে সে শেখেনি। বঙ্কিম সেই প্রত্যাশিত প্রথম যৌবন দিলেন—অঙ্গের শ্রী আর মনের আকৃতির যৌবন দিলেন বাঙলা গদ্যকে। বঙ্কিমের উদ্ভিন্নযৌবনা রবীন্দ্রনাথের যাদুস্পর্শে হলো পূর্ণযৌবনবতী।

সুতরাং বাঙলা গদ্যের কৈশোর উত্তরণের দিনগুলিতে সাময়িক পত্রের চেলাঞ্চল বিস্তার সময়োচিত হয়েছিলো, সন্দেহ নেই। হাড় শক্ত না হলে গায়ে মাংস আসে না; বাঙলা গদ্যের হাড়ে ফোর্ট উইলিয়ামী পাঠ্যপুস্তকের হাওয়া ঠিক শক্তির সঞ্চার করতে পারেনি। তার জন্য প্রয়োজন ছিলো সাময়িক পত্রের খোলা মাঠের—উন্মুক্ত ক্রীড়াক্ষেত্রের। রূপক ছেড়ে সহজ ভাষায় বলা যায়, বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সাময়িক পত্রের ভূমিকা স্মরণীয়।

ঐতিহাসিক নিরিখে সকল দেশের সাময়িক পত্রেরই একটা-না একটা মূল্য ধরা পড়ে। পরিবেশের পরিবর্তনে মানুষের ব্যক্তিগত

প্রত্যয়ে ও সামাজিক মানসে নতুন উৎকণ্ঠা জাগে, জীবনের মর্মকোষে অঙ্কুরিত হয় নতুন বাসনা, আত্মপ্রকাশের অজানা তাগিদ দেখা দেয়। চলমান জীবনের এই যুগগত দায়—ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায় নতুন ঘাসের খিদে মেটাতে এগিয়ে আসে সাময়িক পত্র। কারণ বৃহত্তর বিশ্ব ও আশেপাশের জগতের সঙ্গে তার জ্ঞান ও কর্মের যোগ নিয়ত নবীন। বাঙলাদেশে উনিশ শতকের শুরুতেও দেখতে পাই জীবনের নানা বৃত্তে নানা নতুন আকাঙ্ক্ষা, কৌতূহল ও সংকট। আর সেই যুগগত মানসপ্রবণতা ও সৃজনচিন্তার ধারক ও বাহক হয়ে জন্ম নিলো সাময়িক পত্র।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার-দর্পণ' নামে দুটি পত্র বেরোয়—প্রথমটি মাসিক ও দ্বিতীয়টি সাপ্তাহিক, কিন্তু উভয়েরই সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্সম্যান এবং উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়। দিগ্‌দর্শনে শিক্ষার্থীদের পাঠোপ-যোগী বিচিত্র বিষয়—দেশবিদেশের কথা, ভূগোল ও ইতিহাসের প্রস্তাব, ছোট ছোট চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রকাশিত হতো; তাই স্কুল বুক সোসাইটী মাসিক পুস্তিকা হিসেবে তাদের বিদ্যালয়ে বিতরণ করতেন। এমন কি পত্রটি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। দিগ্‌দর্শনে প্রকাশিত দর্শন ('আমেরিকার দর্শন বিষয়'), যন্ত্রবিজ্ঞান ('বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানের বিষয়') ভূগোল ('উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা') ইত্যাদি পাঠকদের, বিশেষ করে ছাত্রদের মনে কিরূপ অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে পারতো, তা অনুমান করতে পারলেই পত্রটির গুরুত্ব নিরূপণ করা যায়।

সমাচার-দর্পণে মার্সম্যানের সহযোগী ছিলেন কয়েকজন দিশি পণ্ডিত। সংবাদ পরিবেশনের ভার এঁদের ওপরই ন্যস্ত ছিলো। দেশবিদেশের রাজনীতি, বাণিজ্য, শিল্প ও যন্ত্রের খবর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন সংবাদ, স্থানীয় প্রশাসনিক তথ্য, ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যা ও ইতিহাসের বিবরণ, অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সারসংক্ষেপ

প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করতো। মিশনারী পরিচালিত পত্র বলেই সমাচার-দর্পণ ছিলো নব্যপন্থী, হিন্দু সমাজ ও ধর্মের নিন্দায় তার উৎসাহের অন্ত ছিলো না। তবু তাতে একটু অপক্ষপাত সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত হিসেবেই রক্ষণশীল সমাজের মতামতও সংকলিত হতো। নানা প্রতিষ্ঠানের—যেমন হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটী, গৌড়ীয় সমাজ ইত্যাদির বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করে দর্পণ নবাগত জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারের ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করেছে। মাদ্রাসা, চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃত কলেজের মতো প্রাচীন বিদ্যার পীঠস্থানগুলির বিবরণও উপেক্ষিত হয়নি। কোম্পানীর শিক্ষাবিষয়ক বাজেট-দাক্ষিণ্যের আগেই দেশের কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর চোখ খুলে গিয়েছিলো। সেই চক্ষুষ্মানতার প্রতিফলন দর্পণে দেখতে পাই। যে বিপরীত আদর্শ ও ভাবের দ্বন্দ্বে সেকালের সমাজমানস ছিলো সঙ্কটাকীর্ণ, ব্যক্তিচিত্ত ছিলো দ্বিধাবিভক্ত, তার কথা সমাচার-দর্পণ থেকেও জানা যায়। নতুন দিকে মোড় ফেরার কাহিনী সকল দেশের ইতিহাসে একটা জটিল অধ্যায়; মিশনারীদের পত্রটিতে সেই জটিল অংশের অনেক তথ্য ছড়িয়ে আছে। বাঙালীর মনে তখন এসেছে আরেক দিগন্তের খবর—পুরো না হলেও একটু আধটুতো বটেই; চোখের সামনে ছিলো বিদেশী মিশনারী, ব্যবসায়ী ও রাজপুরুষদের দিনচর্যার দৃষ্টান্ত। ফলে আমাদের জীবনবৃত্তে এলো পরিবর্তন, এক নবীন ও নব্যপন্থী দল গড়ে উঠতে লাগলো। দর্পণে তার সাক্ষ্য আছে।

আর অর্থনীতি? সেখানেও সঙ্কট—একদল ইংরেজদের আমদানী ব্যাবসা, কলোনাইজেসান্ ও কৃষিকাজে অংশগ্রহণের সমর্থক, অন্যদল দেশজ অর্থনীতি ও বণিকসম্প্রদায়ের পক্ষভুক্ত। রামমোহনের আত্মীয়সভা ও ভবানীচরণের ধর্মসভার উল্লেখ, সতীসমর্থক আন্দোলনের বিবরণ, পূজা-পার্বণ, বিবাহ-শ্রাদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা সত্যিই আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। সুতরাং

[সমাচার-দর্পণের মতো পত্র তখনকার অবিন্যস্ত ঐতিহাসিক দলিল, জীবনযাত্রার তাম্রশাসন ও সাহিত্যের যাদুঘর।। সাহিত্যের ইতিবৃত্তে 'দর্পণের মূল্য ভাষা-সমস্যার বিবৃতিতে, রচনাশৈলীর আলোচনায়, নানাজাতীয় শব্দব্যবহারে গ্রহণ-বর্জন-নীতির প্রয়োগের প্রশ্নে এবং সর্বোপরি বিচিত্র বিষয়ে সর্বজনবোধ্য গদ্যভাষার পরীক্ষা নিরীক্ষায়। গদ্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ মানুষের কণ্ঠে, সংবাদ পত্রের বা সাময়িক পত্রের মাধ্যমে সেই ভাষা পৌঁছোয় শ্রুতিগম্যতার বাইরে দূরে দূরান্তরে। যখন পাঠ্যপুস্তকে, শাস্ত্র-গ্রন্থের বিচারে ও নানা মৌলিক অমৌলিক গ্রন্থে বাঙলা গদ্যের সত্যরূপ আবিষ্কারের নিয়ত চেষ্টা চলেছে, তখন সমাচার-দর্পণের পৃষ্ঠায় দেখি—

[১] তিন শত বৎসর হইল কৃত্তিবাস নামক এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাঙ্গলা পদ্যরচনায় রামায়ণ প্রকাশ করেন এবং এতদ্দেশীয় পদ্যরচকের মধ্যে প্রথম তিনিই প্রসিদ্ধ। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে তাঁহার রামায়ণ অপভাষায় পরিপূর্ণ কিন্তু ঐ রামায়ণের প্রকাশ কালে ইহা হইতে উত্তমরূপ পদ্য রচনা করিতে কেহ সমর্থ ছিলেন না। বাঙ্গলা কাব্যে পুস্তকের মধ্যে কৃত্তিবাসের ঐ গ্রন্থ সকলের গ্রাহ্য বিশেষতঃ মধ্যম লোক এবং দোকানদার লোকের মধ্যে। তাহারদের দিবসের কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহারা মণ্ডলাকারে বসিয়া ঐ রামায়ণের কোন এক অংশ পাঠ করে। বঙ্গদেশ মধ্যে এমত কোন দোকানদার নাই যে তাহারদের স্থানে ঐ কবিকৃত রামায়ণের কোন এক অংশ না পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে নানা অপভাষা আছে তাহার দোষ বরং লিপিকরের কিন্তু গ্রন্থরচকের নহে এমত বোধ হয়। —৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০।

[২] সভার সৌষ্ঠব অত্যাশ্চর্য্য পূর্ব্বভাগে উপরে নানা দেশীয় নিমন্ত্রিত সচ্ছাত্র অধ্যাপকগণ এবং উত্তর ভাগে নানা দেশীয় বিষয়ী ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণগণ। পশ্চিমভাগে উপরে সামাজিক তাবৎ ব্রাহ্মণবর্গ নীচে পশ্চিম ভাগে তাবৎ ভাগ্যবন্ত বিশিষ্ট শূদ্রসমূহ।

সবার মধ্য ভাগে স্বুবর্ণময় দান সাগরের সামিগ্রী। তাহার উত্তরে রাশীকৃত রূপ্যময় গাড়ু। ঈশান কোণে পিত্তলের এক রাশি গাড়ু। দান সাগরের দক্ষিণে রাশীকৃত রূপার ঘড়া ও অগ্নিকোণে পিত্তলের ঘড়া এক রাশি সভার পূর্ব্বভাগে রূপার খট্টা ১৭খান তাহার আসনাদি সমুদয় শাঠীন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া। তাহার পূর্ব্বভাগে সবৎসা ও সত্নগ্ধা ষোড়শ ধেনু। এইরূপ সভা হইয়া ষোড়শ দানীয় দ্রব্য প্রত্যেককে উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক দানের দক্ষিণা এক ২ স্বুবর্ণ মুদ্রা সমেত সাক্ষাৎকারে অপূর্ব্ব বেদাধ্যায়ি পশ্চিম দেশস্থ ব্রাহ্মণ হস্তে দান করিয়াছেন।

—১৫ই জুলাই, ১৮২০।

[৩] আফিম মগধ ও কাশীতে প্রতি বৎসর অনেক জন্মে। তাহার বাণিজ্য কেবল কোম্পানির অধীন অন্যের কোন বিষয় নাই। তাহার জন্মের বৃত্তান্ত এই আফিম পোস্তবৃক্ষেতে উৎপন্ন হয় তাহার ফল বৈকাল সময়ে অস্ত্র দ্বারা অঙ্কিত করিয়া রাখে রাত্রি যোগে তাহাতে ফলের রস জমা করা যায় প্রাতঃকালে সেই রস লওয়া যায় তাহাতে আফিম জন্মে সে আফিম কলিকাতাতে আইলে মহাজন লোকেরা তাহা ক্রয় করিয়া চীন ও মালাই প্রভৃতি দেশে লইয়া যায়। সে দেশীয়েরা যাবৎ মত্ত না হয় তাবৎ তামাকু ন্যায় খায় ইউরোপ দেশ মধ্যে আফিম কেবল তুরুকে জন্মে এবং সেখানকার মুসলমানেরা অধিক খায়। বাঙ্গালার পূর্ব্ব যত দেশ সেখানে হিন্দুস্থান হইতেই আফিম যায়। —২৩ মে, ১৮১৮।

[৪] এই মহারাজধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে বহুবিধ সমাচারপত্র প্রচারপ্রযুক্ত স্বদেশীয় বা বিদেশীয় তাবৎ লোকের পরমোপকার হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে যেহেতুক ধনি লোক অত্যল্প ব্যয়দ্বারা প্রতিসপ্তাহে নানা সম্বাদাবগত হইয়া বিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হইতে পারেন যদ্যপি অন্যলোক মূল্য প্রদান দ্বারা পত্র গ্রহণের পাত্র না হইতে পারেন তথাপি পত্রগ্রাহক ধনিরদের আশ্রয়েতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে তদ্বৎ পত্রার্থাবগত হইয়া বিবিধ বৃত্তান্ত বিজ্ঞ

হওয়াতে তাঁহারদের অসভ্যতা ও অজ্ঞান লোপপূর্ব্বক সভ্যতা ও জ্ঞানোদয় হইতে পারে এবং ইহাতে বাঙ্গলা লেখা পড়ার ধারা যাহা এতদ্দেশে পূর্ব্বে প্রায় ছিল না তাহাতেও সকলের মনঃপ্রবেশ হইবার বিষয়। এবং ভাষাতে শব্দ শ্লেষ ও বর্ণবিন্যাস ও বর্ণানুপ্রাস ও রূপকালঙ্কারাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং সতত বিষয় ব্যাপৃত লোকেরদের ক্ষণেক আলস্য ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ।

—৫ই জুলাই, ১৮২৮।

চারটি উদাহরণ থেকে দুটো ভাষারীতির সন্ধান পাওয়া যায়—একটা প্রাঞ্জল রীতি, অন্যটি পণ্ডিতী রীতি। দর্পণের সঙ্গে জড়িত পণ্ডিতদের কথা স্মরণ রাখলে পণ্ডিতী রীতির কারণ বুঝতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবেই অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল রীতির উৎস খুঁজতে হয় মিশনারীদের কলমে—মার্সম্যান তাঁদের অন্যতম। বাঙলা গদ্যের আঁতুড়ে পণ্ডিতদের সাড়ম্বর পরিচর্যার কোন মূল্য নেই, এ-মন্তব্য অনৈতিহাসিক; তবু মনে হয়, সমাচার-দর্পণের মতো পত্র-পত্রিকার স্নেহ ও স্বাচ্ছন্দ্যে গড়ে ওঠার পুরো সুযোগ যদি বাঙলা গদ্যকে দেওয়া হতো, তবে ভাষারীতির বিতর্ক এমনভাবে উঠতো না।

মিশনারী পত্রের অপক্ষপাত সাংবাদিকতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও তা স্বাদেশিক চিত্তে ক্ষোভের সঞ্চার করে—বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর আক্রমণে অনেকে অসন্তুষ্ট না হয়ে পারে নি। তারই ফলে, রামমোহন ও ভবানীচরণ 'সম্বাদ-কৌমুদী' (ডিসেম্বর, ১৮২১) প্রকাশ করেন (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।* সম্বাদ-কৌমুদীর অন্যতম কর্ণধার রামমোহন এই প্রথম বৃহত্তর জনসাধারণের আসরে যোদ্ধারূপে দাঁড়ালেন, ভূমিকা গ্রহণ করলেন গণনেতার—যদিও এর আগেই (১৮১৪) কলকাতায় তাঁর আবির্ভাব ঘটে, শাস্ত্রবিচার ও ধর্মান্দোলন শুরু হয়। একটি ফারসী পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে রামমোহনের সাংবাদিক জীবনের আরম্ভ, তারপর স্বল্পায়ু

---

* সংবাদ পত্রে সেকালের কথা। (২য় খণ্ড—২য় সংস্করণ) ১৮৪—৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সাপ্তাহিক 'ব্রাহ্মণ সেবধির'(১৮২১) সময়ে তাঁর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিতি—শিবপ্রসাদ রায় ছদ্মনামের কথা মনে রেখেও একথা বলা চলে। কিন্তু সম্বাদ-কৌমুদীর পৃষ্ঠাতেই রামমোহনের সবচেয়ে সাহসিক আত্মপ্রকাশ—চিন্তানায়ক হিসেবে, সংগ্রামশীল ব্যক্তিচরিত্র রূপে ও যুক্তিধর্মী লেখকের ভূমিকা নিয়ে। রামমোহন ও অন্যান্য সহকর্মীর নৈয়ায়িক চিত্তবৃত্তি, সর্বদিদৃক্ষু মননশীলতা ও যুদ্ধপ্রবণ মনোভাব বাঙলা গদ্যের ন্যায়সম্মত ভিত্তি, সরল প্রত্যক্ষ বাগ্‌ভঙ্গি ও শব্দ-সজ্জার ধার কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছিলো, সন্দেহ নেই। 'সম্বাদ-কৌমুদীর' ভাষার নিদর্শন—

[১] শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রাম নিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়ি খড়শী গ্রামের মিত্রদের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যা যাত্রিকেরা হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেম্না এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রির দিগকে বাসা দিয়া দ্বাররুদ্ধ পূর্ব্বক কৌশল ক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিলে তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফোঁস করত বরযাত্রিকেরদিগের গাত্রে উঠিতে লাগিল······

[২] দ্বিতীয় কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাপত্রে কোন হিন্দু-কলেজের ছাত্রের জবন নির্ম্মিত রুটি খাওনের বিষয় যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিখিতেছি যে বালকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রিকাকার লিখিয়াছিলেন তেঁহ অস্মদাদির আত্মীয় হয়েন তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তেঁহ কহিলেন যে ইহা কেবল চন্দ্রিকাকারের কল্পনামাত্র যদ্যপি হইয়াই থাকে তাহাতেই বা কি দোষ হইতে পারে যেহেতুক কেহ ঐরূপ আহার করে এক্ষণে দলপতি মহাশয়ের যে ২ লোককে ধর্ম্মসভার সম্পাদক করিয়া তাহারদের সহিত আহার ব্যবহার করিতেছেন

তাহারা যদি সেরূপ কদাচারী হইয়াও ধর্ম্মসভার চাঁদায় স্বাক্ষর কিংবা তৎবিষয়ের সহকারকরণ হেতু শুচি হয় তবে অভিপ্রায় করি এক্ষণে লোকে কত রুটি ভক্ষণ করুক কিন্তু চাঁদার এক টাকা স্বাক্ষর করিলেই রতা ঠাকুরের সন্তানের ন্যায় মান্য হইবেক অতএব চন্দ্রিকাকার আকাশে থুতকার নিক্ষেপ আর না করেন ইহাতে অনেক বিষয় ঘটিবেক। —পত্র।

এখানে ছেদের ব্যবহার হয়নি, রচনারীতিতেও সন্তোষজনক উৎকর্ষ নেই, সত্যি কথা; কিন্তু সহজভাবে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা আছে। প্রথম দৃষ্টান্তে রসিকতার সূত্রে ওজন-ভারি শব্দের আমদানি হয়নি, লঘু শব্দসজ্জা ও সহজ ভাষাবিন্যাস দেখা দিয়েছে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সতীদাহ প্রথা নিয়ে ঝড় উঠলো। একদিকে রামমোহন, হরিহর দত্ত ইত্যাদি, অন্যদিকে রাধাকান্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ফলে প্রতিষ্ঠা হলো 'সমাচার-চন্দ্রিকার' (১৮২২)—ভবানীচরণের নেতৃত্বে। সুতরাং এক ধর্ম-কেন্দ্রিক কলহে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিলো গুরুতর—ধর্মসভার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের অংশীদার। কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকেও চন্দ্রিকার কৃতিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। ভবানীচরণের জীবনী-কারের মতে, গৌড়ীয় সুকোমল সাধুভাষার চর্চার মধ্য দিয়ে চন্দ্রিকা হয়ে উঠেছিলো ভাষা-পরিবর্তনের মূলসূত্র—যবনাধীন দিশি ভাষার সাধুভাষায় রূপান্তর ভালো কি মন্দ, সে-প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়। রাজনৈতিক চিন্তায়ও পত্রিকাটি পেছিয়ে থাকেনি। এবং তাতে দেশের উপকার হয়েছিলো বৈ কি। আর গদ্য ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য, সরসতা ও সাহিত্যগুণ সঞ্চারেও এর দান অস্বীকার করা যায় না। ভবানীচরণ ছিলেন চন্দ্রিকার মুখ্য লেখক, তাঁর 'গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটুতা ছিল যে যে কোন কথা কটুতা-রূপে লিখিতা হইলেও মাধুর্যরসরহিতা' হতো না। পত্রিকাটির ভাষার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাক।

'তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোম্বে দর্পণে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং তাহার আরজীর বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্বিষয়ে হুকুম প্রকাশ হইয়াছে ইহা কি তাবৎ অলীক। উত্তর, আমরা তাহা তাবৎ অলীক বলি না তদ্বিষয়ে এই বিবেচনা করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান এখানে তাহার পাচক ছিল সেই গিয়াছে তাঁহার পরিচর্য্যা কর্ম্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরত্ন মুখোপাধ্যায় হইবেক। রায়জী চতুরতা করিয়া ঐ আরজীতে তাহারি নাম দিয়া তথায় দরপেশ করাইয়াছিলেন যদি তাহাতে মঙ্গল হইত তবে আপনার নাম ব্যক্ত করিতেন সেখানে আরজী অগ্রাহ্য হইল সুতরাং ঐ দীনহীনের নাম প্রকাশ হইল এবং ইহাও সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করাইলেন যে আমি কেবল বিলাতে আগমন করিয়াছি এমত নহে আমার আগমনের পরেই আর একজন ব্রাহ্মণ বিলাতে আসিয়াছে এবং আরো অভিপ্রায় আছে লাখরাজ বিষয়ে আরজী যদি রায়জী আপনি দরপেশ করেন তবে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন।'

—১৯শে অক্টোবর, ১৮৩৩।

।চন্দ্রিকার এই ভাষার ঝোঁক বক্তব্য পরিস্ফুটনের দিকে, অযথা আড়ম্বরের দিকে নয়। এবিষয়ে সম্বাদ-কৌমুদীর চেয়ে চন্দ্রিকার কৃতিত্ব কম নয়, দর্পণের চেয়ে বেশি তো বটেই। এই সমাচার-চন্দ্রিকার প্রসঙ্গেই ভবানীচরণের কথাও একটু বিস্তৃতভাবে বলে নেওয়া দরকার।।

॥ দুই ॥

অরসিক ইতিহাস একমাত্র বিরাট ব্যক্তিত্বের শাসন মেনে চলে না, বহুজনকণ্ঠের সম্মতিরও অপেক্ষা রাখে না। তার নিরাসক্ত

চোখে সত্যের চেয়ে বড়ো মর্যাদা আর কারও নেই। ইতিহাসের এই সর্বদিদৃক্ষু দৃষ্টি না থাকলে পৃথিবী এতদিনে মিথ্যার রাজ্য হয়ে উঠতো। রামমোহন নবযুগের অবিস্মরণীয় হোতা, মধ্যযুগীয় জড়ত্বের অভিশাপ থেকে জাতির মুক্তির নায়ক, তাতে সন্দেহ কি—কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস বলে, ভবানীচরণের সংরক্ষণশীলতারও কালানুগ তাৎপর্য আছে, আছে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ব-মহিমা। ভবানীচরণ কালপুরুষ।

সেকালে নাগরিক জীবনে ছিলো অর্থের প্রতিশ্রুতি, তাই পিতা রামজয় গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এলেন, ধন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন। গ্রামে ভূমিষ্ঠ হলেও পুত্র ভবানীচরণের লেখাপড়া শুরু হলো কলকাতায়, স্বল্পকালের মধ্যেই 'বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা তাঁর অভ্যাসের অগ্রসারিণী' হলো। কিন্তু পিতার আর্থিক অসচ্ছলতায় ষোল বছর বয়সেই তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করলেন, তাঁর রীতিমতো লেখাপড়া (formal schooling) আর হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই একাধিক ভাষা তাঁর অধিগত—সংস্কৃত (তাঁর সম্পাদিত শাস্ত্রগ্রন্থ দ্রষ্টব্য), ইংরেজী ('Speaking good English'—Rev. R. Heber), ফারসী ও বাঙলা। এবং বহুমুখী বিদ্যাও।

ভবানীচরণের কর্মজীবনে বিচিত্র ঘটনা দেখতে পাই। ডকেট কোম্পানী থেকে শুরু, মিং হিকি বেলি কোম্পানীতে অন্ত—সরকার থেকে প্রধান পদস্থ। মাঝখানে অজস্র ব্যক্তির অধীনে ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন, প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, কার্যদক্ষতায় নিয়োগকর্তাদের মনোরঞ্জন করেছেন। কিন্তু কোন দিন অসাধু ও অন্যায়ের পথ নিয়েছিলেন বলে জানা যায় নি। আসল কথা, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলো, কর্মকালীন অধীনতা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তিত্ব তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। তিনি গৃহী ছিলেন, সন্দেহ নেই—কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ আচারনিষ্ঠ গৃহী।

বাঙলার সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকলাপ বিচারের আগে

একটা কথা মনে রাখতে হবে। পাশ্চাত্ত্য ভাবের বিরুদ্ধে ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ ও কলকাতার পণ্ডিত সমাজের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই অজ্ঞানতাপ্রসূত—কিছু বা পরোক্ষ ধারণাজাত। কিন্তু ভবানীচরণ ইংরেজী ভাষা ও বিদ্যায় পারদর্শী—তাই তাঁর ধর্মান্দোলন নির্বিচার প্রতিক্রিয়া নয়, বিচারপ্রবণ চিত্তের সিদ্ধান্ত। তাঁর সামাজিক ভাবনার প্রথম প্রকাশ দেখি সম্বাদ-কৌমুদীর প্রকাশে ও সম্পাদনায়। সেখানে তিনি রামমোহনের দক্ষিণ হস্ত, বিশ্বস্ত সহযোগী। আগেই বলেছি, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা প্রকাশ্যভাবেই ধর্ম-প্রচারে ব্রতী ছিলেন এবং তাতে সংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক হিন্দু-সমাজ তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান সমাজও তো অবিকৃত ছিলো না, তাদের মিশনারীরা আক্রমণ করলেন না কেন? ইসলামধর্মের একত্ববাদ খৃষ্টানধর্মের অনুমোদিত ও নৈকট্যধর্মী। দ্বিতীয়তঃ মুলমানদের বিরোধিতা করলে নবাবী আমলের বিত্তশালী উত্তরপুরুষদের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো, তাই তাদের সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন মিশনারীরা। ভবানী-চরণের এসব অজানা ছিলো না এবং সে-কারণেই তাঁর খৃষ্টানদের আক্রমণকে বিদ্বেষপ্রসূত ও অযৌক্তিক মনে করার সঙ্গত কারণ ছিলো। ভবানীচরণ ব্যবসায়ী ইংরেজদের প্রীতিভাজন ও বিশ্বস্ত হয়েও তাই মিশনারী-বিরোধী হলেন, হাতে তুলে নিলেন একটা কঠিন কর্তব্য। এতে তাঁর সাহসিক চরিত্রসত্তা ও সামাজিক কাণ্ডজ্ঞানের প্রমাণ আছে। কিন্তু রামমোহন সতীদাহ নিরোধ নিয়ে ঝড় তুললেন যেদিন, সেদিন তাঁকে ত্যাগ করতেও ভবানীচরণের দ্বিধা দেখিনে। আসল কথা, তাঁর সামাজিক চেতনা বাইরে থেকে আরোপিত আদর্শকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিলো না—যদি সেই আদর্শের সঙ্গে বড়ো নাম জড়িত থাকে, তবু নয়। তাই একদিকে রামমোহনের নবমন্ত্র তিনি মেনে নিতে পারেন নি, অন্যদিকে হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা নতুন আর্থিক সম্প্রদায়ের বাবুতন্ত্রও তাঁর মনোহরণ করেনি।

তবে আপন স্বভাবের তাগিদে সামাজিক পরিবর্তনের গজগতি ভবানীচরণ স্বীকার করতেন বলেই মনে হয়। কিন্তু সমসাময়িক কালে নানা দিক থেকে হিন্দুসমাজের ওপর আক্রমণ তাঁর চোখে দিয়েছিলো পরিবর্তনের ভুজঙ্গগতির আভাস। তাই ভবানীচরণ হলেন সংরক্ষণশীল ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী। এ যুগের ক্ষুরধার বুদ্ধির তরোয়ালী চেষ্টারটনের traditionalism-এর কথা মনে রাখলে একে অপরাধ বলা যায় কি? এলিয়টও যদি শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে পারেন রোমান ক্যাথলিক গীর্জায়, তবে ভবানীচরণের ধর্মসভায় আশ্রয় নেওয়া ন্যক্কারজনক নয়।।

সামাজিক প্রাণের গরজে ভবানীচরণ বাঙলা সাহিত্যের লেখক। মিশনারী ও রামমোহনের সঙ্গে যুদ্ধে কার জয় হলো সেটা ইতিহাসের জিজ্ঞাসা, কিন্তু তাতে বাঙলা গদ্যের যে লাভ হলো তা রসিকজনের আনন্দের কথা।। রামমোহন বাঙলা গদ্যকে দিলেন বিচারের ন্যায়, তর্কের গতি ও চিন্তার যৌগিকতা, আর ভবানীচরণ দিলেন ব্যঙ্গের রসকষ, আক্রমণের বপ্রকৌশল ও চতুর ক্ষিপ্রচারিতা। এবং, বলা বাহুল্য, তাতেই গদ্য কিছুটা সাহিত্যগুণ পেয়েছে। ভবানীচরণ ব্যক্তিত্বে ও বুদ্ধিতে রামমোহনের সমকক্ষ ছিলেন কিনা, তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায় কিনা— এই সব নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু তাঁর লেখার মর্যাদা তর্কের অতীত। বাঙলা গদ্যের সেই শিশুপীঠে তিনি মেজর শিক্ষানবিস, মাইনর নন।।

ভবানীচরণের অনেক লেখা ছড়িয়ে আছে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, কিন্তু সংবাদপত্রের নামহীন অজস্র রচনার মধ্য থেকে ভবানীচরণের লেখাগুলি আজ আর চিনে নেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু গ্রন্থাকারে তাঁর চারটি মৌলিক রচনা পাওয়া গেছে — ছদ্মনামের আবরণ এদের কোন কোনটিতে ছিলো, তব আসল লেখকের নাম কারও অজানা নেই। 'নববাবুবিলাস' বোধায়

শ্রীপ্রমথনাথ শর্মার নামে—'কলিকাতা কমলালয়' ও 'দূতীবিলাস' স্বনামে, 'নববিবিবিলাস' ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনামে—আঠারো শ' তেইশ থেকে তিরিশের মধ্যে। শেষেরটি ছাড়া গ্রন্থগুলি গদ্যে লেখা হলেও মাঝে মাঝে পদ্যের রসালতা আছে।...'ইংরেজ নবাবের সংগ্রামকালে কলিকাতা মন্থন হইয়াছিল তাহাতে বিষাদরূপ হলাহল ও হর্ষরূপ অমৃত উঠিয়াছিল'—গ্রাম্যজনের সুবিধার্থে এমনিতর নগরীর 'ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরীর' স্থূলবৃত্তান্ত কলিকাতা কমলালয়ে পাই। নববাবু-বিলাসে আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলিকাতায় গজিয়ে-ওঠা ধনী ও অশিক্ষিত বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি সম্প্রদায়ের 'বাবু' সন্তানদের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত। দূতীবিলাস আদিরসাত্মক কামসাহিত্য—'সুকোমল পয়ারাদি ছন্দে রচিত।' এর রচনার উদ্দেশ্য—

দূতীভক্তি দূতীস্তুতি করে বহুজন।
গোপনে কেমনে দূতী করয়ে মেলন॥
যুবক যুবতী পেয়ে ধরে কি আচার।
এসব বর্ণনা করি কহিয়া বিস্তার॥

নববিবিবিলাস (১৮৩০ না ১৮৩১?) বাবুদের 'বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল'-এর বিবরণ। তাই নববাবুবিলাসের সঙ্গে এর যেমন একটা বিষয়গত সম্পর্ক আছে, তেমনি সম্পর্ক আছে দূতীবিলাসের সঙ্গেও। লেখক নিজেই বলেছেন—'কোন বাবু আপন আশার সুসার হেতু ঐ কামিনীর ('বিবি') নিকট দূতী প্রেরণ করেন, সেই দূতী কামিনীকে যেরূপ রস দেখাইয়া বশ করে তাহা দূতীবিলাস গ্রন্থেই নির্য্যাস মতে প্রকাশ হইয়াছে।'

'কলিকাতা কমলালয়ে' সামাজিক উদ্দেশ্যের দ্যোতনা অস্বীকার করিনে, কিন্তু তাতে রচনারীতির সরসতা ও ব্যঙ্গাত্মক লঘুভঙ্গীরও প্রকাশ আছে। এখানে কার্লাইলের অভিশাপের কশাঘাত, সুইফ্‌টের মর্মভেদী বাক্যবাণ বা শ'য়ের দীপ্ত ব্যঙ্গাস্ত্র নেই—তা

আশা করাও অন্যায়, তবু যা আছে তাকে বলতে পারি পরিহাসচতুর বাঁকাভঙ্গি। এতে নির্মম জ্বালার চেয়ে সকৌতুক ঠাট্টার ভাবটাই বেশি—যদিও একেবারে নিরীহ নয়।/ 'অবতরণিকা' থেকে একটা উদ্ধৃতি দিলেই কমলালয়ের ভাব-ভঙ্গি বোঝা যাবে—

(১) কলিকাতা মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা হইয়াছে বৃহৎ কর্ম্মকালে মুদ্রাজল নির্গত হইয়া নানাদিগ দেশগামী হইতেছে নানাবিধা মুদ্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে বিবিধ বিদ্যা ও বিদ্যানরূপ বহু রত্ন আছে ইংরাজ নবাব সংগ্রাম কালে কলিকাতা মন্থন হইয়াছিল তাহাতে বিষাদরূপ হলাহাল ও হর্ষরূপ অমৃত উঠাইয়াছিল কলিকাতা নিরুপমা ও সর্ব্বদেশ খ্যাতা হইয়াছে পরনিন্দা-পরায়ণ অনেক জন হাঁগর কলিকাতা বাস করিতেছে এবং মূর্খরূপ ভয়ানক কুম্ভীর অনেক ব্যাড়াইতেছে···।

—কলিকাতা কমলালয়।

(২) বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম ২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবী কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ বা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণীপূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমন সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন একশত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদ্‌গর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোন কালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না। ভাল আমি জিজ্ঞাসা করি ঐ সকল কেতাব তাঁহারা রাখিয়াছেন ইহার কারণ কি আমি পাড়াগেয়ে ভূত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তর্ক করিয়া মরিতেছি···।

—কলিকাতা কমলালয়।

কিন্তু/'নববাবুবিলাসে' ভবানীচরণ আরেকটু বেশি মারমুখী হয়ে উঠেছেন। যে সহৃদয় সহানুভূতি পূর্বের গ্রন্থটিতে লেখকের বিদ্রূপের সহগ ছিলো, তা ক্রোধ না হোক বিরাগের উত্তাপে কিছুটা শুকিয়ে

গেছে। এতে সরস পরিহাসের বদলে কষাশ্রিত উপহাসের দিকেই যেন ঝোঁক বেশি। তাই সামাজিক ক্ষেত্রেও বিলাসাখ্য গ্রন্থটি কমলালয়ের তুলনায় অধিক আলোড়ন তুলেছে। তাই পাদরি লং একে বলেছেন 'ablest satire'।।

। নববাবুবিলাসের অগ্রজদের সন্ধান পাই সমাচার-দর্পণের পৃষ্ঠায় —'বাবুর উপাখ্যান' (১৮২১), 'শৌকীনবাবু' (১৮২১), 'বৃদ্ধের বিবাহ' (১৮২১), 'ব্রাহ্মণসংবাদ' (১৮২১) ও 'বৈদ্যসংবাদ' (১৮২১) নামক চিত্র-চরিত্রে। আর তার উত্তরপুরুষ হচ্ছে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'।। ।অনেকের অনুমান, সমাচার-দর্পণের নক্সাগুলি ভবানীচরণেরই রচনা—আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দেখেও তা-ই মনে হয়।। সে যা-ই হোক, নববাবুবিলাস দর্পণ-বিধৃত নক্সাগুলির বিস্তৃততর সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে এদের তৌলন বিচারেও দেখা যায়, বাবুর উপাখ্যানের তিলকচন্দ্রের অস্তিত্ব সত্ত্বেও ব্যক্তিচরিত্রের ওপর লেখক জোর দেননি, দিয়েছেন সমাজ-চরিত্রের ওপর। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিলকচন্দ্র আছেন এবং তাকে ঘিরেই চিত্রের রেখাঙ্কন। কিন্তু নববাবুবিলাসে জগদ্দুর্লভ রাধাবল্লভের নামকরণ সত্ত্বেও বহুবচনের ভিড়ের মধ্য থেকে তাদের ব্যক্তিগতভাবে একেবারেই চেনা যায় না, তাদের চেনানোর দরকারও লেখক বোধ করেননি। তাদের নামোল্লেখও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে নয়, আপন আপন বিদ্যার পরীক্ষা-প্রসঙ্গে। সুতরাং বাবুর উপাখ্যানের বাবুসমাজের চেহারার ওপর জোর থাকলেও ব্যক্তিচরিত্র উপেক্ষিত হয়নি (বৃদ্ধের বিবাহের অবুঝচন্দ্র, ব্রাহ্মণ সংবাদের ভট্টাচার্য, শৌকীন বাবুর গুণনিধি ও বৈদ্যসংবাদের কণ্ঠাভরণের কথাও এখানে স্মরণীয়); কিন্তু নববাবুবিলাসে চরিত্র-গুলির স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব একেবারেই অস্ফুট থেকে গেছে।

।কিন্তু ব্যক্তিচরিত্রের পরিপূর্ণ প্রস্ফুটন এতে না ঘটলেও সমাজ-চিত্র ফুটেছে—উদ্যানের প্রতিটি ফুলের বিকাশ হয়নি বটে, তবে কেয়ারীর চেহারায় অস্পষ্টতা নেই। তাছাড়া বাঙলা দেশের ঘরের

কাহিনী এমনভাবে ভবানীচরণের আগে আর কেউ লেখেননি, বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে রসের কর্ষণে গদ্যের প্রয়োগের এটিই প্রথম সার্থক উদাহরণ ।। নববাবুবিলাসের হাস্যরস স্থানবিশেষে বেশ স্থূল। লেখকের তুলির আঁচড়ে অধিকাংশ জায়গায় কোন শৈল্পিক সূক্ষ্মতা নেই, কাহিনীর নানা অঙ্গে যোগসূত্রেরও অভাব আছে—এমন কি কোন কোন বৃত্তান্ত নীরস ও দুর্বল—তবু নক্সাটির রসরূপ (character of the work) সেকালে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে ভবানীচরণকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে ('নববাবুবিলাস' সম্পর্কে আরও আলোচনা প্যারীচাঁদ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

।নববাবুবিলাসের ভাষা ভবানীচরণের অন্যান্য বইয়ের ভাষার সঙ্গে অভিন্ন। কমলালয়ের রূপকধর্মী পূর্বোক্ত প্রথম অনুচ্ছেদটি অনেক তৎসম শব্দ আত্মসাৎ করে নিয়েছে—তবু সংস্কৃত উপাদানের ওপর তাঁর ভাষার নির্ভরশীলতা সর্বত্র দেখা যায় না। প্রয়োজন মতো ইংরেজী ও মুসলমানী শব্দ ব্যবহারে তাঁর কার্পণ্য নেই। পণ্ডিতী রীতির গদ্যের চেয়ে তাঁর গদ্য অপেক্ষাকৃত সহজ, সন্দেহ কি।।

সংস্কৃত-ঘেঁষা রচনারীতি :

(১) প্রথমতঃ তালপত্রস্থিত কণ্টকবিনির্ম্মিত চতুস্ত্রিংশদক্ষরে মাসচতুষ্টয়ে মাসপঞ্চকে বা লেখন দ্বারা কাঁচাদি নির্ম্মিত বিচিত্র বিচিত্র পাত্রস্থিত মসি প্রদানাধীন বাবুদিগের হস্ত বশ হইয়া থাকে তৎপরে মাসদ্বয় মাসত্রয়স্থা ঐ বালক বাবুসকল রীতিবৈপরীত্যেন অক্ষর লিখিয়া থাকেন··· —নববাবুবিলাস।

সহজতর রচনারীতি :

(২) প্রথমে এক ফল এক মহাজন টাকার নিমিত্তে লোক পাঠাইলেক, বাবু কহিলেন লোট বদল করিয়া দিব। লোট বারম্বার ফেরাফেরি হইয়াছে অনেক টাকা পাওনা হইল, তাহারা সে কথা শুনিয়া ওয়ারিণ করিলেক। খলিপা কহিলেন, একি হয়, পেয়াদা লইয়া যায়। তিনি কহেন চিন্তা কি, যাওনা কেন।

—নববাবুবিলাস।

বিদ্যাসাগর

আঠারো শ' উনত্রিশ সালের পয়লা জুন। এই দিন মাত্র নয় বছর বয়সে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে পড়তে শুরু করেন। বর্তমান সালেই ডিসেম্বর মাসে সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়—সহমরণ প্রথার অবসান ঘটে। বালক বিদ্যাসাগর ক্রমে বড়ো হলেন, লেখাপড়া শিখলেন, কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। তারপর আঠারো শ' ছাপ্পান্ন সালে বিধবা বিবাহের নায়ক রূপে ছত্রিশ বছরের বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয় ঘটলো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সহমরণ প্রথার উচ্ছেদের সময় থেকে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময় পর্যন্ত আমাদের সামাজিক ইতিহাসে যে অগ্রগতির অধ্যায়—তা-ই বিদ্যাসাগরের মানসিক সংগঠনের কাল। দেশ একটু একটু করে যখন এগোচ্ছে, তখন একটি মানুষের মতো মানুষও দেহমনে বেড়ে উঠছেন। সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তির ইতিহাসের এই সময়-সম্বন্ধ তাৎপর্যহীন নয়। কারণ অজস্র ঘটনার রক্তরসে যুগ ও পরিবেশ যেমন ব্যক্তিকে গড়ে তোলে, তেমনি ব্যক্তির আলোতে সমাজের পটভূমিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বিদ্যাসাগরের আত্ম-প্রস্তুতির কালে দেশের বুকে তিনটি আদর্শের স্রোতোবেগে সৃষ্টি হয়েছিলো একটা আবর্ত। সেই আবর্তের মধ্যে পড়ে মানুষের চিত্ততলেও ভাঙ্গাগড়া চলেছিলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়ার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব থেকে কি করে তিনি দূরে

সরে রইলেন? সেই উত্তাল ঢেউ কি কোন অসতর্ক মুহূর্তেও তাঁর মন ছুঁয়ে যেতো না, তাঁর অন্তরে ঘর-ভাঙানিয়া গান জাগাতো না, তাঁর মনের অভিনিবেশে তরঙ্গ তুলে তাঁকে চঞ্চল করে দিতো না? চোখে প্রদীপের তেল দিয়ে তিনি যে বিনিদ্র রজনী কাটাতেন, সে কি শুধু পিতার ভয়ে পড়বার জন্য? আর কোন মানসিক উদ্বেগ কি তাঁকে চঞ্চল করে তোলে নি? তখন সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ ছিলো একই বাড়িতে—পরস্পরের লাগোয়া—যে পথে বিদ্যাসাগর কলেজে ঢুকেছেন নীরবে, সেই পথেই কলরব করতে করতে ঢুকেছেন ইয়ং বেঙ্গলের দল। তাঁদের কথার টুক্‌রো, আলোচনার ছিটেফোঁটা, দু' এক ছত্র লেখা কি তাঁকে কখনও উন্মনা করে তোলে নি? অথচ ছাত্র জীবনেই রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণা মুখুজ্যে ও রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো। অন্যদিকে রামমোহনের শিষ্যের দলও সমাজে কেউকেটা ছিলেন—ব্রাহ্মধর্মের ঢেউ যে কি ধরণের জিজ্ঞাসা ছাত্রদের মনে এনেছিলো, তার কিছু পরিচয় পাই রাজনারায়ণের আত্মচরিতে। অথচ বিদ্যাসাগর সব কিছু দেখেও দেখলেন না, শুনেও শুনলেন না, তাঁর মন শুধু বলে চললো—'পড়ো, পড়ো আর পড়ো।'

সত্যিই বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনটা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, সেখানে তপশ্চর্যা চলেছে অহোরাত্র। ব্যাকরণ থেকে কাব্য, অলঙ্কারের পর বেদান্ত আর স্মৃতি, তারপর ন্যায় আর জ্যোতিষ—শুধু পড়েই চলেছেন, সেখানে কোন ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। ঠাকুরদাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির শাসন এড়িয়ে বিষয়ান্তরে মনের শিকড় ছড়াবার কোন সুযোগ তাঁর ছিলো না। তা ছাড়া যেটুকু বা অবসর ছিলো, তা ব্যয় হতো গৃহকর্মে। দুঃখের সংসারে তিনি বড়ো হয়েছেন, দুঃখ যতই তীব্র হয়েছে ততই তিনি সারস্বত সাধনায় আরও বেশি মগ্ন হয়েছেন। তাই তো বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। এই নীরন্ধ্র

বিদ্যাভাসের বুক চিড়ে তাঁর বিক্ষিপ্ত মনের দু' একটি জলদর্চি-রেখা মাত্র আমাদের চোখে ধরা দেয়। মনে করতে অবাক লাগে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে হয়েও এক সময় আহ্নিক ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যাদি সম্পর্কে আন্তরিকতা ছিলো না বলেই বাবার সামনে আহ্নিক করার ভান করতেন। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিমা পূজায় নয়। তা ছাড়া সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময়ে তিনি ইংরেজী পড়তে আরম্ভ করেন। সকলের চেয়ে বড়ো ঘটনা, তাঁর আচার্য বাচস্পতি মশায় বার্ধক্যে বালিকা ভার্যা গ্রহণ করায় তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন—'এ ভিটায় আর জলস্পর্শ করবো না।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের পুরুষানুক্রমিক রক্তের শাসন মিথ্যা হয়ে গেলো, এক যুগ ব্যাপী সংস্কৃত আর শাস্ত্রচর্চা মনে দাগ কাটতে পারলো না, চেতনার অণুতে পরমাণুতে ছড়িয়ে গেলো যুগ-প্রবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অনিয়মের দিনটাই বড়ো দিন, মনের বাজে খরচটাই সব চেয়ে সেরা খরচ। বিদ্যা-সাগরের মনোজীবনও তাই ধরা দেয় বারো বছরের একঘেয়ে পাঠাভ্যাসের মধ্যে নয়, বরং কয়টি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের মধ্যে।

কর্মজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্টতা দেখতে পাই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতি করবার সময়ে তিনি মার্শেল সাহেবকে বলেছিলেন, অন্যায়ভাবে কাউকে পাশ করিয়ে দিতে পারবেন না। ইয়ং বেঙ্গল যে সত্যবাদিতার গর্ব করতো, বিদ্যাসাগরের এই ন্যায়নিষ্ঠা তার চেয়ে কোন ক্রমেই হীন নয়। ছেচল্লিশ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন। কলেজে সময়নিষ্ঠা বলে কিছু ছিলো না—তিনি সহকারী সম্পাদক হয়ে পঠন-পাঠনের সময় নির্দিষ্ট করে দিলেন, ছাত্রদের কাঠের পাশ নিয়ে স্থানান্তরে যাওয়ার রীতি প্রবর্তন করলেন। এক কথায়, তাঁর আমলে স্বেচ্ছাচারিতার বদলে বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো।

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের ছাত্রদের অঙ্ক শিক্ষার নিয়ম করলেন তিনি। তারপর একান্ন সালে তিনি হলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। এই সময়ে সমস্ত ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্য কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। যে লোকশিক্ষার জন্য আজকের দিনে আমরা আন্দোলন করে থাকি, এক শ' বছর আগে বিদ্যাসাগর তার সূচনা করেন। এর চেয়ে প্রগতিশীল চিন্তা তখন আর কি হতে পারতো? এই সময়ে ঐচ্ছিক ইংরেজী শিক্ষা আবশ্যিক শিক্ষা রূপে গৃহীত হয়, তার জন্য শিক্ষকও নিযুক্ত হতে দেখি। তিনি নানা স্থানে মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, বাঙলা স্কুলের উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য গড়ে তুললেন নর্মাল স্কুল। আরও দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। তিনি বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, সাপ্তাহিক বন্ধের দিন তিথি অনুযায়ী নির্দিষ্ট না করে রবিবার নির্দিষ্ট করে দিলেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা এতকাল অবৈতনিক ছিলো, কিন্তু বিদ্যাসাগর ছাত্রদের ইংরেজী স্কুলে ট্রান্সফার নেওয়া ও ছাত্রদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি বন্ধ করার জন্য প্রথমপ্রবেশ ও পুনঃ-প্রবেশের দক্ষিণা হিসেবে দু'টাকা করে আদায় করার রীতি প্রবর্তন করেন। পরে ছাত্রদের মাসিক একটাকা বেতন নির্দিষ্ট হয় (১৯৫৪)। এ-আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি রামমোহনের শিক্ষানীতিরই ক্রম-পরিণতি ও পরিপূরক এবং সেই শিক্ষানীতির মধ্যে প্রাচ্যাদর্শ নয়, পাশ্চাত্ত্যাদর্শই বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাসাগর শিক্ষার পদ্ধতিকে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি বা মর্জি থেকে উদ্ধার করে যুক্তি, কার্যকারিতা ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। যেখানে বাবা চেয়েছিলেন, সংস্কৃত কলেজ থেকে পাশ করে ছেলে টোলের পণ্ডিত হোক, সেখানে ছেলে কোথায় এসে পৌঁছোলো তা লক্ষ্য করলে বিস্ময় জাগে বৈকি!

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কালে ক্লাসিক্যাল বিদ্যার চর্চা স্পষ্টতঃই বিদ্যাসাগরের অভিপ্রেত ছিলো। কিন্তু সেই ক্লাসিক্যাল বিদ্যার

সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে আধিদৈবিক সংস্কার ও অচল মানসিকতা তা থেকে বিদ্যার মুক্তি চেয়েছিলেন তিনি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, বিদ্যার যথার্থ আশ্রয় মানুষ এবং যা মানুষের অন্তর্জীবনকে স্ফূর্তি দেয়, সকল প্রকার বন্ধন থেকে তার মনের মুক্তি আনে, তা-ই সত্যিকারের বিদ্যা। বিদ্যাসাগর এই মুক্তবিদ্যারই উপাসক ছিলেন। মুক্তবিদ্যার উপকরণ শুধু যে আধুনিক পাশ্চত্ত্য দেশেই পাওয়া যায়, তা নয়—তা ছড়িয়ে আছে ভারতীয় ক্লাসিক্যাল শাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যেও। তাই রামমোহনের উত্তরপুরুষ বিদ্যাসাগর শাস্ত্রালোচনার পথ নিয়েছিলেন, প্রাচীন জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন (revival of classical learning) চেয়েছিলেন। তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী আর ঋজুপাঠ প্রাচীন বিদ্যার মণিকুট্টিমের দ্বার উদ্ঘাটন করার চাবিকাঠি বিশেষ। এছাড়া 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' থেকে শুরু করে 'হর্ষচরিত' পর্যন্ত এগারখানা মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদন করেও (ছাপ্পান্ন সালের মধ্যে সর্বদর্শন-সংগ্রহঃ, রঘুবংশ, কিরাতার্জুনীয়ম্) তিনি য়ুরোপের রেনেসাঁস যুগের মতোই antiquity-চর্চার আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। মানবধ্যানী পণ্ডিত হিসেবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো শাস্ত্রগত তর্ক-বিতর্ক ও সাহিত্যগত আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এমন একটা পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির জন্ম দেওয়া যা অবশেষে যুগোপযোগী স্বাধীন চিন্তা ও আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করবে। অন্যভাবে বলা যায়, ক্লাসিক্যাল বিদ্যার ক্ষেত্র থেকে আধুনিক মনের খোরাক ও জীবনের আদর্শ সংগ্রহ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো।

আরেকদিকে য়ুরোপের অর্বাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ও নীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো। উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্যের বিদ্যাচর্চার স্বরূপ ও ইতিহাস তিনি জানতেন—তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের সে সব বই আজও টিকে আছে তা থেকে তা প্রমাণ করা যায়। সে সব বই তিনি পড়েছেন, তারপর ভেবেছেন, সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাই হোক আর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাই

হোক সব ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একদিকে মনে করতেন—'That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute'। অথচ এদেশে তা না পড়িয়ে উপায় নেই (স্মরণীয়ঃ রামমোহন সাংখ্য ও বেদান্তের পঠন-পাঠন বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন)। অন্য দিকে তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি—'whilst teaching these in the Sanskrit course we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence'। ঠিক এই কারণেই তিনি বার্কলের 'Inquiry' পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান নি, কারণ বেদান্ত-সাংখ্যের মতো বার্কলের দর্শনও ছাত্রদের মনকে সত্যনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী ও পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে না। বিদ্যাকে তিনি আত্মস্থ ও আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলেই পাণ্ডিত্যের স্থূল অহঙ্কারে আত্মগুপ্তি অবলম্বন করেন নি। যথার্থ হিউম্যানিষ্টের মতো উন্নাসিকতা বিসর্জন দিয়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর রচিত বর্ণপরিচয় বোধোদয়, কথামালা, জীবনচরিত, আখ্যানমঞ্জরী ইত্যাদি একদিকে যেমন বিদ্যাসাগরের সহজপাচ্য পাণ্ডিত্য ও মানবতন্ত্রী সত্তা প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহের পরিচয় বহন করেছে। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, তিনি সংস্কৃতের ঐতিহ্যে মানুষ হয়েও, তার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হয়েও বাঙলা ভাষার সেবা করেছিলেন। মানুষ যাঁর কাছে ধ্যানের বিষয়, তাঁর কাছে এটাই প্রত্যাশিত। এই বিদ্যাসাগরই আবার স্ত্রীশিক্ষারও অধিনায়ক। তিনি বেথুন বিদ্যালয়ের সম্পাদক হন পঞ্চাশ সালে। সাতান্নর শেষ দিক থেকে মাত্র সাত মাসের মধ্যে তিনি পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে ছাত্রীদের সংখ্যা দাঁড়ালো তের শ'।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর যুগধর্মী পুরুষ ছিলেন, সমাজ ও জীবনের মুক্তির হাওয়া ছড়িয়ে আছে কোন্ দিগন্তে তা

তিনি জানতেন। যে মানবকেন্দ্রিক ভাব ও ভাবনা আধুনিক যুগের মর্মমূলে রস সঞ্চার করছে, তিনি ছিলেন তাতেই—সেই হিউম্যানিজমে বিশ্বাসী। বাল্যে যিনি ছিলেন গোঁয়ার—যৌবনে কর্মক্ষেত্রে তিনিই হলেন স্বাতন্ত্র্যবাদী। আরম্ভের 'এঁড়ে বাছুর' পরিণতিতে পুরোপুরি individualist। ছাপ্পান্ন সালের মধ্যেই কর্মী বিদ্যাসাগরকে মাথা উঁচু করে চলতে দেখি—ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারীদের সঙ্গে আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতেন, আঘাতের বদলে আঘাত দিতেন—মতের অমিল হলে চাকুরী ছাড়তে দ্বিধা করতেন না। এই individuality নব যুগের দান নিশ্চয়ই, হয়তো কিছু বা শিরার ব্রাহ্মণ্য রক্তেরও দান।

কিন্তু শুধু হিউম্যানিজ্‌ম্‌ নিয়েই কি বিদ্যাসাগর বেঁচেছিলেন? না, তার সঙ্গে এসে যোগ হয়েছিলো—হিউম্যানিটারিয়ানিজ্‌ম্‌। দরিদ্র ও শোষিত জনমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আমাদের মধ্যে আজকের দিনে দেখা যায়—বিদ্যাসাগরের হিউম্যানিটারিয়ানিজ্‌মের জন্ম তা থেকে হয়নি। আমরা জানি, তাঁর দয়াদাক্ষিণ্য, মহত্ত্ব, সেবা, স্নেহ ও প্রীতির অজস্র কাহিনী (anecdotes) ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন বিদ্যাসাগর-চরিতে। আজ আমাদের কাছে তিনি বেঁচে আছেন সেই anecdotes-এর মধ্য দিয়ে। কিন্তু নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচরিত্রের উপাদান হিসেবে এই সব গুণের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতে কেউ কেউ আপত্তি করেছেন। সত্য কথা, সকল যুগে সকল মানুষের মধ্যে এই জাতীয় গুণ কম-বেশি দেখা যায়—তাই শুধু মহত্বের মুকুরে একটি যুগধর্মী মানুষের চেহারা ঠিক চেনা যায়না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের যুগধ্যানী হিউম্যানিষ্ট সত্তায় যখন যুগাতিশয়ী হিউম্যানিটারিয়ানিজ্‌মের দোলা এসে লাগলো—তখন তাঁর চরিত্রের পরিধি গেলো বেড়ে, তার মধ্যে হৃদয়ের ছোঁয়া এসে লাগলো, এলো সর্বাশ্রয়ী করুণা ও সংবেদনশীলতা। এক কথায়, বিদ্যাসাগর বৃহৎ ও মহৎ মানুষ হয়ে উঠলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ্যাসাগর এই হিউম্যানিটারিয়ানিজ্‌মের দীক্ষা কোথা থেকে পেয়েছিলেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, বিদ্যাসাগরের জননী ছিলেন মূর্তিমতী করুণা, হয়তো জননীর সেই হৃদয়ের রসধারা মাতৃস্তন্যসুধা রূপে পেয়েছিলেন তিনি। গাঁয়ের আবালবৃদ্ধবনিতার দুঃখ দেখে তাঁর মায়ের চোখ সজল হতো— বিদ্যাসাগর হয়তো মায়ের সেই সিক্ত চোখ থেকেই নিজের অশ্রুর প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। আর ছেলেবেলার খেলার সঙ্গিনীর অকালবৈধব্যের মর্মান্তিকতা যদি তাঁর অন্তরে কান্না হয়ে বেজে থাকে, তাঁকে বিধবা বিবাহের আন্দোলনের জন্য প্রেরণা জুগিয়ে থাকে, তবে বিদ্যাসাগরের করুণাধর্মের আরেকটি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। নারীর চোখের জল যুগে যুগে কত পুরুষকেই তো বড়ো কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে—সুরোর বেদনার্ত মুখ যদি বিদ্যা-সাগরের সর্বব্যাপী মহত্ত্বের উৎস মুক্ত করে থাকে, তবে বুঝতে হবে, বিদ্যাসাগর দেবতা নন, একজন প্রবৃত্তিময় সত্যিকারের মানুষ। তৃতীয়তঃ যে নিদারুণ দারিদ্র্য নিয়ে তিনি প্রথম জীবনে ঘরকন্না করেছিলেন, তা-ই বোধহয় অন্যের দুঃখ তাঁক চিনিয়ে দিয়েছিলো। পরবর্তীকালে আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিনেও হয়তো তিনি সেই বাল্যে-চেনা সঙ্গীকে—দুঃখ-দারিদ্র্যকে—ভুলতে পারেন নি। হয়তো থেকে থেকে শিরার রক্তে উতরোল তিনি শুনতে পেতেন—কিসের ব্যথায় হয়তো তাঁর বুক টন টন করে উঠতো। এইভাবে তাঁর জীবনে জমা হলো হৃদয়ের অজস্র সঞ্চয়—মানবপ্রেম। সেই প্রেমই একদিন তাঁকে টেনে আনলো সেই বিধবাবিবাহের আন্দোলনের ক্ষেত্রে—যে ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল অনেক দিন ধরে রামমোহনের আত্মীয় সভায়, ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক এসো-সিয়েসনে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধে। দেশের আকাশে বাতাসে যা ছড়ানো ছিলো, সমাজচেতনায় ধীরে ধীরে যা জাগছিলো, বিদ্যাসাগর যুগের দাবিতে ও অন্তরস্থ মানব-প্রেমের তাগিদে তারই সাধনায় রত হলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের সত্তায় হিউম্যানিজ্‌ম্‌ ও হিউম্যানিটারিয়ানিজ্‌মের গঙ্গাযমুনা মিলন ঘটেছিলো। রামমোহনে শুধু ছিলো হিউম্যানিজ্‌ম্‌, একথা মনে রাখলে উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্য নির্ধারণ করা সহজ হবে। তাই তো স্নেহে সেবায় করুণায়, বলিষ্ঠতায়. স্বাতন্ত্র্যে দার্ঢ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন একটি বিপুল ব্যক্তিত্ব, একটি মহৎ আত্মা, একটি গোটা মানুষ। এই ব্যক্তিত্বকে, আত্মাকে, মানুষটিকে সক্রিয় ও গতিশীল করে রেখেছিলো তাঁর অজেয় পৌরুষ। এই পৌরুষের অভাবে অনেক চরিত্র নির্জীব বলে মনে হয়, কালের সংঘাত সহ্য করতে পারেনা বলেই অনেকের মহত্ত্ব মধ্যযুগীয় রূপ গ্রহণেই সন্তুষ্ট থাকে। বহমান কালের সঙ্গে চলতে চলতে বিদ্যাসাগরের পৌরুষ dynamic quality লাভ করেছে, সেই dynamic পৌরুষ তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্বকে সজীব করে রাখতে পেরেছিলো, তাঁকে নিত্য নতুন কর্মে ধ্যানে জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলো।

এই তো আঠারো শ' ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের মোটামুটি পরিচয়। এবং মানুষটিকে চেনার পক্ষে এই পরিচয়ই যথেষ্ট। এর পরে আটান্নোয় শিক্ষাবিভাগের নবীন অধিকর্তার সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। 'বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে (মেট্রোপলিটান. ইনষ্টিটিউসান) একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীন দরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, বন্ধু বান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত-বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্‌ আদর্শ বাঙালিজাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।' আমরা বিদ্যাসাগর-জীবনের এই শেষ পর্বটিকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করতে চাইনে, কারণ তা প্রথম পর্বেরই সার্থকতর

অনুবৃত্তি মাত্র—বিদ্যাসাগরের চরিত্র-ব্যাখ্যার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন নূতন উপাদান তাতে নেই।

পরিশেষে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধেয় উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—'তিনি তাঁর যুগের ব্যতিক্রম নন, বরং সেই যুগেরই এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।| তাঁকে সাধারণতঃ দেখা হয় বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট লেখক আর একজন অসামান্য দাতা ও তেজস্বী পুরুষ রূপে। তাঁর এই সর্বজনগ্রাহ্য পরিচয় অসার্থক নয় আদৌ। তবু তাঁর মনের যে বিশেষ গঠন তার পরিচয় নেবারও প্রয়োজন আছে। তত্ত্ববোধিনী সভায় ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। মহর্ষি ভগবৎ-ভক্তির দিকে আর আর অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদের দিকে বেশি ঝুঁকতে থাকেন। সেই স্মরণীয় বিরোধে বিদ্যাসাগর ছিলেন অক্ষয়কুমারের পক্ষে।...বিদ্যাসাগর যে-যুগের সন্তান সেই যুগে—অর্থাৎ ডিরোজিয়ো-পন্থীদের যুগে—যুক্তিবাদের সঙ্গে চারিত্রিক পৌরুষের এমন শুভযোগ ব্যাপক হয়েছিল—ডিরোজিয়ো-পন্থীদের অনেকেরই চরিত্রে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। |মনের গঠনের দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণভাবে তাঁর যুগের সন্তান, একটু ভাবলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়—শুধু পোষাকে পরিচ্ছদে তিনি স্বতন্ত্র—সেই পোষাক যে তাঁর সত্যকার পরিচয় নেবার পথে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি করেছে মিথ্যা নয়। এই যুগের প্রবল যুক্তিবাদের প্রভাব এই যুগের প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য বাঙালীর উপরে পড়েছে।'|

॥ দুই ॥

|যুগ-পুরুষ বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের বিচারে, বাঙলা গদ্যের প্রথম শিল্পী।| শিল্পীর সাধনা দ্বিধাবিভক্ত—ভাবসাধনা ও রূপ-সাধনা। একই প্রযত্নে এই দুই সাধনার সার্থকতা—একেনৈব

প্রযত্নেন নির্বর্ত্যন্তে মহাকবেঃ—একথা জানি; তবু বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে বিচারটা পৃথক ভাবেই হওয়া উচিত। কারণ তিনি বঙ্কিমের মতো মৌলিক রসস্রষ্টা নন, আন্তরিক সৃজনধর্মের প্রেরণায় সাহিত্য-সাধনা করেন নি। যে বিদ্যাজীবী হিউম্যানিষ্ট হিসেবে বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' ও 'বোধোদয়' লিখেছেন, সেই হিসেবেই 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' ও 'বেতালপঞ্চবিংশতি' লিখেছেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের পাঠার্থে রচিত এবং 'এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত' হয়। শকুন্তলা ও সীতার বনবাসও দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ছিলো এবং সেই কারণেই তাদের জনপ্রিয়তা। অথচ 'মহাভারত' ও 'ভ্রান্তিবিলাস' ছাত্রদের পাঠার্থে গৃহীত হয়নি বলেই অজনপ্রিয়। সুতরাং মৌলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পৃথগ্ব্যপদেশানর্হ' (রস ও রূপ পৃথক ভাবে নির্দেশের অযোগ্য) নীতি গ্রাহ্য হলেও বিদ্যাসাগরের রচনার বিচারে নয়।

আর বিদ্যাসাগরের রচনার ভাবানুষঙ্গের বিস্তৃত বিচারের প্রয়োজনই বা কি? তা শেষ পর্যন্ত মূল গ্রন্থগুলির বিশ্লেষণে পরিণত হবে। তবে অনুবাদের গ্রন্থ নির্বাচনে তাঁর মানসপ্রবণতার পরিচয় পাই। বিদ্যাসাগরের হিউম্যানিটারিয়ান্ কর্মধারায় যে হৃদয়ের সজল স্বাক্ষর, সেই করুণাঘন হৃদয়ের দাবিতেই তাঁর লেখার বিষয় নির্বাচন। কিন্তু 'ভ্রান্তি প্রহসনের' হাস্যরস ও আত্মচরিতের এঁড়ে বাছুরের কাহিনী মনে রাখলে আরও কিছু বলতে হয়। আসল কথা, রসপ্রাণতা বিদ্যাসাগরের আন্তর জীবনের সত্য পরিচয়—সে পরিচয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারুণ্যে মেঘমেদুর, কখনও বা স্নিগ্ধ হাস্যে আলোকোজ্জ্বল। রামমোহনের মনন-ধৃতির সঙ্গে বিদ্যা-সাগরের রস-রুচির এইখানেই পার্থক্য এবং সেই পার্থক্যের কারণেই বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-কৃতির আপেক্ষিক উৎকর্ষ।

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থগুলির 'বিজ্ঞাপন' (ভূমিকা) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়ঃ

(১) রচনাকে সহৃদয় পাঠকের কাছে প্রীতিপ্রদ ও গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা তিনি করতেন।

(২) ভাষার দুরূহতা, অসংলগ্নতা ও অশ্লীলতা দূরীকরণে তিনি সচেতন ও সচেষ্ট ছিলেন।

(৩) অর্থবোধ ও তাৎপর্য-গ্রহণে পাঠকের যাতে সুবিধা হয় সেদিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন।

(৪) মূলের উৎকর্ষ ও চমৎকারিত্ব যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না।

(৫) মূলের সঙ্গে বিষয়গত ঐক্য রক্ষা করতে তিনি অভিলাষী ছিলেন—কখনও বা মূলের আক্ষরিক অনুবাদ করতেই চেয়েছেন।

(৬) ক্ষেত্রবিশেষে মূল গ্রন্থের নামধাম পরিহার করা ও তার বদলে দিশি নামধাম গ্রহণ করে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিলেন।

এই সূত্রগুলিতে বিদ্যাসাগরের শিল্প-সচেতনতার প্রমাণ আছে। ভাষার বিশুদ্ধি ছিলো তাঁর অনন্য লক্ষ্য। পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রণের সময় তিনি ভাষাকে মেজে ঘষে সুষ্ঠু রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতেন, নতুন নতুন সংস্করণের সুযোগেও ভাষার পরিমার্জন করতে দ্বিধা করতেন না। বিদ্যাসাগরের এই পরিবর্তনমুখী মনোবৃত্তি তাঁর ভাষাসংক্রান্ত প্রগতিশীলতার ও শিল্পানুরাগের পরিচায়ক। আচার্য সুনীতি কুমার বেতালপঞ্চবিংশতির বিভিন্ন সংস্করণের একই অংশ উদ্ধৃত করে তা সুন্দর ভাবে প্রমাণ করেছেন।

'কিন্তু আমি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি। যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে দীর্ঘজীবী হইয়া নিরুদ্বেগে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি বিস্মিত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যক্ষও ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তি পরিহার পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধন করিয়া অভিপ্রেত উপাখ্যানের উপক্রম করিল।'

—১ম সংস্করণ, ১৮৪৭, পৃঃ ৫-৬।

'কিন্তু আমি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি। যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলে দীর্ঘজীবী হইয়া নিরুদ্বেগে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি বিস্মিত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যক্ষও ক্ষণমধ্যে সমরশ্রান্তি পরিহার করিয়া বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া অভিপ্রেত উপাখ্যানের উপক্রম করিল।'

—৭ম সংস্করণ, ১৮৫৮, পৃঃ ৬।

'কিন্তু, আমি তোমায় আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি, এজন্য এরূপ বলিতেছি। যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তদনুযায়ী কার্য করিলে, দীর্ঘজীবী হইবে, এবং নিরুদ্বেগে, অখণ্ড ভূমণ্ডলে, একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি, অতিশয় বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া, যক্ষের বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হইলেন। যক্ষও, ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তিপরিহার পূর্ব্বক, বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া, তদীয় জীবন সংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে আরম্ভ করিল।'

—বিদ্যাসাগর-গ্রন্থবলী, দশম সংস্করণ, পৃঃ ১২।

বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে প্রকাশিত দশম সংস্করণের ভাষা অন্যান্য সংস্করণের ভাষা থেকে সহজ ও সুগম, একথা বলবো না। 'সমরশ্রান্তিপরিহারপূর্ব্বক' শব্দটি দৈর্ঘ্যে রীতিমতো ভীতিজনক এবং ওজনেও গুরুভার; 'ব্যগ্রচিত্ত'-এর বদলে 'উৎকণ্ঠিত'-এর ব্যবহার সন্তোষজনক, সন্দেহ নেই, তবু তার ওপর অতিরিক্ত তাৎপর্য আরোপ করার অর্থ হয় না। কিন্তু তিনটি অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, লেখক নিজের বক্তব্য গুছিয়ে প্রকাশের জন্য ও ভাষায় ছন্দঃস্পন্দ ফুটিয়ে তোলার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন। দশম সংস্করণে ইংরেজীর অনুকরণে ছেদ-যতির ব্যবহার সংখ্যায় অতিরিক্ত মনে হয়, বাঙলার স্বরূপ ও মূল প্রবৃত্তির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তাদের এমনভাবে বিরামস্থল ধরিয়ে দেওয়া কোন প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু বাঙলা গদ্যের সেই অস্ফুট কালের

অনভ্যস্ত পাঠকদের অন্বয়পদ্ধতি ও পাঠরীতি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই প্রতিটি বাক্যাংশকে ছেদ চিহ্নের দ্বারা পৃথক করার এই প্রয়াস। এবং সাধু প্রয়াস।

আসল কথা, | বাঙলা ভাষার ধাতু-প্রকৃতি আবিষ্কারে বিদ্যাসাগরের নিরিখ ছিলো নিয়ত নির্নিমেষ। তার রূপগত (morphological) ও ধ্বনিগত (phonological) প্রসাধনে তিনি ছিলেন কলাচতুর। ধ্বনির সৌষ্ঠব নির্ভর করে ধ্বনি-জ্ঞানের ওপর, সেই জ্ঞান বিদ্যাসাগর অর্জন করেছেন ধীরে ধীরে ।| বেতালপঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণে উপচ্ছেদের (subsidiary sense-pause) চিহ্নমাত্র ছিলো না, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে উপচ্ছেদের প্রাচুর্য লেখকের ক্রম-ধ্বনি-সচেতনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনুমান করা অসঙ্গত নয়, সুবিন্যস্ত ইংরেজী গদ্যের সঙ্গে পরিচয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অঙ্গ-সংস্থান, পূর্ণাবয়ব-গঠন ও কলাসম্মত সৌন্দর্য-বিধানে বিদ্যাসাগর অধিকতর তৎপর হন। একটা উদাহরণ লওয়া যাক:

যে ব্যক্তি দিবাভাগে | অথবা রাত্রিকালে | অসিত, আর্ত্তিমান, ও সুনীথকে | স্মরণ করিবে, | তাহার | সর্পভয় থাকিবে না। || হে মহাভাগ নাগগণ। | যে মহাযশস্বী মহাপুরুষ | মহর্ষি জরৎকারুর ঔরসে | নাগভগিনী জরৎকারুর গর্ভে | জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, | এবং যিনি | জনমেজয়ের সর্পসত্রে | তোমাদের রক্ষা করিয়াছেন, | আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি ; | অতএব তোমাদের | আমাকে হিংসা করা | উচিত নহে। ||

—মহাভারত, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী।

এখানে ছেদ (sense-pause) ও যতি (breath-pause) যেমন একত্র বসেছে, তেমনি যতির ছেদ-নিরপেক্ষ সংস্থানও হয়েছে। মনে রাখতে হবে, গদ্যপদ্যের ছন্দ যতির ওপরই নির্ভরশীল, শ্বাসপর্বের (breath-group) পারস্পরিক সামঞ্জস্য ও সাপেক্ষতাই সুতান্বিত ছন্দের জন্ম দেয়—তবে যেখানে ছেদ ও যতির মিলন ঘটে, সেখানে

ধ্বনি-সৌন্দর্যের দিক থেকে সোনায় সোহাগা। বর্তমান উদাহরণেও অনেক স্থলে ছেদ ও যতির মিলিত অস্তিত্বে ঈপ্সিত লয়ের সৃষ্টি। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক বাক্য এমন সুচিহ্নিত শ্বাস-পর্বে বিভক্ত, যাতে সমগ্র বাক্যের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পড়বার সময় জিহ্বা কোথায়ও হোঁচট না খায়। প্রথম বাক্যে ক্ষুদ্রতম পর্ব 'তাহার', কিন্তু এর আগের ও পরের পর্ব দুটি প্রায়-সম-দীর্ঘ (এবং সমভারও বটে) বলে বাক্যটির জোর এই ক্ষুদ্রতম পর্বে কমে যায়নি। দ্বিতীয় বাক্যের 'এবং যিনি' পর্বটি সম্বন্ধেও একথাই খাটে। এমনি করে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বিদ্যাসগরের রচনার ছন্দোময়তা ও সুবলয়িত তানের সুষমা ধরা পড়ে।

তাই রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত ঃ-|-'তিনি সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।...তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।...বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।...বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।'|

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি প্রমাণসিদ্ধ ; শুধু দুটি শব্দ পুনর্বিচারের অপেক্ষা রাখে। বিদ্যাসাগরের ভাষা সত্যিই 'কার্যকুশল' ও 'সর্ব-প্রকারব্যবহারযোগ্য' কি ? আজকের দিনে আমাদের প্রাণ-প্রবৃত্তি ও মনন-শক্তি সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর, অনুভব ও গভীরতায় তা

অতলান্ত—তাই বিদ্যাসাগরের ভাষার কার্যকুশলতা বা সর্বব্যবহার্যতা অ-তর্কিত নয়। কিন্তু তাঁর বিষয়-সমাধির আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো, ভাবের প্রয়োজনানুসারে তাঁর ভাষার বিন্যাস—কখনও তার অঙ্গ-সঙ্কোচন, কখনও বা অঙ্গ-বিস্তৃতি ; স্থানে কিছুটা আটপৌরে, স্থানে পোষাকী। এতে বিদ্যাসাগরী ভাষা তখনকার মতো কার্যকুশল ও সর্বব্যবহার্য হয়ে উঠেছিলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল' ইত্যাদি বেনামী রচনা পড়ে মনে হয়, অধিকতর নিত্যব্যবহার্য ভাষা রচনার প্রতিভা তাঁর ছিলো ; প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও স্মিতহাস্যের ছোঁয়াচে তিনি ভাষাকে আরও বেশি অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ, সহজ ও স্বাভাবিক করতে জানতেন। কিন্তু তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ক্লাসিক্যাল শিক্ষা ও মূল গ্রন্থের ভাষা হয়তো তাঁকে অন্তরঙ্গ ও সহজ স্বচ্ছন্দ ভাষার অনুশীলন ও অন্বেষণ করতে দেয়নি। অস্বীকার করার উপায় নেই, বিদ্যাসাগরের স্বনাম-চিহ্নিত রচনার ভাষা বাক্যগত ভারসাম্যসাধন, ছেদ-যতির প্রচুর ব্যবহার, অন্তর্নিহিত ধ্বনি-সামঞ্জস্য-স্থাপন, সুষম পদ-সংস্থান-নীতি অনুসরণ, সাবলীল গতিচ্ছন্দ রক্ষা, বিশুদ্ধ ও ওজস্বী শব্দপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে একটা গভীর মর্যাদা, বনেদী কৌলীন্য ও সংযত সুন্দর ক্লাসিক রূপ লাভ করেছে—তথাপি প্রাণ-স্পন্দন ও অন্তরঙ্গ ব্যঞ্জনার অভাবের জন্য তা পণ্ডিতী ভাষার আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বেনামী লেখা থেকে মনে হয়, সেই আকাঙ্ক্ষিত দিগন্ত বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাত ছিলো না। যদি সর্বত্র বেনামী রচনার শিল্পাদর্শ অনুসরণের প্রকাশ্য দুঃসাহস দেখাতে পারতেন, তবে হয়তো আজকের পাঠকের পক্ষেও তৃপ্তিকর, কার্যকুশল ও সর্বব্যবহার্য ভাষা আমরা তাঁর কাছে পেতাম।

বিদ্যাসাগরের বিষয়-সমাধি ও তার ভাষাগত ফলশ্রুতি উল্লেখ করার মতো।। বিষয়ের সঙ্গে একাত্মকতা সাহিত্যিক সিদ্ধির চাবি-কাঠি—তার জন্য প্রয়োজন হলে ভাষার অঙ্গে অত্যাচারও করা হয়। ইংরেজী গদ্য থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করতে চাই।

'Can't hear with the waters of. The chittering waters of. Flittering bats, fieldmice bawk talk. Ho! Are you not gone ahome? What Thom Malone? Can't hear the bawk of bats, all thim liffeying waters of. Ho, talk save us! My foos won't moos. I feel as old as yonder elm. A tale told of Shaun or Shem. All Livia's daughtersons. Dark hawks near us. Night! Night! My ho head halls. I feel as heavy as yonder stone. Tell me of John or Shaun?'

জেম্‌স্‌ জয়েসের এই অনুচ্ছেদে কতকগুলি বিশৃঙ্খল ধ্বনিপিণ্ড আছে। এই ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলা (farrago) সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঘুম ঘুম আবহাওয়া ফুটিয়ে তোলা। ডাব্‌লিনের কাছে Liffey নদীতে কয়েকজন ধোপানী কাপড় কাচতে কাচতে গল্প করছে। কিন্তু রাত্রিচর প্রাণীর রণন ঝনন আর নদীর কলগান তাদের চোখে ঘনিয়ে এনেছে ঘুমের আবেশ। নিদ্রালু আচ্ছন্নতায় মেয়েদের মুখে কথা জড়িয়ে গেলো—'home alone' উচ্চারিত হলো 'Thom Malone', 'my foot won't move' ধ্বনিত হলো 'my foos won't moos'; রসনার আড়ষ্টতায় Liffey-র বদলে Livia. John ও James-র বদলে Shaun ও Shem শোনা গেলো। এতে ভাষার দেহে ব্যভিচার হলো নিশ্চয়ই, কিন্তু লেখকের ঈপ্সিত ব্যঞ্জনার কম্‌তি ঘটলো না। তাই একজন সমালোচকের মন্তব্য: 'A reader who finds this merely ingenious misses its beauty: just as the language seems to dissolve into drowsy incoherence, so the speaker (or speakers), under the influence of sleep and weariness, seem to melt into the very earth and roots of the riverside scene.'

জয়েসের রচনার একটা বিশিষ্টতা এখানে আভাষিত, সেটা তাঁর বিষয়বোধ—বিষয়বোধে প্রবুদ্ধি বা বিষয়ে একান্ত সমাধি। ভাবসত্তার অনুষঙ্গে বা বিষয়ের অনুরাগে জয়েস্ এখানে অন্তর্মুখী —শিল্পের রূপে ও বস্তুতে আশ্চর্য নিলীন।

এই বিষয়-সমাধি বিদ্যাসাগরের রচনারও স্বভাব-গৌরব। তাঁর ভাষাবিভঙ্গে ভাববস্তুরই অনুক্রম দেখতে পাই। শুধু শব্দ সজ্জা, অন্বয়শৃঙ্খলা ও বাক্যনির্মাণের খণ্ডাংশে নয়, ভাষার রূপাবয়বের সামগ্রিকতায় বিষয়শ্রদ্ধা স্বতঃস্ফুট বলেই তাঁর লেখার ব্যক্তনিষ্ঠ স্টাইলের একটা নৈর্ব্যক্তিক রস-পরিণতি ঘটেছে। যে বিষয় যেমনভাবে লেখা উচিত, সেই বিষয় তেমনিভাবে লেখা হলে তা আমার, আপনার ও সকলের হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যাসাগরের লেখা এই বিশিষ্ট সিদ্ধির স্বাদু উদাহরণ। যে ভাষারীতি সীতার বনবাসে, শকুন্তলার ভাষারীতি তা থেকে পৃথক—আত্মচরিতের ভাষারীতি প্রায় যোজন-দূরে। এ থেকে শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষার ক্রম-পরিণতি বোঝা যায় না, বিষয়ভেদে ভাষাভেদের তাৎপর্যও বোঝা যায়। মূলের ভাষাপদ্ধতি অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে, সন্দেহ নেই, তবু তাতেও বিষয়বোধ ও ভাষাবোধের সাক্ষ্য আছে। ধরা যাক—

(১) তখন রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বদন-সুধাকর সন্দর্শনেই, আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে, আর এরূপ ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই ; বিশেষতঃ, তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুসুম অপেক্ষাও সুকুমার, কোনও ক্রমে তাল বৃন্তধারণের যোগ্য নহে ; আমার হস্তে দাও ; আমি তোমার সেবা দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করি।

—বেতালপঞ্চবিংশতি।

(২) বৃদ্ধা কহিল, আমার পুত্র রাজসংসারের কর্ম করে, রাজার অতি প্রিয় পাত্র। আর, পদ্মাবতী নামে রাজার এক কন্যা আছেন, আমি তাঁহার ধাত্রী ছিলাম। এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছি, গৃহে

থাকি; রাজা অনুগ্রহ করিয়া অন্নবস্ত্র দেন। আর, রাজকন্যা আমায় ভালবাসেন; এজন্য, প্রতিদিন এক একবার, তাঁহাকে দেখিতে পাই।

—বেতালপঞ্চবিংশতি।

উদাহরণ দু'টির ভাষারীতি এক নয়। প্রথম দৃষ্টান্তের বিষয় যৌবনের প্রেম—আর তাই রূপক-ব্যতিরেক ইত্যাদি অলঙ্কারের সৌন্দর্যরস লেখকের মনে ঘনিয়ে এসেছে। সংস্কৃত কাব্যের প্রেম-বর্ণনার সংস্কারও এখানে ভাষাপ্রবৃত্তির মূলে সঞ্জীবিত। তাছাড়া রাজকুমার অভিজাত—তার মুখে উচ্চকোটির ভাষা-যোজনা সঙ্গত ও স্বাভাবিক। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের বৃদ্ধা অভিজাত বা শিক্ষিত নয়; তার আটপৌরে জীবনের বক্তব্যে তাই ঘরোয়া সুর—নিরাভরণ ভাষায় সাদাসিধে মনের সহজ আন্তরিকতার ছোঁয়াচ—কন্যোপমার প্রতি মাতৃসমার স্নেহের প্রকাশে স্বভাবতঃই পোষাকী আড়ম্বর অনুপস্থিত। বিদ্যাসাগরের বিষয়সমাধি ও ভাষাবোধের এর চেয়ে স্পষ্টতর দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? 'শকুন্তলা' থেকে আরও তিনটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে—

(১) 'মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কোথাকার পত্র, পত্র পড়িয়া এত বিষণ্ণ হইলে কেন? রাজা কহিলেন, বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক সাংযাত্রিক সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত আমাত্য আমায় তদীয় সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছে। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়! নামলোপ হইল, বংশলোপ হইল, এবং বহু যত্নে বহু কষ্টে বহুকালে উপার্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, আমার লোকান্তর হইলে, আমারও নাম, বংশ, ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।'

—শকুন্তলা।

(২) 'রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে প্রবলবেগে জলধারা বহিতে লাগিল; বাকশক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও, অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস্ কেন? তখন শকুন্তলা গদগদবচনে কহিলেন, বাছা, ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।'

—শকুন্তলা।

(৩) 'শকুন্তলা কহিলেন, সখি! যে অবধি আমি সেই রাজর্ষিকে নয়নগোচর করিয়াছি—এই মাত্র কহিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে কহিতে লাগিলেন, সখি! বল, বল, আমাদের লজ্জা কি? শকুন্তলা কহিলেন, সেই অবধি তাঁহাতে অনুরাগিনী হইয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া, তিনি বিষন্ন বদনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।'

—শকুন্তলা।

লেখকের হৃদয়-রসে জারিত এই তিনটি অনুচ্ছেদে একটা বেদনাভর অনুভূতির জলতরঙ্গ বেজে উঠেছে। এই মৌলিক ঐক্য সত্ত্বেও তিনটি ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম শ্রুতির—তা-ই বলি কেন—সুস্পষ্ট রসধ্বনিরই স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায়। প্রথম উদাহরণে সন্তান-সম্ভবা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের অনুষঙ্গে সন্তানহীনের খেদ অনুরণিত। দ্বিতীয় উদাহরণে অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলনের ক্ষণে বিস্ময়, আনন্দ ও অনুতাপের বিচিত্র মিশ্র স্বাদ আছে। সুরত-প্রদীপের কাঞ্চন-শিখার লজ্জারক্তিম শিহরণ তৃতীয় উদাহরণে

বিভাবিত। সুতরাং অনুভূতির নানা নিগূঢ়ছন্দে অনুচ্ছেদত্রয়ের বিভিন্ন ফলশ্রুতি। এর মূলে আছে বিদ্যাসাগরের পৃথক পৃথক বিষয়ের সান্নিধ্যে মানসিক অনুভবের প্রাতিস্বিকতা এবং প্রত্যেক বিষয়ে গভীর আত্মলীনতা।

ধনমিত্রের প্রসঙ্গে দুষ্মন্তের অন্তঃস্পন্দন নানা মাপের বাক্যে ধ্বনিত। মধ্যিখানের ছোট্ট বাক্যটি যেন বেদনার কেন্দ্রবিন্দু ('সে ব্যক্তি নিঃসন্তান') আর তারই চারপাশে দুঃখের আবর্ত ক্রম-দীর্ঘ রূপ নিতে নিতে আত্মশোচনার দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘতম বাক্যবৃত্ত রচনা করেছে। 'নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়'—এ-বাক্যে শব্দ-সজ্জার চটক নেই, নতুন শব্দ বাজিয়ে নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়াস নেই—অথচ এর আবেদন পাঠকের মনে চারিয়ে যায়। সার কথা, |বিদ্যাসাগর তাঁর বিষয়-ভাবনায় সমাধিস্থ হতেন বলেই তাঁর সিদ্ধি ঘটতো এমন তর্কাতীত। অবশ্য তার জন্য জেমস্ জয়েসের মতো ভাষার অঙ্গে অত্যাচার করার দরকার হয়নি বিদ্যাসাগরের।)

দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম দুটি বাক্য রুদ্ধশ্বাস ঝড়ের রূপক স্মরণ করিয়ে দেয়। বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে দেখে বিস্ময়াপন্ন দুষ্মন্তের মানসিক আলোড়ন যেন উত্তুরে হাওয়ার বিপরীত দিগন্তপ্রসারী বিস্তার, আর দুষ্মন্ত-দর্শনে শকুন্তলার প্রতিক্রিয়া দখিনা হাওয়ার আদিগন্ত উত্তরায়ণ। তাই বাক্যগুলিরও অপরিহার্য দীর্ঘতা। তারপর পুত্রের প্রশ্নে শকুন্তলার বিক্ষিপ্ত মনের আকাশ থেকে শুরু হলো অপেক্ষাকৃত ছোট বাক্যের বৃষ্টিফোঁটা। সুতরাং নায়ক-নায়িকার আবেগের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিদ্যাসাগর যোজনা করেছেন বাক্যধারা। এ সিদ্ধিও লেখকের বিষয়মগ্নতা থেকে উৎসারিত।

বিদ্যাসাগরের রসিকচিত্তের শিল্প-স্বাক্ষরে তৃতীয় উদাহরণটি উজ্জ্বল। শকুন্তলার উক্তি অসম্পূর্ণ রেখেই তার লজ্জার ব্যঞ্জনাটুকু সম্পূর্ণ করে তুলেছেন লেখক। নায়িকার ব্রীড়াবনত কান্নাসুন্দর মুখখানি নিঃসন্দেহে পাঠকের মন টেনে নেয়। বাক্যদুটির মধ্যে

শকুন্তলার অনুভবের যে ললিত লাবণ্য ছড়িয়ে পড়েছে কলমের যাদুতে—বিদ্যাসাগরের সঙ্গত 'emotional attitude to his subject'-ই তার কারণ।

বিদ্যাসাগরের যুগে ভাষার স্টাইল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় আসেনি; আজকের দিনের মতো ভাষার রূপ (accepted usage) ভেঙ্গেচুরে—ব্যাকরণ, অন্বয়-রীতি, শব্দক্রম ও বাক্য-গড়নের ছাঁচকে বিপর্যস্ত করে এবং নতুন ঢঙে সাজিয়ে তার সম্ভাবিত সঙ্কেত-লক্ষণা ফুটিয়ে তোলার প্রশ্ন ওঠেনি। রামমোহনের রচনায় ভাষার যে যুক্তিদৃঢ় ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের প্রয়াস, বিদ্যাসাগরের রচনায় সেই শক্ত ভিত্তির ওপর গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিন্যস্ত করার কৃতিত্ব। কিন্তু তিনিও ভাষার ছন্দঃস্পন্দ অর্থ-পর্বের (sense-group) ক্রমসজ্জা ও বাক্যের সামগ্রিক সূত্র নির্ণয় করতে গিয়ে ছোট বাক্যে অন্তরের ভাব সংহত করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারেননি। বরং তাঁর ভাষারীতি যেন অনেকটা বিস্তারপ্রধান ও বিচিত্রাঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যাংশের সংখ্যা থেকে তার একটা ধারণা জন্মায়।

'সীতার ক্রন্দন শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সন্নিহিত ঋষিকুমারেরা শব্দ অনুসারে ক্রন্দন-স্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কামিনী, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া, অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। দেখিয়া, তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে যার পর নাই কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তাঁহারা, ত্বরিত গমনে বাল্মীকি সমীপে উপস্থিত হইয়া, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা, ফল কুসুম কুশ সমিধ আহরণের নিমিত্ত, ভাগীরথী সন্নিহিত অটবীবিভাগে পর্যটন করিতে-ছিলাম; অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম, এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, এক অলৌকিক রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণা কামিনী, নিতান্ত

অনাথার ন্যায়, একান্ত কাতরা হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন।'

—সীতার বনবাস।

এখানে তিনটি বাক্য আছে; দ্বিতীয়, প্রথম ও তৃতীয় বাক্য ক্রম-দীর্ঘ। অতি বিস্তারের জন্য তৃতীয় বাক্যে গাঠনিক শৈথিল্য আছে; ছেদের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বাক্যটিকে নানা অর্থ-পর্বে বিভক্ত করলেও সেই শৈথিল্য দূর হয়নি। আসল কথা, ফোর্ট উইলিয়ামী যুগ থেকে দীর্ঘ বাক্য রচনার যে রীতি প্রচলিত ছিলো, বিদ্যাসাগর যেন মেনে নিয়েছিলেন তারই শাসন। এছাড়া আর একটি কারণও ছিলো। বিদ্যাসাগরের অনেকগুলি লেখা সংস্কৃতের অনুবাদ বা অনুসরণ। সংস্কৃতে সমাসবদ্ধ পদে যে ভাব সংক্ষেপে ব্যক্ত, বাঙলায় তা অনেক সময় ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিস্তৃতভাবে বলতে হয়েছে। জটিল বিশেষণের তাৎপর্য প্রকাশনেও একাধিক বাঙলা শব্দের প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। ফলে 'The author is not one to compress his thought into short sentence ; on the contrary, his style is ample and repetitive.'

এ-প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। গদ্যের মূল প্রয়োজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে—তাই প্রাত্যহি-কতার স্থূল হস্তাবলেপে গদ্যের কায়া কম-বেশি রূঢ় ও কর্কশ। এই কেজো গদ্যকে অস্বীকার করে নয়, তাকে স্বীকার ও আত্মসাৎ করেই সাহিত্যিক গদ্যের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। এই নীতির ব্যতিক্রম বা ব্যভিচারে কমন্ স্পীচ্ থেকে সাহিত্যিক গদ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর সেটা গদ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তো বটেই, নিঃসন্দেহে মারাত্মকও। মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার পার্থক্য আছে অস্বীকার করিনে, কিন্তু সেই পার্থক্য সত্বেও লেখার ভাষাকে মুখের ভাষার ক্রম-পরিণতি (continuation) ও প্রকর্ষাত্মক রূপ (improvement) হতে হবে,—তাদের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক্ থাকলে চলবে না।

।কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্য ঠিক কেজো গদ্যের সাহিত্যসম্মত রূপ নয়। তখনকার কমন্ স্পীচ্ থেকে তার দূরত্বও প্রমেয়। আমার তো মনে হয়, অপেক্ষাকৃত জটিল ও নীরস হলেও রামমোহনের গদ্য বরং তৎকালীন কমন্ স্পীচের অনেকটা কাছাকাছি।*। আজকের দিনে প্রতি পদে পূর্বপক্ষকে স্মরণ করে অগ্রসর হওয়া বাঙলা গদ্যের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, কিন্তু রামমোহনের যুগে বিচিত্র বিচার ও বিতর্কমূলক গ্রন্থে যুক্তিধর্মী রূপ ও রীতি (argumentative form and style) গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক ছিলো। রামমোহনের এই যুক্তিধর্মী গদ্যের কালানুক্রমিক অনুসরণ (অধিগম্যতার দিক থেকে নয়, যুক্তিধর্মিতার দিক থেকে) অক্ষয় দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদির লেখায় আছে বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার আদর্শ ও লক্ষ্য ছিলো ভিন্নতর। রামমোহনের মূলসূত্র কমন্ স্পীচের প্রয়োজনমূলকতা (utilitarianism) ও শাস্ত্রের যুক্তিধর্মিতা (logical sequence), কিন্তু বিদ্যাসাগরের মূলসূত্র সংস্কৃত লিটারেরি স্পীচের রসপ্রাণতা ও সৌন্দর্যমুখিতা। ফলে বিদ্যা-সাগরের লেখায় বাঙলা গদ্য রসপ্রবণ হলো, কর্কশ রূপের বদলে বিশেষ কোমল রূপ পেলো ও সাহিত্যের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়ে উঠলো। আর তারই সুষ্ঠুতর পরিণতি দেখা গেলো বঙ্কিমের উপন্যাসে। কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটা মারাত্মক ফল দেখা না দিয়ে পারে নি। বিদ্যাসাগরের গদ্যের রসপ্রবণতার পরিণতি দেখি কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের গদ্যোচ্ছ্বাসে কিংবা বলেন্দ্রনাথের মতো লেখকদের কাব্যগন্ধী গদ্যে (রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। বড়ো প্রতিভার বড়ো সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হয়েও বলা যায়, এক সময়ে এই গদ্যোচ্ছ্বাস সৃষ্টি যেন শিক্ষিত লেখকদের রেওয়াজ

* 'প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গলা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন।'

—বঙ্কিমচন্দ্র।

হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই বাঙলা গদ্যের উচ্ছ্বাসপ্রবণতার দায়িত্ব বিদ্যাসাগরেরও আছে।

উদাহরণ ঃ

'কিয়ৎক্ষণ পরে, রাম, উচ্ছলিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ সংবরণ ও নয়নের অশ্রুধারা-মার্জ্জন করিয়া, সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক অনুজদিগকে সম্মুখ দেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবেশন করিয়া কাতর-ভাবে রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্রে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহারাও যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, লক্ষ্মণ, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়পূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্য! আপনার এই অবস্থা দেখিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোনও অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টসঙ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি কখনও অল্প কারণে আকুলিত হয় না; সামান্য বায়ুবেগের প্রভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব কি কারণে আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনকার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।'

—সীতার বনবাস।

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে নিম্নোক্ত করুণরসাত্মক ও উচ্ছ্বাসমূলক শব্দসমষ্টি আছে ঃ

(১) উচ্ছলিত শোকাবেগের

(২) নয়নের অশ্রুধারা

(৩) সস্নেহ সম্ভাষণ

(৪) কাতরভাবে

(৫) নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্রে

(৬) প্রবলবেগে বারিধারা বিগলিত

(৭) প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচিত

(৮) বিনয়পূর্ণ বচনে

(৯) ম্রিয়মাণ

(১০) আকুলিত হয়না

(১১) বিচলিত হইতে পারে না

(১২) কাতরভাবাপন্ন

(১৩) প্রাণরক্ষা করুন

(১৪) কমল অপেক্ষাও ম্লান

(১৫) শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ

(১৬) হৃদয় বিদীর্ণ

'সীতার বনবাসের' ভূমিকায় বিদ্যাসাগর যা-ই বলুন না কেন— 'ঈদৃশ করুণরসোদ্বোধক বিষয় যে রূপে সঙ্কলিত হওয়া উচিত' এই পুস্তকে সেরূপেই বিষয়টি সঙ্কলন করতে গিয়ে তিনি আবেগাত্মক শব্দসমষ্টি যোজনা করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্য ঘটিয়েছেন। এই বিদ্যাসাগরী নজিরেই হয়তো 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর' কালীপ্রসন্ন একদা লিখেছিলেন—

'রাজা-প্রজা, দাতা গ্রহীতা, অপকারী অপকৃত, নিন্দুক নিন্দিত পূজ্য পূজক, ভক্ষ্য ভক্ষক কেহই সেই অতুল স্নেহের সুখশয্যায় বঞ্চিত নহে। তাপহারিণী, দুঃখবারিণী, করুণাময়ী জননী, সকলকেই সমান আদরে বুকে লইয়া, সকলের দুঃখতাপ বিদূরিত করেন। যে দিনান্তে মুষ্টিভিক্ষাও আহরণ করিতে পারে নাই, তাহাকেও ক্রোড়ে লন, এবং যে অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী হইয়াও সমস্ত দিবসে এক মুষ্টি তণ্ডুল তুলিয়া ভিখারীকে দিতে সমর্থ হয় নাই তাহাকেও আশ্রয় দান করেন।'

—নিশীথ-চিন্তা।

এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের লেখাও এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঃ

'সজ্যোৎস্না রজনীতে হিমাদ্রিশিখর মালার উচ্চতম শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া, নীলোজ্জ্বল গগনবিহারী চন্দ্রদেবকে সাক্ষী করিয়া মনের সুখে প্রাণ ভরিয়া মুক্তকণ্ঠে একবার কাঁদিব। আমার সাধ যায়, একবার 'তরঙ্গিনী তরঙ্গিনী' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া, শব্দ তরঙ্গে ঐ কোমল নীল আকাশ ভাসাইব, শব্দ হিল্লোলে ঐ নক্ষত্রগণকে দোলাইব...।'

—পদবৃদ্ধি, মসলাবাঁধা কাগজ।

অনুবাদে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব এবার বিচার করা যাক্। সীতার বনবাসের 'প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক' থেকে গৃহীত। উত্তরচরিতের 'চিত্রদর্শন' নামক প্রথম অঙ্কে 'মিথিলাবৃত্তান্তের' বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করছি—

লক্ষ্মণঃ—এষ মিথিলাবৃত্তান্তঃ।

সীতা—অম্হহে, দলন্তণবণালুপ্পলসামলসিনিদ্ধমাসিণসোহমাণ মংসল দেহসোহগ্গেণ বিম্হঅত্থিমিজতাদদীসন্তসোম্ম-সুন্দরসিরী অণাদরখুডিদসংকরসরাসণো সিহণ্ডমুদ্ধমুহ-মণ্ডলো অজ্জউত্তো আলিহিদো।

[অহো দলন্নবনীলোৎপলশ্যামলস্নিগ্ধমসৃণশাভমানমাংসলদেহ-সৌভাগ্যেন বিস্ময়স্তিমিততাতদৃশ্যমানসৌম্যসুন্দরশ্রীঃ অনাদরত্রুটিত-শঙ্করশরাসনঃ শিখণ্ডমুগ্ধমুখমণ্ডল আর্য্যপুত্র আলিখিতঃ]

* * *

সীতা—এদে খু তক্কালকিদগোদাণমঙ্গলা চত্তারো ভাদরো। বিআহদিক্খিদা তুম্হে। অহো জাণামি, তস্মিং জেব্ব পদেসে তস্মিং জেব্ব কালে বসামি।

[এতে খলু তৎকালকৃতগোদানমঙ্গলাশ্চত্বারো ভ্রাতরঃ, বিবাহ-দীক্ষিতাযূয়ম্, অহো জানামি, তস্মিন্ এব প্রদেশে তস্মিন্ এব-কালে বসামি]

রামঃ—সময়ঃ স বর্ত্তত-ইবৈষ যত্র মাং

সমনন্দয়ৎ সুমুখি গৌতমার্পিতঃ।

অয়মাগৃহীতকমনীয়কঙ্কণ-

-স্তব মূর্ত্তিমানিব মহোৎসবঃ করঃ॥

লক্ষ্মণঃ—ইয়মার্য্যা, ইয়মপ্যার্য্যা মাণ্ডবী, ইয়মপি শ্রুতকীর্ত্তিঃ।

সীতা—বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা? [বৎস, ইয়মপরাঽপি কা]

লক্ষ্মণঃ—(সলজ্জাস্মিতম্। অপবার্য্য) অয়ে! উর্ম্মিলাং পৃচ্ছত্যার্য্যা। ভবতু, অন্যতঃ সঞ্চারয়ামি, (প্রকাশম্) আর্য্যে, দৃশ্যতাং দ্রষ্টব্যমেতৎ। অয়ং চ ভগবান্ ভার্গবঃ।

উদ্ধৃতাংশের সীতার প্রথম উক্তিটির নৃসিংহবাবুকৃত অনুবাদ—'আহা! আর্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্ল-প্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলস্নিগ্ধ কোমলশোভাবিশিষ্ট কি দেহ-সৌন্দর্য! কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভাঙিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন। আহা কি সুন্দর!'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ থেকেও প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি:

'লক্ষ্মণ।—এই দেখ আর্য্যে, মিথিলাবৃত্তান্ত এইখানে চিত্রিত হয়েছে।

সীতা।—ও মা, তাই তো। উনি যে সময় অবলীলাক্রমে হরধনুর্ভঙ্গ করেছিলেন, এ যে সেই সময়কার চিত্র দেখছি। নবপ্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মত কেমন শ্যামলবর্ণ—দেহটি কেমন সুন্দর, কোমল হৃষ্টপুষ্ট—আর, কাকপক্ষ থাকার দরুণ মুখের কেমন শোভা হয়েছে। আবার পিতা আর্য্যপুত্রের সৌম্য মুখশ্রী বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে একদৃষ্টে দেখছেন।

*　　　*　　　*

সীতা—এই তোমরা চার ভাই, গোদানাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধা

করে’ বিবাহে দীক্ষিত হয়েছ। কি আশ্চর্য্য! মনে হচ্ছে, যেন, সেই সময়ে ও সেই স্থানে এখনই আমি উপস্থিত।

রাম।— তাই বটে প্রিয়ে, মনে হতেছে আমার,
ফিরে যেন সে সময় আসিল আবার
যবে শতানন্দ ঋষি লয়ে পাণি তব
(কঙ্কণ-ভূষিত কিবা—সাক্ষাৎ উৎসব)
সঁপিলেন সযতনে আমার এ করে,
নিরখি প্রত্যক্ষ যেন এবে চিত্র পরে।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! এইটি তোমার ছবি—এইটি আর্য্যা মাণ্ডবীর আর এই বধূমাতা শ্রুতকীর্ত্তির।

সীতা—আচ্ছা লক্ষ্মণ, এটি কে বল দিকি ?

লক্ষ্মণ।—(সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া স্বগত) ও! উনি উর্ম্মিলার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন। এই বেলা চিত্রের অন্য অংশ এঁদের দেখাই। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে, আর একটি চিত্র দেখ—এটিও দ্রষ্টব্য। এই ভগবান্ ভার্গব পরশুরাম।

আর সমগ্র অংশটির বিদ্যাসাগরী অনুবাদ—‘লক্ষ্মণ বলিলেন, দেবি! এদিকে মিথিলাবৃত্তান্তে দৃষ্টিপাত করুন। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, তাই ত, ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলিত করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার, বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি; কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে। আবার এ দিকে বিবাহকালীন সভা; সেই সভায় তোমরা চারি ভাই, তৎকালোচিত বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, কেমন শোভা পাইতেছ। চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি। শুনিয়া, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ বলিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পিত করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, এই আর্য্যা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ উর্ম্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে উর্ম্মিলার দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এ দিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন, হরশরাসনের ভঙ্গবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন...'

—সীতার বনবাস।

নৃসিংহবাবুর অনুবাদের চেয়ে বিদ্যাসাগরের অনুবাদ জটিল ও নিকৃষ্ট নয়। দেহসৌন্দর্যের বিশেষণগুলি নৃসিংহবাবু বজায় রাখলেও, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাদের আধুনিক রীতিতে সরল করে নিলেও বিদ্যাসাগর তাদের সযত্নে পরিহার করেছেন। অথচ রামচন্দ্র সম্পর্কে সীতার শ্রদ্ধার কোন কমৃতি ঘটেনি। উর্মিলা-প্রসঙ্গে লক্ষ্মণের লজ্জার বর্ণনাও বিদ্যাসাগরের রসবোধের পরিচয় দেয়। নাটকে লক্ষ্মণের স্বগতোক্তি থেকে লজ্জার ভাব অভিব্যক্ত, কিন্তু 'সীতার বনবাসে' নিরুত্তর লক্ষ্মণের ঈষৎ হাসি থেকে সেই লজ্জা ব্যঞ্জিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো মূলের বিশ্বস্ত অনুসরণ না করে বিদ্যাসাগর নিজের মতো করে দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলায় আমরা খুশি হয়েছি। অবশ্য নাটকের গদ্যানুবাদে এই পরিবর্তনের সুযোগ ছিলো।

। বিদ্যাসাগরের ভাষার রসাকর্ষণের শক্তি অপরিমেয়। এবং তা সংস্কৃত রসকাব্যের চর্চার ফল। সমাজখণ্ডের লেখায় যুক্তিধর্মিতা অপেক্ষাকৃত বেশি, তবু তাতেও যেন সহৃদয় সংবেদনশীলতার ('হায় অবলাগণ' স্মরণীয়) ওপরই বেশি নির্ভরতা। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের গদ্যের চরিত্র সমানধর্মা নয়।।

কয়েকজন গদ্যলেখক

বুদ্ধিভিত্তিক বস্তুবাদ আমাদের উনিশ শতকী সাহিত্যকূটে একটা নতুন পতাকা। এবং তাতে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম প্রথম মুদ্রিত। বাঙলা সাহিত্যের অনাধুনিক ঐতিহ্যে বস্তুবাদ আছে—যেমন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, কিন্তু তাতে শুদ্ধবুদ্ধির কোন ছোঁয়াচ নেই, নেই বিচারপ্রবণ নিরাসক্ত নিরিখ। রাম-মোহনের শাস্ত্রীয় বিচারে যে বুদ্ধির ব্যায়াম-কৌশল (intellectual exercise), ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয়নি বলেই তার বাস্তবিক মূল্য বিশেষ নেই। অবশ্য সেই নতুন দিগন্তের খবর তিনি রাখতেন—তাই বেদান্তদর্শনের সূক্ষতার চেয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিকতা তাঁর শিক্ষাপ্রস্তাবে প্রাধান্য পেয়েছে। রামমোহন যা ভেবেছিলেন, যার জন্য ভূমিকর্ষণ করেছিলেন—অক্ষয়কুমার তারই অনুবর্তন করেছেন জীবনচর্যা ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় এবং সেখানেই তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য নিহিত।

অক্ষয়কুমারের জীবনী থেকে তাঁর মনের গড়ন ধরা যায়। শিশুকালেই যিনি 'আমি লিখবো, আমি লিখবো' বলে বায়না ধরেছিলেন, পুরো চৈতন্যোদয়ের আগেই যাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিলো—'পৃথিবীটার কালি কত ? ওটা কত বড় ?'—অবিরাম জিজ্ঞাসাই তাঁর মনোবীজ। তাঁর কপালে বুদ্ধির তিলক আবিষ্কার সংশ্লিষ্ট ফ্রেনলজিষ্টের কৃতিত্ব, সন্দেহ নেই ; কিন্তু কপালের মতো লেখার সাক্ষ্যও অক্ষয়কুমারের উজ্জ্বল বুদ্ধিবাদেরই নির্দেশ দিয়ে থাকে।

তখনকার দিনের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অক্ষয়কুমারের পড়াশুনোর শুরু বাঙলা, সংস্কৃত ও ফারসী দিয়ে। তারপর বছর নয়েক বয়সে তিনি দু'জন শিক্ষকের কাছে ইংরেজী পড়েন, একজন মিশনারীর কাছেও কিছুকাল ইংরেজী শেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা ঘটে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে। এখানে আড়াই বছরে ইংরেজী ও অর্বাচীন বিদ্যার সঙ্গে তাঁর অধিকতর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর বাইরে তাঁর স্বনির্বাচিত পাঠ-পরিধি ছিলো সুবিস্তৃত—জয়েসের 'সায়েন্টিফিক্ ডায়েলগ', ইউক্লিডের সমগ্র জ্যামিতি (জ্যামিতির প্রথম চার অধ্যায় ও সমগ্র পাটীগণিত বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করেছিলেন), বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কণিক্‌সেক্‌শন্ ও ডিফারেন্‌শিয়াল্ ক্যালকুলাস, জ্যোতিষ, যন্ত্রবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, নরকরোটীবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, শরীরবিদ্যা ইত্যাদি অনেক কিছুই অক্ষয়কুমারের অধ্যয়নের বিষয় ছিলো। সাহিত্যের চেয়ে বিজ্ঞানে তাঁর অনুরাগ ছিলো বেশি—তবু ইলিয়াড থেকে শুরু করে 'ইংরেজী সাহিত্য বিষয়েরও প্রধান প্রধান গ্রন্থ' তিনি পড়েছিলেন। আর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ছাত্রাবস্থাতেই গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন ও জার্মান ভাষাও হলো তাঁর অধিগত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—অন্নময় কোষ নয়, প্রাণময় কোষও নয়, মনোময় কোষই ছিলো তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড়ো ঠাঁই, গভীরতম সত্তা। সেই অন্তঃশীল অস্তিত্বের নিঃস্পৃহ বুদ্ধির তাগিদে ও অশেষ অনুসন্ধিৎসায় তিনি জ্ঞানতন্ত্রের সাধনায় রত ছিলেন—সেই ক্লান্তিহীন তপশ্চর্যায় জ্ঞানতীর্থে পৌঁছোতে চেয়েছিলেন। তাই সাহিত্যের রসসাধনায় নয়, বিজ্ঞানের নীরস সাধনায় অক্ষয়কুমার ছিলেন সমর্পিতপ্রাণ। এদিক থেকে দেখতে গেলে তিনি ছিলেন সেকালের সবচেয়ে বড়ো বৌদ্ধ, বিশুদ্ধতম আর্য, অর্বাচীন য়ুরোপীয়। অবশ্য তাঁর সামগ্রিক মনের গড়নে কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ ও মানবতাবাদ (Positivism & Humanism), মিলের হিতবাদ (Utilitaria-

nism) ও স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism) সন্ধান পাই।

পিতার অকাল মৃত্যু ও সাংসারিক অনটন অক্ষয়কুমারকে স্কুলে পড়াশুনো করতে দেয়নি—কিন্তু অভাবদৈত্য বিদ্যাচৈত্য থেকে তাঁকে বিতাড়িত করতে পারেনি, কারণ সেখানে তিনি ছিলেন সিদ্ধ-পুরুষ। তাই সেকালের রেওয়াজ অনুযায়ী তিনি কেরানী হলেন না, সওদাগরী হাউসের সরকার বা শিপসরকার হলেন না, ব্যবসায়ী হলেন না, উকিলও হলেন না—হলেন কিনা 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার' শিক্ষক', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সম্পাদক। মানুষটিকে চেনার পক্ষে এটুকু তথ্যই তো যথেষ্ট! ঈশ্বর গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় করিয়ে দেন—এতে দেবেন্দ্রনাথের উপকার হয়েছিলো, উপকার হয়েছিলো অক্ষয়কুমারের, বাঙলাদেশের সংস্কৃতির ও বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের। অশ্রদ্ধেয় কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের ঘৃণ্য দায় থেকে অক্ষয়কুমার মুক্তি পেয়ে গেলেন, জ্ঞান-ভূয়িষ্ঠ চিত্তের উপযুক্ত প্রকাশভূমির সন্ধান পেলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যক্রম অধিকতর প্রচারের জন্য, বিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তারের সঙ্কল্প নিয়ে এবং লোকের জ্ঞান-বৃদ্ধির শুভ দায়িত্ব অঙ্গীকার করে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। রামমোহনের প্রচারিত ধর্মের ক্ষীয়মাণ ধারায় বেগ সঞ্চারের কর্তব্য স্বয়ং ঈশ্বরপ্রেমী দেবেন্দ্রনাথ বরণ করে নিয়েছিলেন—কিন্তু লোক-হিতবাদ, য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবাদ ও যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানবাদ প্রচারের দায়িত্ব নিলেন অক্ষয়কুমার। তাই তাঁর অধিগত বিদ্যার চারণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। তাঁর পাঠ-পরিধিতে মনের যে গড়ন ও প্রবণতার পরিচয় পেয়েছি তার সোনার ফসল ফলাবার সুযোগ এলো তাঁর জীবনে। সেই পরীক্ষায়, সেই স্বধর্মের সৃজন-শীলতায় অক্ষয়কুমার পরাস্ত হন নি, একথা আজ জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে।।

তেতাল্লিশে অক্ষয়কুমার আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম হন, কিন্তু নিছক

ধর্মদর্শনে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো বলে মনে হয় না। রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচারের যুক্তিবাদ তাঁর মনোহরণ করেছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিকতায় অক্ষয়কুমারের আস্থা ও অনুরাগ দুর্নিরীক্ষ্য। ব্যক্তিগতভাবে রামমোহনের ভক্ত হয়েও তাঁর ধর্মদর্শন বা বেদান্তদর্শন নয়, তাঁর যুক্তিবাদকেই ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অক্ষয়কুমার অনুভব করেছিলেন। অল্প বয়সের খৃষ্টান ধর্মের প্রতি অনুরাগ, আর বার্ধক্যের নারায়ণের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের জনশ্রুতির কথা মনে রাখলে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর আসক্তি দৃঢ়মূল বলে মনে হয় না। প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করার মধ্যেও একই মনোভাবের পরিচয় আছে। এ-প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' গ্রন্থখানির সাক্ষ্যও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্ত্বের পরিবর্তনে তাঁর দানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। প্রথমে বেদান্ত ও তার পরে বেদকে আশ্রয় করে যে ব্রাহ্মধর্মের গোড়াপত্তন, তাতে অক্ষয়কুমারের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ দেবেন্দ্রনাথের মনেও সংশয় উপস্থিত না করে পারেনি, বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততায় তাঁকে অবিশ্বাসী করে তোলে। ফুল, চন্দন ও নৈবেদ্যের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনার রীতিও অক্ষয়কুমারের আন্দোলনের ফলে উঠে যায়। বাঙলা ভাষায় উপাসনা প্রবর্তনের কৃতিত্বও তাঁর। তবে তাঁর একটি বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত—'প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য করাই ধর্ম এবং না করাই অধর্ম'—এই মত ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হয়নি। সে যাই হোক, অক্ষয়কুমারের জ্ঞানায়ুধের নিরন্তর সংগ্রাম উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক অন্বেষণে একটা বিশিষ্ট অধ্যায়ের সূচনা করেছে এবং তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর ভাববিলাসের বিপরীত শক্তিবৃত্ত হিসেবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (১৮৪৩) দুই স্তম্ভ—একদিকে ব্রহ্ম-উপাসক ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথ, অন্যদিকে বুদ্ধিবাদী বিজ্ঞানসেবক অক্ষয়কুমার। একজন পরিচালক, অন্যজন সম্পাদক। 'অক্ষয়বাবুর

চেষ্টায় ইহাতে ধর্ম বিষয় ব্যতীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান পুরাতত্ত্বাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়।'। বিদ্যাসাগর রাজেন্দ্রলাল, রাজনারায়ণ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, আনন্দ বেদান্তবাগীশ, প্রসন্ন অধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের উক্তি এখানে স্মরণীয় 'People all over Bengal awaited every issue of that paper with eagerness, and the silently and sickly but indefatigably worker at his desk swayed for a number of years the thoughts and opinions of the thinking portion of the people of Bengal.' অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয়কুমার চিরজীবী।

কাব্যরচনা দিয়ে অক্ষয়কুমারের সাহিত্যিক জীবনের পদযাত্রার সূচনা, কিন্তু তখনকার আদিরসাত্মক কাব্যচর্চার পঙ্ককুণ্ডে পতনের সম্ভাবনা থেকে তিনি উদ্ধার পেলেন অনতিবিলম্বে। এই দিক-পরিবর্তনের কৃতিত্ব ঈশ্বর গুপ্তের প্রাপ্য, তাঁর অনুরোধেই অক্ষয়কুমার কবি না হয়ে গদ্যলেখক হলেন।। কাব্যে হয়তো তিনি অপ্রধান হয়ে থাকতেন, কিন্তু গদ্যে হলেন প্রধান।। তাঁর 'অনঙ্গমোহনের' বিলোপ শোকাবহ নয়। গ্রন্থাকারে অক্ষয়কুমারের প্রথম গদ্য-রচনা—'ভূগোল' (১৮৪১), 'দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতির' আশায়, 'বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদানের' উদ্দেশ্যে, 'এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে' মনে করে তত্ত্ব-বোধিনী সভার অনুমতিতে গ্রন্থখানির প্রকাশ। 'দিগ্‌দর্শন' থেকে যে ভূগোলচর্চার শুভারম্ভ, অক্ষয়কুমারের হাতে তারই নতুন অনু-শীলন ভারত-বিদ্যার ইতিবৃত্তের একটি শ্লাঘ্য অধ্যায়।

কিন্তু অক্ষয়কুমারের অন্যতম স্মরণীয় গ্রন্থ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১—১ম খণ্ড, ১৮৫৩—দ্বিতীয় খণ্ড)। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক বিরোধে এই গ্রন্থখানির ভূমিকা প্রধান।।দেবেন্দ্রনাথ খুঁজছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ,

আর অক্ষয়কুমার খুঁজলেন বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ। এ সত্যিই এক নতুন দর্শন, নতুন আদর্শ, নতুন জিজ্ঞাসা ।। রচনাটি স্কচ্ ফ্রেনলজিষ্ট জর্জ কুম্বের 'The constitution of Man' গ্রন্থটির অনুসরণে লেখা, স্থানবিশেষে অনুবাদ। অতএব মৌলিকতার দাবি অক্ষয়কুমার করতে পারেন না, কিন্তু বাঙলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যে নতুন চিন্তা ও প্রাকৃত দর্শনের কৃতিত্ব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করবে কে? 'শারীরবৃত্তির মিতাচার ও জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বিচার ও নিরামিষ আহারের যুক্তিযুক্ততা ব্যাখ্যা···ধর্ম ও সমাজের নিয়ম প্রতিপালন ও সুরাপানের দোষ বিচার' বাঙালীর জীবনযাত্রায় ছাপ ফেলেছিলো বলেই বইটির সামাজিক গুরুত্বও রয়েছে। গ্রন্থ-শেষে ইংরেজী শব্দের বাঙলা পরিভাষা সংকলনও বিস্ময়কর—লেখকের বহুমুখী চিন্তার অন্যতম উদাহরণ। 'চারুপাঠের' (তিনখণ্ড) গোড়াপত্তন তত্ত্ববোধিনীতে, পরে বাল্যপাঠ্য বই হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়। ভাষায় দুরূহতা থাকলেও বিষয়বৈচিত্র্যে বই তিনটির তুলনা নেই। মিথ্যা গালগল্পে নয়, দুষ্পাচ্য রসবিতরণের দ্বারা নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন বার্তা শুনিয়ে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও জ্ঞানতৃষ্ণা জাগিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার—তাই তাঁর এই বইগুলির সমাদর হয়েছিলো অপরিসীম।

'ধর্মনীতি'ও পুরো মৌলিক রচনা নয়, অনুবাদ না হলেও জর্জ কুম্বের 'Moral Philosophy' বইটির অনুসরণ। বিশ্বব্যাপার থেকে বিযুক্ত একটা নিরালম্ব শক্তি হিসেবে ভগবৎ-সত্তাকে দেখেননি কুম্ব, তাই ঈশ্বর-ভক্তিও কুম্বের কাছে প্রাকৃতিক বিধান মেনে চলার ফলমাত্র। এই বিশ্ব-কেন্দ্রিক ঈশ্বর-ভাবনাই অক্ষয়কুমারের ধর্ম-নীতির প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁর 'পদার্থবিদ্যা' 'নানা ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত ও অনুবাদিত'। বস্তুবিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণের সৎ উদ্দেশ্যে বইটি রচিত। তবে অক্ষয়কুমারের অন্যতম স্মরণীয় রচনা দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (১৮৭০ ও ১৮৮৩)। পণ্ডিতপ্রবর উইল্‌সন্ সাহেব সংস্কৃত,

হিন্দী ও ফারসী পুস্তকের সাহায্যে ইংরেজী ভাষায় হিন্দুধর্মাবলম্বী উপাসক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন—মূলতঃ এই দুটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থদ্বয় রচিত। যদিও অতিরিক্ত তথ্যও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ কয়টি বই ছাড়া অক্ষয়কুমারের আরও কয়েকটি রচনা আত্মপ্রকাশ করে এবং তাতেও নানামুখিন জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল।

ভূগোল যখন প্রকাশিত হয়, তখনও বিদ্যাসাগরের প্রতিভার স্পর্শে বাঙলা গদ্যের জীবনায়ন শুরু হয়নি। অথচ অক্ষয়কুমারের এ-লেখায় জড়তা ও অস্পষ্টতা নেই। ভাষায় ছন্দোগুণ এসেছে, পদবিন্যাসে নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, অবোধ পাণ্ডিত্যের আওতা থেকে তার মুক্তি ঘটেছে। 'এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধা-লোভী উদ্‌বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া; বহু ক্লেশে বহু ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল প্রস্তুত করিয়াছি।'—এই উদ্ধৃতিতে 'সুযোগযুক্ত সময়ে', 'দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া' ইত্যাদি পুরনো (archaic) ঢঙের বচনবিন্যাস আছে, 'চন্দ্রসুধালোভী উদ্‌বাহু বামনের ন্যায়ে' সংস্কৃত রীতির আলঙ্কারিতাও রয়েছে—সন্দেহ নেই, তবু বাক্যগতিতে ও শব্দশৃঙ্খলায় শোধনক্রিয়ার চিহ্ন সুস্পষ্ট। এখানে বিজ্ঞানকে মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারেও অক্ষয়কুমারকে কৃতকর্মা বলে মনে হয়।

দীর্ঘবাক্যের জটিলতা বিদ্যাসাগরের রচনায় যেমন তেমনি অক্ষয়কুমারের রচনায়ও আছে। এবং সেদিক থেকে তিনি নতুন কোন ভাষাদর্শ দেখাতে পারেননি। হেয়ার সাহেবের তৃতীয় বার্ষিক স্মরণ সভায় তাঁর বক্তৃতায় শুনতে পাই—'বিশেষতঃ এ দেশীয় লোকের উৎসাহ প্রবাহ তখন প্রবল দেখি, এবং তখন অন্তঃকরণ সাহসে পরিপূর্ণ হয়, যখন এই সম্প্রতিকার ঘটনাকে স্মরণ করি—যখন স্মরণ করি, যে দরিদ্র হিন্দুবালকদিগকে বিদ্যা দানের নিমিত্তে

নগরস্থ সকল লোক উদেযাগি হইয়াছেন। অন্য জাতি মধ্যে যদিও এ অতি সামান্য কার্য্য, কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন হইলে এদেশীয় লোকের মধ্যে এমত শুভসূচক ঘটনা কদাপি হয় নাই—এমত ঐক্য কদাপি বদ্ধ হয় নাই—এবং এই উপলক্ষে সভাতে যে সমারোহ হইয়াছিল এদেশের কোন সাধারণ মঙ্গলজনক কর্ম্মে এ প্রকার বহু ব্যক্তি এক স্থানে এককালে কদাপি একত্র হয় নাই।' এখানে দুটি দীর্ঘ জটিল বাক্য আছে—কিন্তু বাক্যদুটির নানা অঙ্গ লেখক আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ সার্থক হননি, যৌগিক বাক্যধারার সঙ্গে কারবারের কৌশল এখানে অক্ষয়-কুমারের কাছে সহজ হয়ে ওঠেনি। তবে এতে গাম্ভীর্য আছে এবং সেই গাম্ভীর্য সত্ত্বেও তা অস্পষ্ট হয়নি। অবশ্য শ্লথগতি হয়েছে।

বাঙলা গদ্যে বাগ্মিতার সচলতা ও আস্থার (sense of confidence) দ্যোতনার কৃতিত্বও অক্ষয়কুমারকে দিতে হবে। বক্তব্যে যে জোর থাকলে, যুক্তি ও অনুভূতির যৌগিকতায় যে ব্যক্তিত্বস্পর্শ থাকলে শ্রোতার মনে স্থায়ী ছাপ পড়ে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা ও হেয়ার সাহেবের স্মরণ-সভা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় তার পরিচয় পাই। গদ্যে ইতিহাস-চেতনার সবল ও বলিষ্ঠ ধর্ম সঞ্চারেও অক্ষয়কুমার প্রশংসার দাবি করতে পারেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে' তাঁর বিজ্ঞানবৃত্তি ও অনুসন্ধিৎসু মনীষার কঠোর অনুশীলন আমাদের চমৎকৃত করে। সত্যনিষ্ঠা ও তথ্যানুগত্য গ্রন্থটির মূল তাৎপর্য, তার ভাষায় দার্ঢ্য, ন্যায়শৃঙ্খলা ও বিষয়বোধ মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। যেমন—

'সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল আপনাদের অর্থাৎ মানব-জাতির প্রকৃতিই বুঝিতেন এবং তদৃষ্টে ঐ সমস্ত জড়ময় বস্তুর ও মনুষ্যাদির ন্যায় হস্তপদাদি অবয়ব এবং ক্ষুৎপিপাসা ও কামক্রোধাদি মনোবৃত্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া, বিশ্বাস করিতেন। মনুষ্যেরা কোন আদিম কালাবধি আপনাদের উপাস্য দেবতাকে ঐরূপ মানব-ধর্মাক্রান্ত

জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন, অদ্যাবধি ঐরূপ করিতেছেন এবং হয়তো চিরকালই ঐরূপ করিতে থাকিবেন।'

—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

এর আগে প্রকাশিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে' অক্ষয়কুমারের অর্বাচীন বিজ্ঞানবুদ্ধির অধিকতর প্রকাশ ঘটেছে। । চিন্তাশীলতা, বিশ্লেষণপ্রবণতা ও তন্নিষ্ঠতায় গ্রন্থখানি বাঙলা গদ্যে একটি বিশিষ্ট ল্যাণ্ডমার্ক।। সকলের শেষে বাস্তব সংসারের সমস্যার আলোচনায় অক্ষয়কুমারের ভাষার পরিচয় নেওয়া যাক। ১৮৫০ সালের তত্ত্ববোধিনীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তিনি লেখেন—

'নীলকরদিগের কার্য্যের বিবরণ লিখিতে হইলে কেবল প্রজা-পীড়নের বৃত্তান্ত লিখিত হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীলপ্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহাদের নীল ক্রয় করেন, এবং আপনারা ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন।…এই উভয়েই প্রজানাশের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে; নীলকর তাহাদিগকে বলদ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন ও নীলবীজ বপনার্থে তাহাদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প অনুচিত মূল্য ধার্য্য করেন।

—পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা।

এ সব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, শুধু বাঙালীর মনে নয়, সংস্কৃতিতে নয়—বাঙলা গদ্যেও চৈতন্য সঞ্চার করেছেন অক্ষয়কুমার। এবং সেই চৈতন্য রামমোহনের নৈয়ায়িকতা নয়, আধুনিক বিজ্ঞান-বোধ ও ব্যবহারিক বুদ্ধি। বিদ্যাসাগরের সজল মানবিকতা ও সাহিত্যিক রসচর্চার পটভূমিকায় এর সাংস্কৃতিক মূল্য ও শৈল্পিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ অক্ষয়কুমারে এসে আমরা বলতে পারি,—গদ্যভাষা সর্ববিষয়ব্যাপিনী না হোক বহুবিষয়ব্যাপিনী

হয়ে উঠেছে, তার অধিকারের সীমা অনেক বেড়ে গিয়েছে, নানা-মুখিন চিন্তা ও বহুধাবিভক্ত চিত্তের বাঙ্ময় রূপ হয়ে উঠেছে। তিনি রসস্রষ্টা হননি, তাতে দুঃখের কিছু নেই—বিদ্যাসাগরের লেখাতেই তো পেয়েছি ভাষার রসাকর্ষণ ও রসবিশ্লেষণের শক্তির নিকষ-বিচার। অক্ষয়কুমারের গদ্যে মাধুর্য নেই, কিন্তু দার্ঢ্য আছে—সাহিত্যের দিক থেকে তাতে পাঠকের ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে পাঠকের শেষ পর্যন্ত লোকসান হয়নি।।

অক্ষয়কুমারের ভাষায় তৎসম-প্রাচুর্য ও অলঙ্কার-বাহুল্য এক সময়ে পরিহাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাঁর সংস্কৃতপ্রিয়তায় যে ওজস্বিতা, তার স্বীকৃতি জানিয়েও উৎকট শব্দ ও অনাবশ্যক আলঙ্কারিকতার নিন্দা করতে হয়।। 'জুগোপিষা', 'জিজীবিষা, ইত্যাদিতে বিরক্ত হয়ে সেকালের পাঠক বিদ্রূপাত্মক 'চিড়্‌টীমিষা' শব্দ সঙ্গতভাবেই তৈরি করেছিলো। আমার মনে হয়, এর জন্য সেকালের সংস্কৃতকলেজের লেখকগোষ্ঠী ও বিদ্যাসাগরের প্রভাবও কিছুটা দায়ী। সংশোধনের নামে হয়তো সংস্কৃত-ঘেঁষা রচনারীতি বিদ্যাসাগরই অক্ষয়কুমারের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আর সংস্কৃত কলেজের লেখকগোষ্ঠীর প্রভাব এড়ানো কি তখনকার দিনে সম্ভব ছিলো? অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির সঙ্গে তাঁর ভাষার সংস্কৃত-প্রবণতার মিল নেই বলেই এ-মন্তব্য করতে হলো। অবশ্য কৈলাস ঘোষ ও রাজনারায়ণের সাক্ষ্য বিদ্যাসাগরের পক্ষে।

॥ ২ ॥

দেবেন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রূপোর চাম্‌চে মুখে নিয়ে তাঁর জন্ম। জন্মসূত্রে তিনি শুধু ঐশ্বর্যের অধিকারী হন নি, ঠাকুর বাড়ির সাংস্কৃতিক ঋদ্ধিরও সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। কিন্তু পিতার রাজসিক আভিজাত্যে তাঁর মন

ভুললো না, তাঁর জীবন কাটলো না আর দশ জন ধনীর দুলালের মতো। দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ইতিহাসে যে অনির্দেশ্য সত্যের সন্ধান বড়ো হয়ে আছে, তার সঙ্গে সমগ্র পরিবেশেরই কোন মিল নেই। তিনি স্বতন্ত্র—চিত্তধর্মের সাত্বিকতায়, সমুজ্জ্বল —নিজের মহিমায়।

দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহনের বন্ধু, বহু চিন্তা ও কর্মের সহযোগী। তাই দেবেন্দ্রনাথেরও শিক্ষা শুরু হলো রাজার অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে। সেখানে সংস্কৃত, বাঙলা ও ইংরেজী শেখানো হতো, আবার বেদান্তচর্চারও সুযোগ ছিলো। এই স্কুলেই রামমোহনের বৈদান্তিক চিন্তার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে, রাজার অতিব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভবের সুযোগ হয়। তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র, স্কুলের পরীক্ষায় একাধিকবার পুরস্কার অর্জনে তার প্রমাণ পাই। রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর আঠারো শ' একত্রিশে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু-কলেজে ভর্তি হন। তখন হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর কাল—যদি পদত্যাগ করেও থাকেন তবু তাঁর প্রভাব ছিলো অখণ্ড অব্যাহত। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের আবর্তে পড়েও, তাঁদের ঐতিহ্যবিরোধী নতুন শিক্ষা আর সনাতন ধর্মে অনাস্থার 'ঝড়ো হাওয়ায়ও' দেবেন্দ্রনাথ নিষ্কম্প রইলেন। এবং এদিক থেকে তিনি বিদ্যাসাগরেরই সমানধর্মা। হয়তো রামমোহনের আদর্শমণ্ডলে মানুষ হওয়ার জন্যই তিনি নিজের চারদিকে দড়িদড়া এঁটে ইয়ং বেঙ্গলের আক্রমণ থেকে দূরে থাকতে পেরেছিলেন, হয়তো বা পারিবারিক জীবনচর্যাই তাঁকে অজানা স্রোতে গা ভাসাতে দেয়নি। দেবেন্দ্রনাথের এই স্বদেশ ও স্বাদেশিক সংস্কৃতির মধ্যে আত্মরক্ষার ইতিহাস তাঁর জীবনস্বরূপে প্রবেশের চাবিকাঠি।

আঠারো শ' বত্রিশে বছর পনের বয়সে দেবেন্দ্রনাথ 'সর্বতত্ত্ব-দীপিকার' সম্পাদক হন। সভার উদ্যোক্তারা অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র। 'স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা'

ও 'গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার্থ' এই সভার প্রতিষ্ঠা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসু ও বিচারপ্রবণ মনের খবর এখানে পাই। হিন্দু কলেজ ছেড়ে যখন তিনি বিষয়কর্মে নিযুক্ত, তখনও সংস্কৃত শিক্ষা ও বাঙলা চর্চায় নিরত হন, এমন কি সঙ্গীতে ও তাঁর অনুরাগ দেখা দেয়। আসল কথা, দেবেন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক জীবনটাই ছিলো বড়ো জীবন। এবং আর সব ছিলো 'এহো বাহ্য'।

বিষয়কর্মে দেবেন্দ্রনাথের দক্ষতা শুধু দ্বারকানাথের উইল থেকে প্রমাণ করা কঠিন ; পিতার কাছ থেকে 'কার ঠাকুর কোম্পানীর' আট আনার মালিকানা লাভে দ্বারকানাথের ছেলের ওপর বিশ্বাসের পরিচয় আছে, দেবেন্দ্রনাথের যোগ্যতার নয়। আসল কথা, বিষয়কর্মে তাঁর ক্ষমতার বিচার তাঁকে বুঝতে কিছুমাত্র সাহায্য করে না—তাঁকে বোঝা দরকার বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর মনোযোগ ও আগ্রহের অভাব থেকে। তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই, ছেলের মনের গতি দেখে দ্বারকানাথের চিন্তার অন্ত ছিলো না, তত্ত্বচিন্তায় ছেলের অনুরাগে তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। অবশ্য এরও একটা পূর্বের ইতিহাস আছে। দিদিমার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সূর্য-মন্ত্র, সাবিত্রীর তেজে তিনি দেখলেন বিশ্বলীলার উৎস। কিন্তু বাইরের প্রকৃতি ও সৃষ্টির বৈচিত্র্যে তাঁর মনের লীলায় ছেদ পড়লো পিতামহীর মৃত্যুতে। দিদিমার তিরো-ধানের সেই চান্দ্র রাত্রিতে যেন এক আশ্চর্য শ্মশান-বৈরাগ্য গ্রাস করলো তাঁকে। দেবেন্দ্রনাথের মনে হলো—'আমি যেন আর পূর্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্যের উপরে একেবারে বিরাগ জন্মিল।' কিন্তু এর মধ্যে আনন্দও ছিলো—একটা সাত্ত্বিক অনুভূতিকে সহজভাবে পাওয়ার আনন্দ। আঠারো বছর বয়সের এই নিরাসক্তি ও আনন্দজনিত চিত্তসঙ্কট বেদ-বেদান্ত পাঠে গেলো না, মহাভারতে কিছুটা শান্তি এলেও পুরো তৃপ্তি ঘটলো না। মনের বিষাদ

আর দাহ কিছুতেই ঘোচে না যেন। হিউমের নিরীশ্বরবাদ বা সংশয়বাদ, ফরাসী দার্শনিকের প্রকৃতিবাদ কিংবা য়ুরোপীয় জড়বাদ পড়লেন, বোঝার চেষ্টা করলেন—কিন্তু এঁদের প্রকৃতিসর্বস্বতায় তিনি মনের মিল খুঁজে পেলেন না। এমনিতর সঙ্কট আর সংশয়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন ঈশোপনিষদের একটি শ্লোকে সন্ধান পেলেন জীবনের পরম পথ—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। 'জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈতন্যস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে যিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন।' জগতে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরচৈতন্যে দেবেন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন জীবনের তৃষ্ণার জল। তখন তৃপ্ত তিনি, পূর্ণ তিনি।

এই তো গেলো ব্যক্তিগত সত্যোপলব্ধির ইতিবৃত্ত। সামাজিক ধর্মের ক্ষেত্রেও দেবেন্দ্রনাথ সচেতন, তাই তিনি, ম্যাক্সমুলারের মতে, 'The Nestor of Brahmo Samaj'। ছেলেবেলা থেকেই দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের সংশ্রবে এসেছিলেন—অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে। কিন্তু পারিবারিক আবহাওয়া ঠিক ব্রহ্মোপলব্ধির অনুকূল ছিলো না, ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা-পুজো ও পিতামহীর বৈষ্ণবতা ছিলো প্রতিবন্ধক। রামমোহন কেন ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না, তার কারণ উপলব্ধি করেই ১৮৩৮ সালে তাঁর সিদ্ধান্ত: 'রামমোহন রায় যেমন কোন প্রতিমাপূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না।' ঈশোপনিষদের ঋষিবাক্যে আপন সত্যোপলব্ধির সমর্থনও তিনি পান অনেকটা এই সময়ে। তাই একে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, দেবেন্দ্রনাথের জীবনের 'শুভক্ষণ'। আর তারপর উনচল্লিশে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলো 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (প্রথম নাম তত্ত্বরঞ্জিনী সভা)—ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের জীবনায়নের নতুন

পদচিহ্ন। বেদপাঠে শূদ্রকে অধিকার দান, রামের অবতারতত্ত্ব নিরসন, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও পত্রিকার প্রতিষ্ঠা, আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততা নিয়ে অক্ষয়-কুমারের সঙ্গে বিতর্ক ও ধর্মমতের পরিবর্তন, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ ইত্যাদি বিচিত্র ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজচিন্তার বিবর্তন অন্যান্য প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় অধ্যায় ও অক্ষয়কুমার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) আলোচনা করেছি এবং এক সত্যনিষ্ঠ ও ভক্তিপ্রাণ মহাপুরুষের মানসসান্নিধ্য পেয়েছি। আর দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধ নিয়ে পারিবারিক সংঘর্ষের কালে দেবেন্দ্রনাথের দৃঢ়তা শ্রদ্ধেয়; চতুর্দিকের লোকভয়, নিরাশ্বাস ও বিরূপতার দিনেও তিনি পৌত্তলিক নিয়মে শ্রাদ্ধ না করে নিজের মনের মতো করে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করলেন। অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনদের কাছে পেলেন না, কিন্তু পেলেন আত্মতৃপ্তি। অথচ সম্পত্তি ভাগের সময় তিনি এই মনোমালিন্যের কথা স্মরণ রাখেন নি, সব ভাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন পিতৃধন। দুর্গাপূজো নিয়ে পারিবারিক গোল-যোগের কথাও এখানে বিবৃত করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের মনের সায় তাতে ছিলো না, তাই পূজোর সময় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন—তবু বংশানুক্রমিক পূজো তুলে দিয়ে ভাইদের মনে আঘাত দিতে চাননি। এই ধরণের সাত্ত্বিক মানুষই ছিলেন দেবেন্দ্র-নাথ, এই হলো তাঁর সত্যকাম মনের চরিত্র।

দেবেন্দ্রনাথের গোটা চরিত্রের প্রসঙ্গ মাক্সমুলারের কাছে তাঁর লেখা একটা চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে সম্পূর্ণ করতে চাই—'You are perhaps not quite right in taking me for a Sannyasin in the sense of one who has wholly renounced the world. To be in the world, not of it. is my beau ideal of a Sannyasin, and in that sense I am one....I take a keen interest in all that goes on far and

near, in my domestic circle and outside...I have settled down for the present in a country house....far from the din and bustle of the town and yet not too far to be out of its reach, and my life glides smoothly along like the waves in winter, resigned to His will and ready to quit its mortal coils at His call.' অর্থাৎ রামমোহনের মতো দেবেন্দ্রনাথেরও লক্ষ্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ—তবে রাজার চেয়ে তাঁর বৈরাগ্যমুখিতা ও ভক্তিপ্রাণতা ছিলো বেশি। রামমোহন সত্যধর্ম পেয়েছিলেন বুদ্ধিতে, দেবেন্দ্রনাথ হৃদয়ে। অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্মের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মহর্ষির যতটা অনুরাগ ছিলো, ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক গুরুত্বে ততটা আগ্রহ ছিলো না। তাই অক্ষয় দত্ত ঈশ্বরবোধকে জ্ঞানানুশীলনে ও সামাজিক হিতকর্মে রূপ দিতে চাইলে ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী দেবেন্দ্র-নাথের মন সায় দেয়নি; উদারপন্থী কেশবচন্দ্র বিধবাবিবাহ, উপবীত ত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক সংস্কারকর্মে অতি দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় প্রতিবাদ জানান দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক আন্দোলনের পাদপীঠ নয়, ঈশ্বর-আরাধনার বেদী—'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আমার কার্যের পরিমিত ক্ষেত্র, আমি তথায় ব্রাহ্মদিগের ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপসনা করিব, পত্রিকার দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম যাহাতে প্রচার হয় তাহাতে যত্ন করিব (কেশবচন্দ্রকে লিখিত পত্র)।'

দেবেন্দ্রনাথ উনিশ শতকী রেনেসাঁসের সন্তান, হিন্দু কলেজের ছাত্র, ঠাকুর পরিবারের বংশধর। তখনকার অনাচারে তাঁর বিমুখতা অকারণ নয়, তেমনি অকারণ নয় সমসাময়িক সাংস্কৃতিক অন্বেষণে, বিদ্যাবত্তার অনুশীলনে তাঁর সচেতনতা। আসল কথা, যুগধর্মের মুখোশে নয়, তার বহিরঙ্গেও নয়, তার আন্তর স্বরূপে দেবেন্দ্রনাথের মন ছিলো সজাগ। তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (তার বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যসূচী দ্রষ্টব্য), ব্যারাকপুর পাঠশালা ও সুখসাগর স্কুল, হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়, হিন্দু কলেজ, সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি ইত্যাদি অনেক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের মতো রাজনৈতিক সংস্থায় তাঁর সক্রিয় সহযোগ সেই সজাগ মনের পরিচয় দেয়। এই সব তথ্যের মুকুরে আমাদের দেবেন্দ্রনাথকে চিনে নিতে হবে।

ওই শতাব্দীর অধিকাংশ মনস্বীর মতোই দেবেন্দ্রনাথ লেখক ছিলেন বলেই লেখেন নি, নানান কারণে লিখেছেন বলেই লেখক। তাঁরও চিন্তা ও কর্মের জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের জীবন এক সূত্রে গ্রথিত। শুধু মাত্র সাহিত্যিক সৃজনশীলতার দিক থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ নয়, দ্বিতীয়ার্ধই সোনার ফসলের কাল—কিন্তু এই দ্বিতীয়ার্ধের উপযুক্ত পটভূমি হিসেবে প্রথমার্ধেরও একটা সার্থকতা আছে। শতাব্দীর পূর্বভাগে বিচিত্র জীবনজিজ্ঞাসায় ও সমাজচিন্তায়, জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বে ও ব্যক্তিমানুষের বোধবুদ্ধিতে একটা আলোড়ন কম-বেশি স্ফূর্ত হয়েছিলো; তখনকার সাহিত্যকে সেই আলোড়নের ইতিবৃত্তের সঙ্গে মিলিয়েই বিচার করতে হবে, স্বয়ংসিদ্ধ শিল্পকর্মের দিক থেকে নয়। দেবেন্দ্রনাথের রচনাও তার ব্যতিক্রম নয়।

জীবনে যে সহৃদয় ভক্তির উপলব্ধি, দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা তারই প্রমূর্ত প্রকাশ। সার্থক রচনা ব্যক্তিনিষ্ঠ, অনুভূতির রসে চিত্তাকর্ষক ও জীবনের প্রত্যয়ভূমিতে দৃঢ়মূল। দ্বৈত বিশ্বাস নয়, অদ্বৈত বিশ্বাসের বাঙ্ময় প্রকাশে একটা নিরাভরণ সৌন্দর্য ও সরলতা থাকে, একটা গোটা ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে এবং লেখকের সচেতন কারুকর্মের অভাব সত্ত্বেও ভাবরসের দিক থেকে অন্ততঃ কিছুটা সাহিত্যগুণ লাভ করে। দেবেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের ভেতরে আমরা দেখেছি ভগবৎ-ভক্তির নিগূঢ় উপলব্ধি, আত্মসমাহিত সত্তার শান্তরসাশ্রিত ব্যঞ্জনা আর চিত্তধর্মের অকপট সারল্য। ফলে

'তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া আমরা দুইটি মানুষের সন্ধান পাই না। সমস্ত রচনার ভিতরে প্রতিভাত তাঁহার এক রূপ এবং সে রূপটিও নিরাভরণ। দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার ভিতর দিয়াই তাঁহার মহর্ষি রূপটি প্রকাশিত হইয়াছে; এইখানেই কৃত্রিম আড়ম্বরের প্রচুর অবসর ছিল,—কিন্তু আশ্চর্য এই,—ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য রূপে তাঁহার যে বক্তৃতাবলী তাহাও শুধু মাত্র ধর্মের উচ্চ-বেদী হইতে নিম্নের পাপি-তাপীদের প্রতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপদেশাবলীই নহে,—সে বাণী যেন হৃদয় হইতে হৃদয়ে উচ্চারিত পরমাত্মীয় পরম সুহৃদের বাণী।...এই সকল ব্যাখ্যানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা শাস্ত্রের ব্যাখ্যান হইলেও শাস্ত্রের কচকচি নহে; শাস্ত্র এখানে অবলম্বন মাত্র, শাস্ত্রকে অবলম্বন কবিয়া অপূর্ব উন্মাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে মহর্ষির ধর্মানুপ্রাণিত প্রাণ-পুরুষ।' তাই তাঁর কোন কোন লেখা রচনা-সাহিত্যের (personal essay) উৎকৃষ্ট নিদর্শন, চমৎকার সাহিত্যগুণের আকর। কিন্তু এসব স্বীকার করে নিয়েও মনে রাখা চাই,—দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন ঈশ্বর-সাধক,—তাই তাঁর লেখার জন্ম শিল্পীর রসচর্বণায় নয়, সৌন্দর্যধ্যানেও নয়, ভগবৎ-চেতনার আনন্দে। অর্থাৎ সাহিত্যিক সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় তাঁর রচনার জন্ম হয়নি বলে তাদের সাহিত্যগুণকে সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

তবে দেবেন্দ্রনাথের এই শুদ্ধ আবেগ আর সত্যানুভূতি এসেছে, তাঁর ব্রহ্মবিহার থেকে। অন্যদিকে কবি-সাহিত্যিকের শুদ্ধ আবেগ-সঞ্জাত রসানুভূতিতেও ব্রাহ্মস্বাদের ব্যঞ্জনা থাকে। অর্থাৎ সর্বোত্তম উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাধক ও শিল্পীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, সত্যের সঙ্গে সুন্দর একাকার হয়ে যায়। তাই সাধক হয়েও দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্যিক, যেমন উপনিষদের ঋষিরাও কবি বলে স্বীকৃত।

'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েসেনে' বাঙলায় বিতর্কের নিয়ম প্রচলন ও 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভায়' প্রদত্ত বক্তৃতায় মাতৃভাষার

ওপর গুরুত্ব আরোপে দেবেন্দ্রনাথের মানসপ্রবণতার পরিচয় পাই। তত্ত্ববোধিনীতেও তাঁর ভাষা-প্রীতির ইতিহাস ছড়িয়ে আছে—ধর্ম-ব্যাখ্যানে তার অন্যতম প্রমাণ দেখি। বাঙলা ভাষার সঙ্গে এই অনুরাগে এসে মিলেছে আপন জীবনের সত্যানুভূতি। ভাষার সঙ্গে ভাবের এই সহযোগ বাঙলা গদ্যের মর্মমূলে করেছে রসসঞ্চার। তাছাড়া বোধ ও বুদ্ধিতে, চিন্তা ও চর্বণায় জটিলতা ছিলো না বলে ভাষাও জটিল হয়নি—এক অকপট অভিব্যক্তিতে, নিষ্কুণ্ঠ সারল্যে ও অমলিন স্বচ্ছতায় দেবেন্দ্রনাথের ভাষারুচি শুভ্র সুন্দর হয়ে উঠেছে। যেমন—

(১) 'যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমাদের অন্তরাত্মা, সকলের অন্তরাত্মা, তিমিরমুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবা মাত্র তাঁহার চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে।...সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? সূর্য্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। বনের নির্জ্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? তাহা হইতেও উত্তর পাই।'

—ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, প্রথম প্রকরণ।

(২) সুখ-দুঃখ সংসারে চিরকালই বিচরণ করিতেছে। সুখ-দুঃখ সংসারে চিরকালই বিচরণ করিবে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন চিরদিনই আছে, সমুদ্র কখনো নিস্তরঙ্গ হইবে না, তেমনি সুখ-দুঃখ কেবল মনুষ্যের ভাগ্যে নাই, পশু-পক্ষীর মধ্যেও আছে। সেখানে সুখ-দুঃখ দেখিতে পাই, সেইখানে বুঝিতে পারি মন আছে—সুখ-দুঃখের আয়তন মন।

—ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট।

এই উদ্ধৃতি দুটির ভাষা ও বক্তব্য থেকে কয়েকটা সিদ্ধান্ত করা যায়। জ্যামিতির ক্ষেত্রে প্রমাণের আগে থাকে একটা প্রকল্প

(hypothesis), লজিকে একটা প্রতিজ্ঞা (premise) থেকেই প্রতিপাদনে পৌঁছোতে হয়। দেবেন্দ্রনাথের লেখায় প্রকল্প থেকে প্রমাণে, প্রতিজ্ঞা থেকে প্রতিপাদনে পৌঁছোবার কোন কার্য-কারণ শৃঙ্খলা নেই, নেই কোন যুক্তি-ক্রম—ফলে বাক্যগুলি যেন অপ্তবাক্য, যেন বেদের ঋক ও উপনিষদের শ্লোকের মতোই স্বয়ম্ভু। দেবেন্দ্রনাথের মানসমণ্ডলে বিচার, বিতর্ক ও বিশ্লেষণের কোন ইতিহাস নেই—তা তো নয়, তবু তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েই বক্তৃতা, ব্যাখ্যান ও রচনায় দেখা দিয়েছেন—তার পেছনের ইতিহাস রেখেছেন অব্যক্ত। তাই রামমোহনের লেখার সঙ্গে মহর্ষির লেখার একটা পার্থক্য আছে। যুক্তিক্রমে রাজার লেখা যেখানে বিশ্লেষণধর্মী, ভাবক্রমে দেবেন্দ্রনাথের লেখা সেখানে সংশ্লেষণধর্মী। একের ক্ষেত্রে ভাষা রূপ নিয়েছে ভাবনার, অন্যের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের। গদ্যের বিচারে এটা নিশ্চয় ত্রুটি।

দেবেন্দ্রনাথের লেখায় গদ্যধর্মের অভাব আছে, কিন্তু তার বদলে এসেছে লিরিকধর্ম। ভাবনা ও বিচারকে বিশ্বাসে পরিণত করে প্রকাশ করলে কাব্যধর্মের স্ফূর্তি স্বাভাবিক। কবিতার জন্মমূলেও বিশ্বাসের ভাব, প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা, সমস্ত ভাবনা ও চিন্তার রস-নিষ্পত্তি। ঐকান্তিক বিশ্বাসে জন্ম নিয়েছে বলেই দেবেন্দ্রনাথের লেখায় কাব্যের লাবণ্য আর ধ্বনির স্বভাব। অবশ্য আর একটি কারণও ছিলো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি কোনদিন বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরকে আলাদা করে দেখেন নি। একথা দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সত্য। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে তিনি দেখেছেন ভুবনসুন্দরের আসন পাতা। তাই স্রষ্টার সঙ্গে যেমন, তেমনি সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর অনুরাগের যোগ। ভালোবাসার মায়াঞ্জন চোখে নিয়ে কবিরাও তো বিশ্বজগৎকে দেখে থাকেন। তাই কবির মতোই দেবেন্দ্রনাথ ধরার আনাচে-কানাচে সুন্দরকে চেয়েছেন ও পেয়েছেন—হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট দিয়ে আহরণ করেছেন তমসার ঊর্ধ্বে বিরাজমান জ্যোতির্ময়ের কনক-কিরণ। মহর্ষির এই 'মাধুকরীর' বর্ণনায় পাই—

(১) '…আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা, সকলি নূতন, সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল সকল শিশিরজলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান-ভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত…তখন এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ুর ময়ুরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরের ছাদের একতলায় বসিত এবং তাহাদের চিত্র-বিচিত্র দীর্ঘ্য পুচ্ছ সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত।…ফাল্গুন চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধু মাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণ বায়ু আম্রমুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত নেবুফলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল।'

—আত্মজীবনী, পৃঃ ২৩১।

এই পর্যন্ত এসে মনে হয়, রূপ-রস-রঙের প্রকৃতি দেবেন্দ্রনাথের মনে বুঝি 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পরের চরণেই ভুল ধরা পড়ে—'ইহা সেই করুণাময়েরই নিশ্বাস।' তখন মনে হয়, মহর্ষির নিসর্গ-প্রীতি স্বয়ংসিদ্ধ নয়, তা পরম-পুরুষের লীলা-বিভূতির আস্বাদনেই গরীয়সী।

অন্যত্রও দেখি—

(২) 'সমুদ্রের নীল জল ইহার পূর্বে আর আমি কখনো দেখি নাই। তরঙ্গায়িত অনন্ত নীলোজ্জ্বল সমুদ্রে দিনরাত্রির বিভিন্ন বিচিত্র শোভা দেখিয়া অনন্ত পুরুষের মহিমায় নিমগ্ন হইলাম।'

—আত্মজীবনী।

এখানেও প্রকৃতির রূপারতি পরিণত হয়েছে অনন্ত পুরুষের মহিমা প্রদক্ষিণে। তবে, আগেই বলেছি, গভীরতম উপলব্ধি জাগলে শিল্পী ও সাধক এমনিভাবে একাকার হয়ে যান।

মহর্ষির লেখায় সরসতা আছে,—সে সরসতা একদিকে যেমন

উপলব্ধির শান্তরসের পরিণাম, অন্যদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়দৃষ্টির ফল। তাঁর মনের মুখে নিত্য অধ্যাত্মবোধের শিখা জ্বলতো; সে শিখায় ইন্দ্রিয়ের পথও ছিলো আলোকিত ও উজ্জ্বল। তাই প্রকৃতির নানা উপাদান তাঁর বোধের কাছে রূপাবয়ব নিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতো। ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে 'একটি চেতনাবান পুরুষের শাসনে যে বিশ্বসংসার চলিতেছে' তা দেখার জন্যই তাঁর রচনায় রূপরসবিশিষ্টতার সন্ধান পাই। হিমালয়ের পাদদেশের ভ্রমণের বর্ণনায় এক আশ্চর্য চিত্রময়তা আছে। কিন্তু তিনি কোথায়ও সংযমের বাঁধন হারান নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক স্বল্পভাষণে তিনি উন্মুক্ত করেছেন মনের দরজা, সংক্ষিপ্ত কথাচয়নের বদলে কথার উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেন নি। আসল কথা, আত্মস্থতা দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও ভাষার নিহিতার্থ। এরই সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে ভেতরের অহংপুরুষের আত্মলোপের (depersona-lisation) চেষ্টা। বিশেষ করে নিজের কথা যেন তিনি বলতে চাননি, যেখানে সুযোগ ও প্রয়োজন ছিলো সেখানেও জীবনের বহিরঙ্গকে আড়াল করে রেখেছেন। এই অহমিকাবোধের অসদ্ভাব দেবেন্দ্রনাথের লেখায় এনেছে এক সাত্ত্বিক স্বাদ।

শুধু ভাষাবিচারেও দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ধরা পড়ে। তাঁর লেখায় দীর্ঘ সমাস নেই, শব্দবিন্যাসের আড়ষ্টতা নেই, সেকেলে আলঙ্কারিকতা নেই, নেই অন্বয়গত জটিলতা। তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন প্রচুর, সেদিকেই ঝোঁক যেন বেশি—তবু সংস্কৃতপ্রবণতার (Sanskritism) দোষ থেকে মুক্ত তিনি। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত ও সংস্কৃত কলেজের লেখকগোষ্ঠীর ভাষারীতির কালে এটা আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নেই। তবে মনে রাখতে হবে, দেবেন্দ্রনাথের পরিণত রচনাগুলি আঠারো শ' ষাটের আগে লেখা নয়। প্রথম দিকের রচনা এর চেয়ে জটিল—

(১) 'এই ক্ষণে মূর্খলোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠলোষ্ট্রেতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া তাহাতে পূজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি

হয়না।···তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা ; অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু এই বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার থাকে, তবে আমারদিগের অন্য ধর্ম্ম কদাপি প্রবৃত্তি হয় না।'

—তত্ত্ববোধিনী সভায় বক্তৃতা, ১৮৪১।

(২) কোন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন তাহার বাক্যকেই প্রমাণ করিয়া সৃষ্টির রচনা জানিতেছ এমত নহে কিন্তু সেই গ্রন্থকর্ত্তার সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা মান্য করিতেছে। এইরূপ বালককালে অত্যন্ত নিপুণরূপে বিচিত্র সৃষ্টির রচনা বিষয়ে অনুশিষ্ট হইয়া জ্ঞানের উদ্রেকে ঈশ্বরের মহিমা কতক জানিতে শক্য হয়, তখন তাহারদিগের বোধ হয় যে এই অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা অবশ্য একজন আছেন যিনি অনন্ত স্বরূপ··· ।

—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা-সভায়
বক্তৃতা, ১৮৪৩।

এখানে অপ্রচলিত কঠিন শব্দ দু' একটি আছে, বাক্যবিন্যাসেও প্রাচীনরীতি রয়েছে। তবু সব মিলিয়ে, দেবেন্দ্রনাথের গদ্যের সার্থকতা ও পরবর্তীকালের গদ্যে তার প্রভাব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের রচনায়।

॥ তিন ॥

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন কমল-হীরে, কারণ বিদ্যাই ছিলো তাঁর জীবনের একমাত্র পদার্থ। বিদ্যাসাগরের পণ্ডিত পরিচয় আংশিক ; দেবেন্দ্রনাথের সারস্বত সাধনা নয়, ভগবৎ-সাধনাই শ্রেয় ; জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেরও নায়ক। কিন্তু

রাজেন্দ্রলাল শুধুই বিদ্যাজীবী, সরস্বতীর পদ্মবনের অধিবাসী। তাঁর আর কোন পরিচয় নেই, থাকলেও তা মূল্যহীন। রাজেন্দ্র-লালের জীবনের ইতিবৃত্ত থেকে তা প্রমাণ করতে পারি।

বছর চারেক বয়সে রাজেন্দ্রলালের বাঙলা শেখা শুরু হয়, ইংরেজী পাঠ শুরু হয় আরও বছর দুই পরে। ক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও গোবিন্দ বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে কিছুকাল পড়াশুনো করে তিনি ভর্তি হন মেডিকেল কলেজে। ভাল ছাত্র হিসেবে পুরস্কার পেলেও আকস্মিকভাবেই তাতে ছেদ পড়লো— কারণ সাহেবদের সঙ্গে বিবাদ। কিন্তু এ তো শাপে বর হলো, অল্পদিন আইনের পথে ঘুরে অবশেষে ভাষা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। ক্রমে ক্রমে ফরাসী, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দু রাজেন্দ্রলালের অধিগত হলো। এই তাঁর ধাতস্থ হওয়ার কাহিনী, ক্ষীরের সমুদ্রে হংসরাজের প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস।

বিদ্যাজীবীর বৃত্তি যদি অনুকূল না হয়, তবে মানসিক সঙ্কটের অন্ত থাকে না। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের অন্বিষ্ট বিদ্যার সঙ্গে অত্যা-বশ্যক জীবিকার অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিলো না। তাই ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি প্রবেশ করলেন কর্মজীবনে—'বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে'—জ্ঞানের পীঠস্থানে। সেখানে তিনি হলেন অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ও গ্রন্থাধ্যক্ষ। রাজেন্দ্রলাল গ্রন্থাধ্যক্ষ হওয়ার সুযোগে গবেষক হলেন, সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের জগৎ তাঁর চোখের সামনে খুলে গেলো, পেলেন দিশি ও বিলিতি পণ্ডিতদের মানস-সান্নিধ্য। এর ফলে তাঁর বিদ্যাবৃত্তির চরিতার্থতা না এসে পারেনি। সংস্কৃত সাহিত্যের লুপ্ত রত্নোদ্ধারে, প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনে এবং প্রচুর গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে এখানকার কর্ম ছাড়লেন বটে, কিন্তু সম্বন্ধ ছাড়লেন না ; প্রথমে সদস্য ও পরে সভাপতি হয়ে পরিচয় দিয়ে গেলেন আপন মনীষার। এসিয়াটিক সোসাইটীতে চাকুরীর পরে রাজেন্দ্র-লাল 'ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউসানের' পরিচালক হন—গ্রহণ করেন

নাবালক জমিদারদের উন্নততর শিক্ষার দায়িত্ব। সুতরাং রাজেন্দ্রলালের জীবিকা তাঁর মানসিক দাসত্বের নয়, প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র ছিলো।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'সারস্বত সমাজের' সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের শুভযোগও স্মরণীয়। কারণ এর প্রতিষ্ঠায়ও ছিলো আরেকটি বিদ্যাভূমির প্রস্তুতি, নতুন বিষয়ে জ্ঞানানুশীলনের প্রতিশ্রুতি। বাঙলা পরিভাষা নির্ণয় সমাজের নিকট লক্ষ্য ছিলো, বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিলো বিদ্যার উন্নতি। সংস্থাটির প্রথম ও দ্বিতীয় সভায় বাঙলা বানান ও ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতা তাঁর গভীরতম সারস্বত-চিন্তার পরিচায়ক। কলকাতা সেন্ট্রাল টেক্সট্-বুক কমিটি, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটী, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আর্ট স্কুল ইত্যাদির ইতিহাসেও তাঁর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, এগুলি ছিলো তাঁর জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির উপযুক্ত চারণক্ষেত্র। তবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসানের আসরে কিংবা কংগ্রেস মণ্ডপে রাজনৈতিক কর্মধারাকে তাঁর দ্বিতীয় সাধনা বলা যেতে পারে; সেগুলি একটা গোটা মানুষের গড়নে কতকগুলি গৌণ উপাদান মাত্র।

রাজেন্দ্রলাল তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি ও সম্মান নানা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে পেয়েছেন, কিন্তু সর্বত্রই তাঁকে দেখা হয়েছে একজন অনুপম বিদ্যাধর রূপে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজেন্দ্রলালকে এল-এল. ডি. উপাধি বিতরণকালে ম্যাক্সমুলারের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—'He is a Pandit by profession, but he is, at the same time, a scholar and critic in our sense of the word'. রবীন্দ্রনাথও 'জীবনস্মৃতিতে' তাঁকে 'সব্যসাচী' বলেই ক্ষান্ত হননি, তাঁকে একটা 'সভা' (institution) বলতে দ্বিধা করেন নি। এই হলো রাজেন্দ্রলালের সত্য পরিচয়।

সাময়িক পত্রের ইতিহাসে রাজেন্দ্রলাল অবিস্মরণীয়। তাঁকে

প্রথম দেখা যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ-নির্বাচনী-সমিতির অন্যতম সদস্যরূপে। সেখানে তিনি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর ইত্যাদির এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত; মনে হয়, ধর্মপ্রচার ছাড়াও সমাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ও সাহিত্যাদি আলোচিত হতো বলেই পত্রিকাটির দিকে রাজেন্দ্রলালের আকর্ষণ ছিলো। কিন্তু ১৮৫১ সালের শেষ দিকে 'প্রকাশিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' সম্পাদক রূপে রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব সর্বাধিক। বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজ (Vernacular Literature committee) এর উদ্যোক্তা; বিলিতি পেনি ম্যাগাজিন এর আদর্শ; পুরাবৃত্তেতি-হাস, প্রাণিবিদ্যা, শিল্প, সাহিত্যাদি দ্যোতনা এর উদ্দেশ্য। এই প্রথম সচিত্র মাসিকে রাজেন্দ্রলাল ঘোষণা করেছিলেন—'যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করে, যাহাতে বণিক এবং মোদক আপন আপন কর্ম হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্পবোধে ক্রীড়াচ্ছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থসকল পরিহরণপূর্বক উপকারক বিষয়ের চর্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধব্যক্তি তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য (প্রথম পর্ব, প্রথম খণ্ড)।' বিবিধার্থ-সংগ্রহে তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস ইত্যাদি পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথ আনন্দে ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়ে দিতেন। সুতরাং ঘোষিত উদ্দেশ্যের সার্থক রূপায়ণে পত্রিকাটি হয়েছিলো সিদ্ধকাম। সচিত্র 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে আরেকটি পত্র রাজেন্দ্রলাল সম্পাদনা করেন—'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্র 'যে উদ্দেশ্যে পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত।' এই পত্রটির পৃষ্ঠায়ও তাঁর বহুবিষয়ব্যাপিনী মননশীলতার স্বাক্ষর আছে। বিবিধার্থ ও রহস্য সন্দর্ভের ষষ্ঠ পর্ব পর্যন্ত সম্পাদনা করেন রাজেন্দ্রলাল।

বহুভাষাবিদ্ রাজেন্দ্রলালের প্রতিভা একচারিণী ছিলো না, —ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাঙলায় তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রচুর নিদর্শন আছে। একমাত্র বাঙলায় আত্মনিয়োগ করতে পারলে বাঙলা সাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধ হতো, সন্দেহ নেই। তাছাড়া রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ছড়িয়ে আছে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়—তাই সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেই সব রচনার সান্নিধ্য লাভ কঠিন। অক্ষয়কুমারও ছিলেন সাময়িকীর লেখক, কিন্তু তাঁর প্রায় সকল রচনাই গ্রন্থিত। রাজেন্দ্রলালের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাকৃত-ভূগোল' (১৮৫৪)—অনুষ্ঠান-প্রকরণে ভূগোলবেত্তার দৃষ্টিকোণে পৃথিবীর প্রকৃতাবস্থার আলোচনা আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শিল্পিক-দর্শনে' (১৮৬০) শিল্প-শাস্ত্রের (industrial science) আদ্যোপান্ত সমালোচনা করার চেষ্টা করা হয়নি—ঢাকাই বস্ত্র, রেশম, কাগজ, লবণ, সাবান ইত্যাদি কয়েকটি প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রস্তুত করণের সচিত্র বিবরণ মুদ্রিত হয়েছে। 'শিবাজীর চরিত্র' (১৮৬০) লেখকের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী যবনপ্রমর্দক মহারাষ্ট্রীয় বীরপ্রধানের জীবনবৃত্তান্ত। ইতিহাস সংক্রান্ত আরেকটি বইও রাজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন—'মেবারের রাজেতিবৃত্ত' (১৮৬১ ?)। ছোটদের ব্যাকরণ-শাস্ত্রের স্থূল তাৎপর্যের উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলালের 'ব্যাকরণ-প্রবেশ' (১৮৬২) রচিত। 'Prayer of St. Niersis Clajensis' বইটির সংস্কৃত ও বাঙলা অনুবাদ (১৮৬২) রাজেন্দ্রলাল প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলালের আর দুটি গ্রন্থ হচ্ছে—'পত্রকৌমুদী' (১৮৬৩) ও 'অশৌচ ব্যবস্থা' (১৮৭৩)। প্রথম বইটিতে নানা জনের কাছে পত্র লেখার আদর্শ সংকলিত। সকলের শেষে ১৮৫০-৫৮ সালের মধ্যে রাজেন্দ্রলালের তৈরি কয়েকটি বাঙলা মানচিত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে তিনি বাঙলা দেশে পথিকৃৎ। তাঁর সম্পাদনায় খান বারো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

রাজেন্দ্রলালের লিখিত গ্রন্থগুলির বিবরণ থেকে তাঁর বহু-বিষয়মুখিনতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই। ভূগোল থেকে বাঙলা ব্যাকরণের মানসিক দূরত্ব অনেকখানি। বিচিত্র জ্ঞান আয়ত্ত করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিলো। কিন্তু কোন বিষয়ই যাচাই না করে তিনি গ্রহণ করতেন না, অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিলো। ব্যবহারিক বিদ্যার প্রতি অনুরাগে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায়, ঐতিহাসিক কৌতূহলে, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় ও সাহিত্যজিজ্ঞাসায় তিনি সেকালে একমাত্র অক্ষয় কুমার দত্তের সঙ্গেই তুলনীয়। কিন্তু সর্বদিদৃক্ষু মননশীলতায় তিনি অক্ষয়কুমারকেও ছাড়িয়ে উঠেছিলেন, তাঁর জিজ্ঞাসার পরিধি ছিলো অধিকতর বিস্তৃত। কিন্তু তাঁর লেখা এত সহজ, সরল ও সুবোধ্য ছিলো যে তা থেকে তাঁর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার নয়, বিদ্যার কূটত্বও নয়—জ্ঞানগঙ্গার ঔদার্যই আভাষিত। তিনি আপন মনস্বিতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আকাঙ্ক্ষিত বাণী-বৈকুণ্ঠে।

বাঙলা সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের দান রসের দিক থেকে নয়, বিচারমুখী বিদ্যার অনুশীলনের দিক থেকে বিচার করতে হবে। তিনি প্রথম সচিত্র মাসিক সম্পাদনা করেছেন, আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত করেছেন—এসবের কথাও মনে রাখা সঙ্গত। বর্তমানে গদ্যপদ্যের আলোচনার ভূমিকায় আমরা কতগুলি সংশ্লিষ্ট সূত্র নির্ণয় করে থাকি এবং সেই সব সূত্রের আলোকে আলোচ্য গ্রন্থের স্বরূপ-বিচারে অগ্রসর হই। রাজেন্দ্রলাল এই অর্বাচীন পন্থা অনুসরণ করেছেন। তাঁর মূল সূত্রের নির্দেশে শুধু সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের চিন্তার ছাপই নেই, ইংরেজী সাহিত্যশাস্ত্রের প্রভাবও রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানদণ্ডের রদবদল আমাদের চোখে না পড়ে পারে না। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' একটি প্রহসন, তাই ব্যঙ্গাত্মক রচনার রূপরেখা নির্দেশ করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলালের মুখে শুনতে পাই—

'…কবিদিগের উদ্দেশ্য এই যে কাব্যামৃত দ্বারা জন-সমাজের তৃপ্তিসাধন করেন; পরন্তু সকল কবি তাহাতেই তৎপর নহেন; অনেকে দুরাচার দমনার্থে সাবক্ষেপ-বাক্যদ্বারা নানাবিধ ব্যঙ্গ-কাব্য রচনা করিয়া থাকেন। তাহাতে পাঠকদিগের প্রমোদ ও দুষ্টের দমন উভয়ই এককালে উপলব্ধ হয়। ইহা আশু বোধ হইতে পারে যে যাহারা সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে জলাঞ্জলি দিয়া দুষ্কর্ম্মে নিযুক্ত তাহারা কবির ব্যঞ্জনায় নিরস্ত হইবে ইহা সম্ভাব্য নহে; পরন্তু রাজবারা দেশ-প্রসিদ্ধ চাঁদ কবি কহিয়া গিয়াছেন যে "শত্রুর করবালা অপেক্ষা কবির বাক্যশেল সহস্র গুণ তীক্ষ্ণ।" যাহারা ভূমণ্ডলের সকল সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহারাও কাব্যে শ্লেষিত হইতে ভয়ার্ত্ত হয়। কবিদিগের গৌরবের এই এক প্রধান কারণ; এই নিমিত্তই অনেকে দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা প্রার্থনা করে।…যদিচ কবিভিন্ন এই অস্ত্রের ব্যবহার অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য পরন্তু কবিদিগের হস্তে ইহা সর্ব্বদাই পদ্যরূপে প্রকটিত হয় এমত নহে, কখন গদ্যে ও কখন বা পদ্যে ইহার বিকাশ দেখা যায়। অপর ইহার সম্যক্ ফললাভের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে নাটক-রূপে পরিণত করত তাহার অভিনয়ে দুরাত্মাদিগের বিশেষ তিরস্কার করিয়া থাকেন। সর্ব্বকালেই এরূপ রচনার প্রচার আছে।…অধুনা নাটকের সম্যক সমাদর হইতেছে; সকলেই নাটক দর্শনে উৎকণ্ঠ; অতএব বর্ত্তমানের কুপ্রবৃত্তি সকল নাটক দ্বারা সুন্দর তিরস্কৃত হইতে পারে, এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামে একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন প্রকটিত করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য নব বাবুদিগের পানাসক্তির নিগঞ্জন; এবং তাহা প্রকৃষ্টরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে…।'

রাজেন্দ্রলালের এই সমালোচনা উচ্ছ্বাসমূলক নয়, যুক্তিমূলক —ভাবধর্মী নয়, বিশ্লেষণধর্মী। ব্যঙ্গমূলক রচনার সামাজিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য এখানে সুন্দরভাবে আলোচিত। দ্বিতীয়তঃ

ভাষাও আলোচনার উপযোগী—'সাবক্ষেপ', 'নিগঞ্জন' ইত্যাদি দু'একটি অধুনা অপ্রচলিত শব্দ ছাড়া বাক্যবিন্যাসে জটিলতা কিছু নেই। আসল কথা, বিষয়ের গভীরে অন্তর্লীনতা থেকে এ রচনার জন্ম, তাই ভাষার চারিত্রিকতায় সততা ও ঋজুতার সুস্পষ্ট প্রকাশ।

ভাষাতত্ত্ব জটিল বিষয়, কিন্তু তার আলোচনায়ও রাজেন্দ্রলালের প্রাঞ্জল ভাষারীতির প্রমাণ পাওয়া যায়—

'মিশরদেশে প্রাচীনকালে এক এক অভিপ্রায়ের বোধার্থে এক একটি জীব বা অন্য কোন পদার্থের মূর্ত্তি চিত্রিত হইত; যথা গমনকার্য্যের বোধার্থে বাজ-পক্ষী, নিদ্রার জ্ঞাপনার্থে প্রস্তর-খণ্ড ইত্যাদি। এই প্রকার চিত্রলিপি দ্বারা অভিপ্রায় সুস্পষ্ট বোধ হইত না, এবং ইহার সাধারণ রূপ প্রচলিত হওয়া দুষ্কর ছিল। ইহার পরিবর্ত্তে চীনদেশ প্রত্যেক শব্দের নিমিত্ত এক এক একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে, সুতরাং তাহাদিগের অভিধানে যত সংখ্যক শব্দ আছে তাহাদিগের ততগুলি চিহ্ন কল্পিত করিতে হইয়াছে। তাহাদিগের পুস্তক পাঠ করিতে হইলে ঐ সমস্ত চিহ্নগুলি অভ্যস্ত করিতে হয়। এই কাঠিন্যের নিবারণার্থে অপর সকল প্রাচীন-সভ্য জাতীয়েরা বর্ণের সৃষ্টি করেন; অর্থাৎ প্রত্যেক অর্থবোধক শব্দের চিহ্ন কল্পিত না করিয়া কএকটি নিরর্থক এক প্রয়াসে উচ্চার্য্য রূঢ়ি শব্দের চিহ্ন কল্পিত করেন।'

—ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা, বিবিধার্থ, ১৮৫৮-৫৯। রাজেন্দ্র-লালের ভাষার এই বোধগম্যতা সচেতন মনের সৃষ্টি। প্রথম সংখ্যা বিবিধার্থে পত্রের উদ্দেশ্য-বর্ণনায় তার ইঙ্গিত আছে। 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'—এই প্রবাদবচনের সংস্কৃত রূপ 'অন্ধমাতুলন্যায়' হাস্যকর, সন্দেহ নেই; কিন্তু সমগ্র-ভাবে বিচার করলে তাঁর রচনারীতির প্রশংসাই করতে হয়। কেউ কেউ বলেন, রাজেন্দ্রলালের ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও সংস্কৃত কলেজের লেখকগোষ্ঠীর ভাষারীতি যে

অর্থে যে কারণে সংস্কৃত-ঘেঁষা, সেই অর্থে সেই কারণে এঁর ভাষাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা বলা যায় না। হয়তো স্থান বিশেষে অক্ষয়কুমারের প্রভাব পড়েছে এবং চিন্তা ও যুক্তির সমধর্মিতার জন্য তা পড়াই স্বাভাবিক, তবু রাজেন্দ্রলালের লেখার আশ্চর্য স্বচ্ছতা অ-তর্কিত। ভাবের চেয়ে ভাবনার আধিপত্যের জন্য তাঁর লেখা আমাদের রসিক মনকে নয়, বোধ ও বুদ্ধিকে আলোড়িত করে মাত্র। তবু তা সুপাঠ্য। যেমন— 'ইমিসা নগরে যাত্রাকালীন ইহারা পথিমধ্যে দেখিল, এক খচ্চর দৌড়াইয়া আসিতেছে, এবং তাহার স্বামী চীৎকার করিয়া কহিতেছে "মহাশয়েরা আমার খচ্চরটিকে ধরুন।" বণিক স্বভাবতঃ সরল, খচ্চর-স্বামীর বাক্য শ্রবণে তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল ···।'

'খচ্চর-স্বামী' ইচ্ছাকৃত প্রয়োগ কিনা জানিনে, তবে একালের পাঠক যদি এতে একটু ব্যঙ্গের রস ও কষ আস্বাদন করে, তবে সে উপরি-পাওনা গ্রহণ করতে আপত্তি কি ?

॥ ৪ ॥

হিন্দুকলেজে সহপাঠী ছিলেন সেকালের তিনজন মনস্বী পুরুষ—মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। একই বিদ্যাভবনে তাঁরা পড়েছেন, অথচ একই ভাব ও ভাবনা তাঁদের মধ্যে দেখা দেয়নি। মধুসূদন ও ভূদেব যেন দুই বিপরীত বৃত্তকান্তি—এক কোটিতে উচ্ছ্বাসমূলক বিজাতীয়তা, অন্য কোটিতে সংস্কারধর্মী রক্ষণশীলতা। এই দুয়ের মাঝামাঝি ছিলেন রাজনারায়ণ—বিচারবুদ্ধির স্বত্বাধিকারী, মধ্যপন্থার অভিযাত্রী। এই তিনটি জীবনবৃত্ত যেন তখনকার দিনের বাঙালীর মানসপ্রবণতার ত্রিধা-প্রতীক।

আঠারো শ' ছাব্বিশে চব্বিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে

রাজনারায়ণের জন্ম। বসু পরিবার গ্রামে বাস করেও ঠিক 'গ্রাম্য' ছিলো না। তাঁর বড়ো ঠাকুরদা সামাজিক দলাদলি করতেন, অথচ ঢিলে পায়জামা পরতেন। আর রাজনারায়ণের নিজের ঠাকুরদা মাথায় মধ্যমনারায়ণ তেল মেখে দুপুরের রোদে গ্রামের পুষ্করিণী কাটার কাজ দেখাশুনো করতেন। পিতা নন্দকিশোর ছিলেন রামমোহন রায়ের স্কুলের ছাত্র, তাঁর প্রাথমিক শিষ্য ও সেক্রেটারী। তিনি প্রথম যুগের ব্রাহ্মদের মতো বেদান্তবাদী, কিন্তু লৌকিক আচার মেনে চলা উচিত মনে করতেন। সুতরাং রাজনারায়ণের পারিবারিক পরিবেশ বড়ো হওয়ার পক্ষে প্রতিকূল ছিলো না।

সাতবছর বয়সে রাজনারায়ণ কলকাতায় আসেন, এক গুরু মশায়ের পাঠশালা ঘুরে ভর্তি হলেন শম্ভু মাষ্টারের ইংরেজী স্কুলে। তারপর হেয়ার সাহেবের স্কুলে তাঁর সত্যিকারের লেখাপড়ার শুরু। সাহেব নিজে ছেলেদের তদারক করতেন, দরকার হলে দু' এক ঘা বেত মারতে দ্বিধা করতেন না। গল্পাকারে এর লিখিত প্রতিবাদ করে রাজনারায়ণ একদিন হেয়ারের কাছে মার খেয়েছিলেন। শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায় তাঁর মনে জ্ঞানের ইচ্ছা ও অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে। এবং তাঁর কাছেই তিনি প্রথম সংশয়বাদের (Scepticism) দীক্ষা পান। আর একজন আচার্য উমাচরণ মিত্র কাব্য-সাহিত্যে রাজনারায়ণের অনুরাগ জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু গণিতশাস্ত্রকে ভয় করতেন তিনি। এই হেয়ার স্কুলে পড়বার সময়ই তিনি র‍্যামজের 'ট্র্যাভেলস্ অফ সাইরাস' পড়ে হিন্দুধর্মকে রূপকমাত্র মনে করতে আরম্ভ করেন (যেমন মিশরী পুরোহিতরা সেখানকার পুরাণগুলিকে রূপক মনে করতো)।

চল্লিশ সালে রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজে চলে আসেন। সেখানে যেমন স্কুল বিভাগের পরীক্ষায়, তেমনি কলেজ বিভাগের পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি ও পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি সর্বোত্তম ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন বলেই পুরাবৃত্ত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখে প্রশংসিত

হন—তাঁর লেখাটি হয়েছিলো 'astonishing for their fullness and general accuracy'। গিবন ও মেকলের ইতিহাস, স্পেন্সার, টমসন ও বায়রণের কবিতা ছিলো তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তখন তিনি ভবিষ্যতে জাতীয় ও ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধির বিজ্ঞান ও সর্বজনীন ইতিহাস লেখার স্বপ্নও দেখতেন। অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের সেক্সপীয়ার পাঠন তাঁর মনোহরণ করেছিলো। আর কার সাহেবের বিদ্যাবত্তায় তাঁর অনুরাগের অন্ত ছিলো না। আসল কথা, এই হিন্দু কলেজের চত্বরেই রাজনারায়ণ সংগ্রহ করেছিলেন বড়ো হওয়ার উপকরণ, চিন্তা ও জ্ঞানানুশীলনের প্রবণতা। আর এখানেই তাঁর ধর্মমতেরও পরিবর্তন ঘটে। স্কুলে দুর্গাচরণ যে সংশয়বাদের দীক্ষা দেন, হিন্দু কলেজের অনুকূল পরিবেশে তা-ই শাখা-প্রশাখা মেলতে শুরু করে। সংশয়বাদী অধ্যাপক রীজের প্রভাব, র‍্যামজের 'ট্র্যাভেলস্ অফ সাইরাস' পাঠ ও হিউমের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসায় বিপর্যয় আনে। কিন্তু অল্প বয়সেই দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন (১৮৪৬)। কিন্তু তাঁর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিঃসংশয় ছিলো না। রাম-মোহনের 'Precepts of Jesus' পড়ে তিনি একদা মনে মনে ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টীয়ান হন, গিবনের ইতিহাস পড়ে—কিছুটা বা খৃষ্টানদের বিরোধিতা করার মানসে তিনি মুসলমান ধর্মেও বিশ্বাসী হন। তবে এসবই হচ্ছে, ধর্মের কাদামাটি নিয়ে তাঁর বালকোচিত মনের খেলা। তবে ধর্মের পুরনো পথে তাঁর অনাগ্রহ অনস্বীকার্য এবং সেখানেই তিনি ছিলেন নতুন যুগের মানুষ।

রাজনারায়ণের কর্মজীবন ঘটনাবহুল—বিশেষ করে ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন। ছেচল্লিশে তত্ত্ববোধিনী সভা তাঁকে উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করার কাজে মাসিক যাট টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত তিনি জানতেন, কিন্তু বেশি নয়—তাই দেবেন্দ্রনাথের কাছে তাঁকে পড়তে হয়েছিলো উপনিষদ। ব্রাহ্মসমাজেও রাজনারায়ণের বক্তৃতার কাজ শুরু

হলো—সমাজে ও ধর্মে প্রীতিভাব সঞ্চারের কৃতিত্ব তিনি দাবি করতে পারেন। তিনি ইংরেজী জানতেন ভালো (দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'ইংরেজী খাঁ' বলতেন), কিছুদিন ফারসীও পড়েছিলেন একজন মুন্সীর কাছে। রাজনারায়ণ আটচল্লিশে ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ের কাজ ছেড়ে উনপঞ্চাশে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরেজী শিক্ষক হন, বছর দুই পরে বদলি হন মেদিনীপুরের জেলা স্কুলে। এই মেদিনীপুর ছিলো তাঁর জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র, পনের বছরের ধরে এখানকার ইতিবৃত্তের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিলো ঘনিষ্ঠ। শিক্ষাব্রতের সুযোগে কল্যাণব্রতকে তিনি জীবনে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন, মেদিনীপুরের মর্মকোষে সঞ্চার করেছিলেন প্রাণ। জাতীয়তার মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতাদেরও তিনি অন্যতম। রাজনারায়ণ তাঁর নিজের কাজের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিয়েছেন এইভাবে—

(১) ব্রাহ্মসমাজে প্রেমের ভাব প্রবেশ করানো ও ব্রাহ্ম-ধর্মের সপ্তলক্ষণ নির্দেশক বক্তৃতা।

(২) ধর্মবিজ্ঞানের সৃষ্টি—ধর্মতত্ত্বদীপিকা।

(৩) 'Grand father of Nationality'—একজন আমাকে বলিয়াছিলেন। Hindu Revival "হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ" হইতে।

(৪) সমাজ-সংস্কার—বিধবাবিবাহ নিজ পরিবারে প্রবর্তন।

(৫) আমা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্রের দ্বারা হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন।

(৬) College Reunion.

(৭) বিদ্বজ্জনসমাগম।

সুতরাং বাঙলা দেশের উনিশ শতকী নব জাগরণের অন্যতম নায়ক রাজনারায়ণ। ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবনে দেবেন্দ্রনাথের সহমর্মী ও সহকর্মী ছিলেন তিনি। একদিকে সংশয়বাদ থেকে ব্রহ্মবাদে তাঁর উত্তরণ—বিজাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির গভীরে

প্রবেশ ('I do not know if it will sound strange to you that your pamphlets strike me, if I may say so, as being more English, more European in tone than other Brahmo writings I have read.—Elizabeth Sharpe.), অন্যদিকে অক্ষয়কুমারের বেদ-বেদান্তের বিরোধিতায় মর্মবেদনা প্রকাশ ও শাস্ত্রবাদী হিন্দুর আদর্শ গ্রহণ ('হিন্দুধর্মের সারমর্ম' ও 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' দ্রষ্টব্য। স্মরণীয় মিস শার্পের উক্তি: you are wishing to adhere more to Hindu life than some others do.)। সুতরাং রাজনারায়ণ সেই সামাজিক ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনে সত্যিকারের মধ্যপন্থী। তাঁর ঋষিত্ব সত্যের ধ্যানে, মনুষ্যত্ব কল্যাণব্রতে, মনস্বিতা স্থির প্রজ্ঞায়; সহজ রসিকতায় তিনি কাছের মানুষ।

রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথের অনুচারী—শুধু ব্রাহ্মসমাজে নন, জীবনধর্মেও। কিন্তু মহর্ষির সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও ছিলো। দেবেন্দ্রনাথ যেখানে ভক্তিপ্রাবল্যে অহংলোপের প্রয়াসী, সেখানে সত্যানুরাগের আন্তরিকতা নিয়েও রাজনারায়ণ আত্মসচেতন। একে নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালবাসতেন, অন্যে নিজেকে তুলে ধরতে দ্বিধা করতেন না। দু'জনের আত্মচরিত থেকে অন্ততঃ তা-ই মনে হয়। এই পার্থক্যের ছায়াপাত তাঁদের স্বরচিত জীবনচরিতে ঘটেছে। উপলব্ধির নিবিড়তায় দেবেন্দ্রনাথের রচনায় যে স্বাদ ও সৌরভ, রাজনারায়ণের লেখায় সেই সব সাহিত্যগুণের অসদ্ভাব। উচ্চতম অনুভূতির ক্ষেত্রে সত্য, শিব ও সুন্দর একাকার হয়ে যায় —তাই রচনায় ঝলমল করে উঠে একটা নিবিড় অনুভবের লাবণ্য, কিন্তু রাজনারায়ণের আত্মচরিতে স্বয়ংবৃত্ত অহঙ্কার সত্যানুভূতির লাবণ্য ছড়িয়ে পড়তে দেয়নি। আগে অনেকবার বলেছি, এযুগের গদ্যচর্চায় রসের সন্ধান দুরাশা মাত্র, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকের উপলব্ধি আপন চরমতায় আপনি অমৃত হয়ে উঠেছে। এবং সেই অমৃত রসের মতোই ব্রহ্মস্বাদসহোদর। কিন্তু ঋষি

রাজনারায়ণ অনেক ক্ষেত্রেই সেই রসামৃত সঞ্চারের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব এনেছেন বলে তিনি যেখানে ঘোষণা করছেন—সেখানে পাঠকের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়ে পারে না। আসল কথা, রাজনারায়ণের 'আত্মচরিত' (১৮৮২ ? মুদ্রিত ১৯০৯) রচনাবৈগুণ্যে ও লেখকের আত্মক্ষেপের (self-projection) জন্য সুখপাঠ্য হয়ে ওঠেনি।

'বৃদ্ধহিন্দুর আশা, (১৮৮৭), 'তাম্বুলোপহার' (১৮৮৬), 'সারমর্ম' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম খণ্ড ১৮৮২), 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮), 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' (১৮৭৬), 'সে কাল আর এ কাল' (১৮৭৪), 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩), 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' (১ম ভাগ—১৮৬৬, দ্বিতীয় ভাগ—১৮৬৭), 'ব্রহ্মসাধন' (১৮৬৫), 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' (১ম ভাগ—১৮৫৫, দ্বিতীয় ভাগ—১৮৭০) ইত্যাদি গ্রন্থগুলির রচনা বা মুদ্রণের তারিখ থেকে বোঝা যায়, বঙ্কিমের প্রতিভার আলোক পাওয়ার আগে রাজনারায়ণের গদ্যচর্চার পরিমাণ খুবই অল্প। ফলে প্রাঞ্জলতার দিক থেকে তাঁর লেখার ঐতিহাসিক মূল্য পরবর্তী কালের বাঙলা গদ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত। তবে স্বীকার করি, লেখার ভাব-ভঙ্গি লেখক-মাত্রেরই দেহমনের কম-বেশি নিত্যসঙ্গী। এবং সে কারণেই বহুকালব্যাপী বিচিত্র রচনাবলীর মধ্যেও একটা যোগসূত্র থাকে। তবু কালানুক্রমে ভাষার হাওয়াবদল বা রূপবদল অনস্বীকার্য সত্য, চারপাশে আর সকলের লেখায় নতুন ঢঙ এলে পুরনো আমলের লেখকের ঢঙেও অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে। রাজনারায়ণের রচনার নিদর্শন উদ্ধৃত করলেই কথাটা পরিষ্কার হবে—

(১) স্থানে স্থানে নবীন দূর্ব্বাময় ক্ষেত্র রমণীয় শ্যামবর্ণ দ্বারা চক্ষুদ্বয় স্নিগ্ধ করিয়া তৃপ্ত করিতেছে। কুত্রাপি বা নির্ম্মল সরোবর-স্থিত অরবিন্দ রূপ লাবণ্য দ্বারা চিত্ত হরণ করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীময় এই সকল বিস্তীর্ণ সুখের দ্বারাও পরমেশ্বরের কৃপা

তাদৃশ ব্যক্ত হয় না, যাদৃশ আমাদিগের দুঃখাবস্থাতে তাহার উপলব্ধি হয়। যখন চতুর্দ্দিক হইতে বিপদের দ্বারা আবৃত হই—যখন সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করে, তখন তিনি পরিত্যাগ করেন না…।

—ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা। ১৮৪৬।

(২) প্রীতি সুখের সার, তাহা আমাদিগের চিত্তকে পরিত্যাগ করিলে সকলই নীরস বোধ হয়, আমরা জীবনে যেন মৃতপ্রায় হইয়া থাকি। যেমন রসনা-পরিতৃপ্তি জন্য বিবিধ অন্ন পান আছে, এবং জ্ঞানের পরিতৃপ্তি জন্য জ্ঞানের বিবিধ বিষয়ীভূত পদার্থ আছে, তেমনি প্রীতিবৃত্তির চরিতার্থতা জন্য নানাবিধ পদার্থ আছে। পিতার প্রতি প্রীতি একরূপ, সন্তানের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ…।

—ভাগলপুরে ব্রহ্মোপাসনার বক্তৃতা। ১৭৮৯ শক।

(৩) আত্মপ্রত্যয় মূল প্রত্যয়। সহজ-জ্ঞান দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অন্য কোন প্রকারে লভনীয় নহে, তাহাই আমাদিগের সকল জ্ঞানের পত্তনভূমি। বৃক্ষের অস্তিত্ব জ্ঞান আমরা কোন সহজ জ্ঞান দ্বারা লাভ করি। আমাদের সহজ জ্ঞান রূপ উপায় না থাকিলে যুক্তি অথবা কল্পনা দ্বারা বৃক্ষের অস্তিত্ব জ্ঞান লাভ করিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না।

—ধর্মতত্ত্বদীপিকা। প্রথম ভাগ। ১৮৬৬

(৪) ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম কিন্তু তা বলিয়া কি তাহাকে আর হিন্দুধর্ম বলা যাইবে না? রামচন্দ্র নামে একটি লোককে পাঁচ বৎসরের সময় দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তা বলিয়া সে কি আর সেই রামচন্দ্র নহে?

—হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। ১৮৭৩।

(৫) ভট্টাচার্য্যদিগের অবৈষয়িকতার আর একটি সুন্দর গল্প আছে। একজন ভট্টাচার্য্য পুথি পড়িতেছিলেন; পড়িতে

পড়িতে অনেক রাত্রি হইলে তাঁহার তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি টীকা লইয়া বাটীর বাহির হইলেন। দেখিলেন দূরে একটা পাঁজা পুড়িতেছে। তিনি আস্তে আস্তে সেই স্থানে টীকা ধরাইতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঘরে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

—সে কাল আর এ কাল। ১৮৭৪।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলি একই লেখকের রচনা বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা হয় না। বাচনভঙ্গি ও বক্তব্য পরিবেশনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। তবু কালক্রমে ভাষা সরল হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, হয়েছে আটপৌরে। যেখানে গল্পের আমেজ আছে সেখানে রাজনারায়ণের ভাষার নিরাভরণ সৌন্দর্য আমাদের চমৎকৃত করে, 'সে কাল আর এ কালের' অংশটিকে তো বিশ শতকের লেখার মর্যাদা দেওয়া যায়। গ্রন্থটি রাজনারায়ণের শ্রেষ্ঠ রচনা। ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা, সংবেদনশীল চিত্তধর্মের সজীবতা, পরিহাসকুশল দৃষ্টিভঙ্গির সরসতা ও অকপট মতামতের স্বাচ্ছন্দ্যে লেখাটি মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। এর রচনারীতিতে যেমন একটা লঘুছন্দ আছে, রসিকতার আমেজ আছে (স্মরণ করুন রাধাকান্ত দেবের ইংরেজী মাষ্টারের প্রসঙ্গ, সে কালের ভট্টাচার্যের গল্প ও ইংরেজী বাঙলা মিশিয়ে ছড়া রচনার উদাহরণ এবং এমনিতর আরও অনেক কথা), তেমনি আছে সমাজচিন্তা প্রকাশের অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর ভঙ্গি। সাহিত্য হিসেবেও 'সেকাল আর একাল' পাঠ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

আর একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেকালের বড়ো মানুষেরা নানা কারণেই বড়ো ছিলেন—বিশেষভাবে তাঁদের চরিত্র হিতব্রতে আমাদের কাছে মহনীয়। কিন্তু তাঁদের মনোধর্মের স্থিতিস্থাপকতায়ও (elasticity) আশ্চর্য হতে হয়; উজ্জ্বল জ্ঞানের প্রদীপ নিয়ে যিনি ভগবৎ-জিজ্ঞাসার গহন গভীর প্রদেশে প্রবেশ করেছেন, তিনিই আবার অবলীলাক্রমে

লঘু মনের স্বচ্ছন্দ সংক্রমণে উদ্যোগী হয়েছেন। মনোজীবনের এই ব্যাপ্তি ও দিগন্তপ্রসারী বিস্তার রাজনারায়ণের মধ্যেও দেখতে পাই। বছর কুড়ি বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন—এটা যেমন বিস্ময়কর প্রবীণতা, তেমনি তাঁর ছাপ্পান্ন বছর বয়সে প্রকাশিত 'জেঠামো' প্রবন্ধে আছে যৌবনসুলভ আশ্চর্য চপলতা। যেমন—

'জেঠা রিফর্‌মেরা সহরের বড়ো বড়ো সভায় রিফর্‌মেশন ফলান। কথা শুনিয়া বোধ হয় তাঁহারা রাতারাতি ভারতবর্ষকে বিলাত করিয়া তুলিবেন কিন্তু কাজে সব ফাঁকি।...তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন, স্ত্রীলোকের দুঃখে তাঁহাদিগের চক্ষে জল ধরেনা, কিন্তু তাঁহাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকের বর্ণ পরিচয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ!...জেঠা রিফর্‌মরদের রিফর্‌মেশন প্রধানতঃ বোতলেই পর্য্যাপ্ত হয়।...ইঁহারা সবজান্তা! এমন তত্ত্ব নাই যাহা উঁহারা অবগত নহেন। ইস্তক "কানাইয়ের "ঠেলা" হইতে নাগাত "দণ্ডগ্রহণ" পর্য্যন্ত এমন বিষয় নাই যাহাতে ব্যাপকতা না করিতে পারেন। আমরা এই শ্রেণীভুক্ত জেঠা।'

—জেঠামো, বিবিধপ্রবন্ধ প্রথম খণ্ড। ১৮৮২।

রাজনারায়ণ রসিকতা করতে গিয়ে নিজেকেও বাদ দেননি—ফলে লেখাটি নির্মম ব্যঙ্গ না হয়ে নির্মল পরিহাস হয়ে উঠেছে। নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে যিনি রসিকতা করেন—তাঁর 'জেঠামো' সহ্য করলে ক্ষতি নেই। রাজনারায়ণের 'আশ্চর্য স্বপ্ন' (বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত) উদ্ভট কল্পনায় রসাল ও উপাদেয়। স্বাধীন বাঙলাদেশের ইংল্যাণ্ড জয় ও ইংরেজদের বাঙালিয়ানা এদেশে ইংরেজ শাসনেরই রূপকচিত্র বা বক্রভাষ্য মাত্র। রাজনারায়ণের এই স্বপ্নবিচরণের কাহিনী রসিকচিত্তের ছোঁয়ায় সাহিত্য হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দূরদর্শন যদি এতে থেকেও থাকে, তবু।

॥ ৫ ॥

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারের কাছে ভূদেব মুখোপাধ্যায় একটা সমস্যা। সে সমস্যা তাঁর মনস্বিতা নিয়ে নয়, তাঁর সাহিত্যের সত্যমূল্য নিয়ে। আজকের পাঠকও তাঁকে বড়ো মানুষ বলে মেনে নেয়, অথচ তাঁর লেখায় মনের ঠাঁই খুঁজে পায় না। পুরনো কালের কাছেও নতুন কালের একটা প্রত্যাশা আছে—সেকালের ভাবনায় একালের স্বপ্ন কতখানি জেগেছে, তা জানার আগ্রহে আমরা পেছনের দিকে তাকাই। বর্তমান মাত্রেই লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যতের ভ্রূণ-সম্ভাবনা, এতো বৈজ্ঞানিক সত্য ; অথচ অতীত যদি সেই প্রত্যাশা ব্যর্থ করে দেয়, তবে ইতিহাসের যোগসূত্র যায় হারিয়ে। ভূদেব বর্তমান কালকে নিয়ে বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন, ভবিষ্যতের জন্য কিছু রেখে যাওয়ার কথা ভাবেন নি, যুগিয়ে যান নি আগামী দিনের জনসম্রাটের আগাম খাজনা। ভবিষ্যংকে বঞ্চনা করলে ভবিষ্যংও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। তাই ভূদেব আজ এক বিস্মৃত অতীত, অতীতের এক নিষ্করুণ বিস্মৃতি।

কেউ বলেন, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি বলেই আজ ভূদেবকে অস্বীকার করেছে ; কেউ বা তাতে কোন গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। এই দুই মতই অশ্রদ্ধেয়। আসল কথা, রামমোহনের যে ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি ছিলো, ভূদেবের তা ছিলো না ; বিদ্যাসাগর আপন হৃদয়ে যা অনুভব করেছিলেন, ভূদেবের অনুভব ততদূর পৌঁছোয় নি। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারলে এত বড় ভুল তিনি করতেন না। আগে বলেছি, ইয়ং বেঙ্গলের ইতিহাস হচ্ছে সমাজবশ্যতা ও পরিবারতন্ত্রের হাত থেকে ব্যক্তির প্রথম মুক্তির ইতিহাস। এই ব্যক্তিতন্ত্রের কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ইয়ং বেঙ্গলের

উত্তরসূরী ভূদেব পরিবারতন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গেলেন কোন্ সাহসে? সে যুগের উচ্চশিক্ষার দৌলতে যখন সকল রকমের অনাচার করাটাই আচার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তখন শাস্ত্রসম্মত বা অভ্যস্ত আচারের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাওয়া দুঃসাহসের কাজ। আমার তো মনে হয়, ভূদেবের মধ্যে ছিলো একটা জেদ—চাণক্যের জেদ—স্রোতের মুখ ফিরিয়ে দিতে চাওয়ার ব্রাহ্মণ্য অহমিকা। একান্নবর্তী পরিবার যখন ছত্রভঙ্গ, আচার যখন মেয়েলিপনার নামান্তর, জনতার দাপটে যখন বর্ণ-বিন্যস্ত সমাজের নাভিশ্বাস—তখন ভূদেবের ভুল ধরা না পড়ে উপায় নেই। সেই সঙ্গে তাঁর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যের যুগানুগ মূল্য স্বীকার করে নিতে হবে। ভূদেবের রক্ষণশীলতা নির্বিচার বিজাতীয়তার প্রতিষেধক এবং সেই অর্থেই মূল্যবান। নিজের মূল্য নিয়ে তিনি পরের যুগে এসে ভিড়তে পারেন নি, কিন্তু নিজের যুগে দাঁড়িয়ে পরের মূল্য যাচাই করে দিয়েছিলেন। জাতি, বিশেষ করে নব্যশিক্ষিতের দল যে পথে চলেছিলো, তা আঘাটার পথ হয়ে ওঠেনি ভূদেবের মতো ঐতিহ্যবাদীর অঙ্কুশ-তাড়না ছিলো বলে। তাই তিনি ইন্দ্রের ঐরাবত, জাতির প্রাণগঙ্গার উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহে ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ। তিনি কখনও অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ ইত্যাদির মতো সংশয়বাদের শিকার হননি।

ভূদেবের সাহিত্যপাঠের এ হচ্ছে ভূমিকা। কিন্তু ব্যক্তিটিকেও চিনে নেওয়া দরকার, তা না হলে সে-ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশ্বনাথ তর্কভূষণের একমাত্র পুত্র ভূদেব—ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ আর কাব্য থেকে শুরু করে পুরাণ, তন্ত্র ও দর্শন অবধি সকল বিদ্যায় সুপণ্ডিতের উপযুক্ত বংশধর। নয় বছর বয়সে (জন্ম—১৮২৭) সংস্কৃত কলেজে তাঁর শিক্ষার আরম্ভ, কিন্তু সাহিত্য-শ্রেণীতে উঠে তিনি ইংরেজী শেখার জন্য ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি, নবীনমাধব আর ভোলানাথের স্কুল ঘুরে বেড়ালেন কিছুদিন। অবশেষে তের বছরের ভূদেবকে দেখা গেলো হিন্দু কলেজের সপ্তম

শ্রেণীতে। সহপাঠী মধুসূদন কবিত্বশক্তি আর সাহেবিয়ানায় নাম কিনলেন, রাজনারায়ণও খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় স্থান পেলেন ভাল ছাত্র ও ইংরাজী প্রবন্ধ রচয়িতা হিসেবে—কিন্তু ভূদেবও সামান্য হয়ে রইলেন না। সিনিয়ার বৃত্তি অর্জনে তাঁর কৃতিত্ব ছিলো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কৃতিত্ব তাঁর জিজ্ঞাসু মনের আত্ম-স্থতায়, চরিত্রের অবিচলতায় নিহিত। হিন্দু কলেজের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে পায়ের তলার মাটি খুঁজে নেওয়া কম বড়ো কথা নয়। পৃথিবীর আকার নিয়ে শিক্ষকের রসিকতা ও পিতার কাছে জেনে নিয়ে ভূদেবের সংযত প্রতিবাদ তাঁর জীবনের ঠিকুজী হিসেবে স্মরণীয়। মধুসূদনের তিনি অন্তরঙ্গ ছিলেন, অথচ অনু-কারক ছিলেন না; রাজনায়ণের বন্ধুত্ব তিনি স্বীকার করেছেন, অথচ অস্বীকার করেছেন বন্ধুর আদর্শ। এই ধরণের একটী স্বধর্মী মানুষ ছিলেন ভূদেব, এই হলো তাঁর সুস্থির মনের চরিত্র।

প্রায় সাড়ে ছয় বছর হিন্দু কলেজে পড়াশুনো করে ভূদেব সাহিত্য, বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে কৃতবিদ্য হলেন, সাধারণ জ্ঞান অর্জন করলেন অনেক। তারপর হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হলো। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের স্কুলে পড়াতে গিয়েও মহর্ষির প্রভাব এড়িয়ে গেছেন তিনি। সাতচল্লিশে তিনি 'চন্দননগর সেমিনারী' প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে শিক্ষকতা করতে অগ্রসর হলেন। অবশেষে তাঁকে দেখতে পাই (১৮৪৮) সরকারী শিক্ষাবিভাগে—কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজীর দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ থেকে কাজ শুরু করে আপন যোগ্যতায় লেঃ গভর্ণরের কাউন্সিলের সদস্যপদ অর্জন করলেন। শিক্ষাবিভাগের নানা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যে সব চিঠিপত্র ও রিপোর্ট লিখে রেখে গেছেন তাতে তাঁর বিদ্যামুখিন মননশীলতার স্বাক্ষর আছে। শুধু শিক্ষা-কমিশনের মূল্যবান স্মারক-লিপি প্রস্তুত করণে নয়, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে 'জাতীয় ভাষা' হিন্দী প্রচারে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা শ্লাঘার কথা। সেখানকার অধিবাসীরা সঙ্গীতে ও পদক ঘোষণায়

তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দিতেও ভোলে নি। চুঁচুড়ার 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' ও 'বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ড' ভূদেবের কর্মবহুল জীবনের স্বর্ণ-ভূষণ।

সাময়িক পত্র সম্পাদনেও ভূদেব অবিস্মরণীয়—'শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার' (১২৭১ সাল) তার প্রথম নিদর্শন। তিনি প্রথম সংখ্যায় বলেছেন—'যে সকল দেশে বিদ্যাচর্চার বাহুল্য, এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্বত্রই শিক্ষা-প্রণালী প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইয়া থাকে। বাঙলা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। যাঁহাদের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদি তাহারা সকলে অথবা তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অগ্রীম মূল্য প্রেরণ করেন, তবে বুঝিব যে, দেশ মধ্যে যাহাতে এমত একখানি কাগজ চলে, দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে…।' তাঁর সংবাদসার প্রচারের লক্ষ্য হলো জনশিক্ষার প্রসার। জার্মান পণ্ডিতের মতো তিনিও মনে করতেন, শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য। তারপর আঠারো শ আটষট্টিতে ভূদেব 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহের' সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি একটি দল-নিরপেক্ষ শিক্ষাপত্র হিসেবে একে সার্থক করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ভূদেব শুধু সম্পাদক ছিলেন না, নিয়মিত লেখকও ছিলেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ,' 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) ইত্যাদিতে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই পত্রিকাটিতে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সে কালের আরও অনেকের ন্যায় ভূদেবের মনীষাও অনেকটা সাময়িক পত্রের ছত্রচ্ছায়ায় বিকশিত।

ভূদেব খান পনের বই রচনা করে গেছেন—তাতে রসের খোরাক না থাক, চিন্তার খোরাক আছে। অক্ষয়কুমার ও রাজেন্দ্রলালের মতো তিনিও সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মতোই

তাঁর লেখাও কখনও সংবাদ-সাহিত্য (Journalistic Literature) হয়ে ওঠেনি। দৈনন্দিনতার মধ্যে একটা অগভীরতা আছে, সাংবাদিকের দৃষ্টি সেই অগভীর দৈনন্দিনতার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বলেই তাঁদের লেখা স্থায়িত্ব পায় না। কিন্তু ভূদেবের রচনা সাংবাদিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত। এডিসন ও ষ্টীলের সঙ্গে এদিকে থেকে তাঁকে তুলনা করা যেতে পারে। আমরা জানি—'their names have been associated in a literary and moral undertaking too significant, too closely bound up with the social needs of the time....'। ভূদেবের সম্বন্ধেও একথা সত্য। তাছাড়া তাঁরা স্পেক্টেটারকে যেমন শুধু সংবাদের কাগজ করতে চাননি, তেমনি ভূদেবেরও উদ্দেশ্য ছিলো তাঁর সম্পাদিত কাগজগুলিকে চিন্তাক্ষেত্র করে তোলা। এই চিন্তার অনুশীলনের দিক থেকেই তাঁর ভাষাচর্চার সার্থকতা বিচার করতে হবে, নির্ণয় করতে হবে তাঁর প্রবন্ধরাশির উপযোগিতা। ভূদেবের কলম শিল্পীর রসাকর্ষণের উপায় নয়, সামাজিকের চিন্তাপ্রকাশের যন্ত্র। তাঁর লেখায় শোনা যায় সুন্দরের শঙ্খধ্বনি নয়, কর্তব্যের গুরুগম্ভীর ডাক।

ভূদেবের প্রথম গ্রন্থ 'শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬)—এখানে শিক্ষকসমাজ থেকে ছাত্রদের পারিবারিক পরিবেশ অবধি তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং সেই প্রয়োজন-সাধনে অধ্যাপকদের কর্তব্য নির্দেশ বিষয়গৌরবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' (১ম—২য় ভাগ, ১৮৫৮—১৮৫৯) ভূদেবের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রমাণ—এতে যন্ত্রবিজ্ঞান ও বাষ্পীয় যন্ত্রের বিবরণ আছে। ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞা (hypothesis) অবলম্বনে লেখা 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' নামে তাঁর একটি বইয়ের কথাও এখানে আমাদের মনে পড়ে। আটাম্নোয় প্রকাশিত 'পুরাবৃত্ত সার' ও (১ম খণ্ড) আরেকটি সুরচিত গ্রন্থ—মানুষের প্রকৃত ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার শুভ উদ্দেশ্য থেকেই বইটির জন্ম। মনে রাখতে হবে, তখন পর্যন্ত বাঙলা ভাষায়

ইতিহাসের বই বেশি রচিত হয়নি। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের নিকট সম্বন্ধ থাকায় ও রাজ্যশাসনের প্রণালী ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ভূদেব 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (১৮৬২) রচনা করেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫) 'রোমের ইতিহাস' ও 'বাঙ্গালার ইতিহাসের' কথাও স্মরণ করতে হবে। ভূদেবের সমাজ-চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) ও 'আচার প্রবন্ধে' (১৮৯৫)। তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধের' প্রথম ভাগে সংস্কৃত নাটকের সমালোচনা ও দ্বিতীয় ভাগে বিচিত্র বিষয় স্থান পেয়েছে। ভূদেবের এই বিশ্লেষণ থেকে একটা সিদ্ধান্ত করতে হয়। উনিশ শতকটা ছিলো 'গোটা মানুষদের' কাল, 'সারবানদের' যুগ। ভূদেবও তাঁদেরই একজন—শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজ, ইতিহাস, তন্ত্র ইত্যাদি কত বিচিত্র বিষয়েই না কৌতূহল! বহু-বিষয়ে মননশীলতা যদি প্রতিভার নিদর্শন হয়ে থাকে, তবে তিনি নিঃসন্দেহে প্রতিভাধর লেখক।

ভূদেবের একটি বই—'সামাজিক প্রবন্ধ' একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই। জাতীয় ভাব, সামাজিক প্রকৃতি, পাশ্চাত্ত্যভাব, ইংরাজাধিকার; ভবিষ্যবিচার ও কর্তব্যনির্ণয়—এই পাঁচটি অধ্যায়ে 'সামাজিক প্রবন্ধ' বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, মুসলমানেরা এই মহাদেশের একতা সাধন করেছেন এবং সাম্যধর্ম অনুসরণ করে অন্ত্যজদেরও সকলের সমকক্ষ হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। এদিক থেকে তারা হিন্দুদের আদর্শ, কারণ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, হিন্দুদের মধ্যে স্বজাতি-বিদ্বেষ দোষটি অত্যন্ত প্রবল। উপসংহারে জাতীয় ভাব বৃদ্ধির পথ নির্দেশ করেছেন ভূদেব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন নি। যাঁরা ভৌগোলিক প্রকৃতি থেকে জাতির প্রকৃতি নির্ণয় করেন—মৌলিক বর্ণ, ধর্মগ্রন্থ ও নীতিশাস্ত্র বিচারের প্রয়োজন বোধ

করেন না, ভূদেব তাঁদের স্পষ্টই নিন্দা করেছেন। উপমাত্মক বিচারের—যেমন সমাজশরীরকে প্রাণিশরীরের সঙ্গে তুলনারও—পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। তৃতীয় অধ্যায়ে পাশ্চাত্ত্যভাবের আলোচনার উপসংহারে ভূদেবের মুখে শুনতে পাই—'যিনি উল্লিখিত পাশ্চাত্যভাবগুলির (স্বার্থপরতা, উন্নতিশীলতা, সাম্য, ঐহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, বৈজ্ঞানিকতা ও রাজার সমাজপ্রতিভূত্ব) অভ্যন্তর পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিবেন যে, উহাদিগের কতকগুলি আসলেই ভূয়া এবং মেকি আর অপর কতকগুলি ভাঙ্গা এবং বেকেজো হইয়াই এখানে আসিতেছে। কিন্তু উহারা যতই ভূয়া বা বেকেজো হউক, উহাদিগের চলন ক্রমশঃই বাড়িতেছে।' চতুর্থ অধ্যায়ে ইংরেজাধিকার আলোচনায় ভূদেব প্রয়োজন মতো নিন্দা করতে দ্বিধা করেন নি। সাহেবদের আলাদা আদালত, ভারতীয় ব্যবহার শাস্ত্রে ইংরেজী ব্যবস্থাসূত্রের প্রবেশ, অতি কঠিন দণ্ডদানে ইংরেজ বিচারকদের প্রবৃত্তি, ইংরেজদের ক্ষেত্রে কর লাঘব, দিশি শিল্প নষ্ট করে বিলিতি শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি, শাসকদের ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণে অনিচ্ছা, শিক্ষার হীনবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর সমালোচনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভবিষ্যবিচার করতে বসে ভূদেব পঞ্চম অধ্যায়ে কোম্‌তের মতবাদকে সকলের পক্ষে গ্রহণীয় বলে স্বীকার করেন নি। ভারতে ইউরোপের সমাজতন্ত্রী ধ্যানধারণার কোন উপযোগিতা নেই, নেই ধর্মজ্ঞান লোপের সম্ভাবনা; নৈসর্গিক কারণ থেকে উদ্ভূত জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ হতে পারে না—ইত্যাদি নানা চিন্তার ভিড় এখানে দেখতে পাই। তিনি উপসংহারে কর্তব্য নির্ণয় করতে গিয়ে য়ুরোপের সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের পার্থক্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং জাতীয় ভাব বাড়িয়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

সামাজিক প্রবন্ধের এই বিষয়সূচী ইংরেজী বিদ্যার সঙ্গে ভূদেবের পরিচয় সত্ত্বেও ভারতের শাশ্বত শিক্ষার দিকে তাঁর ঝোঁক নির্দেশ

করে। এবং সে-ঝোঁক পূর্বাপর বিচারের ফল নয়, অল্পবিস্তর মানসিক পক্ষপাতিত্বের লক্ষণ। যে কোন সিদ্ধান্ত হয় যুক্তিসূত্রে নয় সংস্কারসূত্রে দেখা দেয়—এ দু'য়ের মাঝামাঝি কিছুটা যুক্তি আর আবেগ নিয়ে গড়ে-ওঠা একটা ভাবসূত্রেরও কল্পনা করা যেতে পারে। অক্ষয়কুমারের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিভিত্তিক, নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার টোলো পণ্ডিতদের মতামত সংস্কারগত—কিন্তু ভূদেব পুরোপুরি যুক্তির পথ না নিলেও কম-বেশি যুক্তি আর আবেগ মিশিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছোতেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য প্রকাশের ক্রম ও ভঙ্গিতে এমন একটা ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি প্রকাশ পেয়েছে যে, তাতে অর্বাচীন যুক্তিধর্মিতা দূরে থাকুক প্রাচীন নৈয়ায়িকতার প্রান্তীয় কারুকার্যও (embroidery) স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অথচ ভাল করে তাঁর লেখা পড়লে তাঁর মানসমণ্ডলে সময় সময় বুদ্ধির টানে যুক্তির আনাগোনা অনুমান করা যায়। কিন্তু বাহ্যিক গোঁড়ামির জন্য ভূদেবের স্বজাতি সম্পর্কে কিছু কিছু নিষ্ঠুর সত্যভাষণও (যেমন প্রথম অধ্যায়ের মুসলমানদের সাম্যবাদের প্রশংসা ও স্বজাতি বিদ্বেষের নিন্দা) আমাদের নজরে আসে না। সুতরাং ভূদেবের গদ্যরচনায় ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্ত কম, পক্ষপাতিত্বমূলক ভাবাবেগ (emotional bias) বেশি, সত্যনির্ধারণে তিনি বৈজ্ঞানিক রীতির অনুসরণ করেন নি, অনুসরণ করেছেন সমাজপণ্ডিতের রীতি, —এই সিদ্ধান্তেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে হয়।

কেউ কেউ ভূদেবের লেখার মধ্যে একটা স্বাধীন মন আবিষ্কার করেছেন—সেই যুগের বিপর্যয়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে না দেওয়ায় মধ্যে সত্যিই স্বাধীন মনের প্রকাশ আছে কিনা বিচারসাপেক্ষ। অন্যান্য সামাজিকের ক্ষেত্রে নবাগত ভাবধারার বিরুদ্ধে জেহাদ সংরক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক, কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্র ও মধুসূদনের বন্ধুর ক্ষেত্রে এ এক ধরণের স্বাধীনচিত্ততা তো বটেই। কিন্তু ভূদেবের ঝোঁকটা কোন যুক্তিসম্মত মধ্যপন্থার দিকে না পড়ে প্রাচীনমুখী গোঁড়ামির দিকে পড়েছে বলেই এই স্বাধীনচিন্তার

স্বীকৃতি অকুণ্ঠিত হতে পারে না। অন্তত: আচারপ্রবন্ধ পড়ে তাই মনে হয়।

ভূদেবের রচনায় একটা 'আমিত্বের' ভাব আছে। কিন্তু সেই 'আমি' সত্যিকারের সাহিত্যের 'আমি' (স্মরণীয়ঃ style is the man) নয় এবং সেই 'আমি' চরম রস-নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বজনীনতার মধ্যে লীন হয়ে যায় না। তাঁর 'আমি' হয়ে ওঠেনি 'আমরা'—ভূদেবের লেখার শিল্পগত সার্থকতার কথা বিবেচনা করার সময়ে এ কথা মনে রাখতে হবে। আমিময় জীবনের অভিজ্ঞতায় আন্তরিকভাবে জন্ম দিতে পারলেও তাঁর লেখার অধিকতর স্বীকৃতি হতো। তবে লেখায় আপন বিশ্বাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন বলে আমরা ভূদেবকে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা না করে পারিনে।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, 'ভূদেব বড়ো বেশি কেজো মানুষ ছিলেন এবং নিরবচ্ছিন্ন কেজো মানুষটি তাঁর রচনাগুলিকে বড়ো কেজো করে রেখেছেন,—হাঁফ ছাড়ার অবকাশ কম,—কেবল কর্তব্যাকর্তব্যের বেড়াজাল।' এ-মন্তব্য সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭?) তাঁর এই সাহিত্য-চরিত্রের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কন্‌টারের 'রোমান্স অব হিষ্টরি' কি করে তাঁর মনোহরণ করলো ভেবে পাইনে। এতে দুটো গল্প আছে—সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময়। কিন্তু প্রথম গল্পটি কন্‌টারের লেখার অনেকটা অনুসরণ হলেও দ্বিতীয়টি ভূদেবের প্রায় মৌলিক কল্পনার সৃষ্টি। এই দ্বিতীয় কাহিনীতে আওরংজেবের কন্যা বন্দিনী রোসিনারার সঙ্গে শিবাজীর প্রণয়-কাহিনী আমাদের অনিবার্যভাবেই বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনীর' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—উভয় গল্পের আরম্ভ ও অঙ্গুরী বিনিময়ের কথাতেও আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। আসল কথা, বঙ্কিমেরও আগে ভূদেবই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বাদ ও সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যে। গল্পচ্ছলে এতে যদি হিতোপদেশ প্রকাশের (লেখকের নিজের

'বিজ্ঞাপন' অনুসারে) চেষ্টা থেকেও থাকে—তবু এখানে ভূদেব রসিক স্রষ্টা (আর রস-সাহিত্যে কোন-না-কোন নীতিশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা বঙ্কিমেও তো আছে!))।

ভূদেবের মতামত সকলের পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু তাঁর ভাষা সকলেরই প্রিয় হওয়া উচিত। গদ্যে উচ্ছ্বাস একটা ত্রুটি, সে ত্রুটি থেকে তাঁর গদ্য মুক্ত। সংস্কৃত উপাদানের প্রাচুর্য ভাষায় অনেক সময় জড়তা আনে, কিন্তু ভূদেবের লেখায় কিছুমাত্র জড়তা নেই। তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন —ভাষা ভাবের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। সেকালের একটা রীতি অনুযায়ী অনাবশ্যক অলঙ্কারচর্চায় তাঁর কিছুমাত্র স্পৃহা দেখিনে— পল্লবিত কবিত্ব বা ভাষাবিস্তারের মোহ তিনি জয় করতে পেরে-ছিলেন। সংযম ও সংহতিতে ভূদেবের গদ্য আঁটসাঁট—ঢিলেঢালা ভাষায় মতামত স্পষ্ট করে প্রকাশের অসুবিধা তাঁর অজানা ছিলো না। তবে তিনি মূলতঃ রসিক ছিলেন না বলে তাঁর ভাষা নীরস মনে হয়। বক্তব্য বজায় রেখেও তিনি কি ভাষাকে আরেকটু সরস করতে পারতেন না? অবশ্য 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' ভাবাবেগের প্রশ্রয়ে শব্দৈশ্বর্য ও রসব্যঞ্জনা আমদানী হয়েছে—বাক্যবিন্যাস বেশ সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

রচনার উদাহরণ ঃ

(১) 'বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল দেশে ঐতিহাসিক পরিণাম একমাত্র রূপ ধারণ করিয়া চলে না। সমাজভেদে তাহার রূপান্তরতা ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বিজাতীয়ের অনুকরণমাত্রকে অবলম্বন করিয়া কোথায়ও কোন সমাজের সম্যক্ শুভ সাধন হইতে পারে না। কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি পারিবারিক, সকল ব্যবস্থাই দেশভেদ কিছু কিছু পৃথক হইয়া আছে এবং পৃথক থাকাই ভাল। দেখ ইউরোপখণ্ডে রাজনীতি লইয়া নিরন্তর আন্দোলন চলিয়া থাকে, কিন্তু সেরূপ আন্দোলন চীন ও জাপানের পক্ষে আবশ্যক হয় না।' —সামাজিক প্রবন্ধ।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের মুখেও এই ধরণের কথাই শুনতে পাই।

(২) এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। অতএব সমাজে আর তেমন ভয়ের পাত্র নেই, ইংরাজই এখন ভয়ের পাত্র হইয়াছেন।...এখন ইংরেজের অনুকরণে সাহস নাই—উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র। মুসলমানের আমলে দেশের যে সকল হিন্দুসন্তান মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তুরস্ক সুলতানের অধীনে চাকুরী করিতে গিয়া যে সকল ইউরোপীয় লোক খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করে,...তাহাদের যেমন 'নৈতিক সাহস" প্রদর্শিত হয় না, তেমনি ইংরাজ-রাজের অধিকার-কালে যে ভারতবাসী দেশাচার পরিহার করিয়া ইংরাজী আচার গ্রহণ করে তাহারও নির্ভীকতা প্রমাণিত হয় না।'

—আচার প্রবন্ধ।

(৩) 'একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিবাকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণ নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জু-মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝর তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুত রসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্য্য-কিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই আচ্ছাদিত; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র।'

—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৭ প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন

প্যারীচাঁদ মিত্র মানুষ হিসাবে আকর্ষণীয়। বিচিত্র তাঁর মনের গতি। তাঁর তুই চোখ ছিলো খোলা—'দক্ষিণ স্ফটিকস্বচ্ছ, বামচক্ষু ঘোলা নয়'—উভয় চোখের দৃষ্টিই সমান স্বচ্ছ, সমান দুরদর্শী। অলোকসামান্য দূরে থাক, অসামান্য প্রতিভা নিয়েও তিনি জন্মান নি—তখনকার সাধারণ শিক্ষিত লোকের কিছু বেশি মনীষা মাত্র তাঁর ছিলো। তাঁকে জিনিয়াস বলবো না, কারণ এ-অভিধা যে সহজাত দৈবী শক্তির নির্দেশক, প্যারীচাঁদ তাঁর পরিচয় দিয়ে যান নি। তবে হ্যাঁ, তাঁর ট্যালেণ্ট অনস্বীকার্য—তাঁর মানসপ্রবণতা ও কর্মসাধনায় তার সাক্ষ্য আছে।

ছেলেবেলায় প্যারীচাঁদ লেখাপড়া শিখেছিলেন পাঠশালার গুরুমশায় ও মক্তবের মুন্সীর কাছে, বাঙলা ও ফারসী বিদ্যা আয়ত্ত করলেন তিনি। তারপর হিন্দু কলেজে ইংরেজী পড়েছেন এবং অনুমান করা অসঙ্গত নয়, হয়তো জিরোজিওরও ছাত্র ছিলেন। লেখাপড়া শিখে তিনি বাইশ বছর বয়সে 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর' সহ-গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এর আগে প্যারীচাঁদ নিজের বাড়িতে গড়ে তোলেন একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়। তাঁর জীবনের এ-ইতিহাসে চমকপ্রদ কিছু না থাক, লক্ষণীয় কিছু আছে বৈকি! অর্থসচ্ছল পিতা রামনারায়ণের সন্তান, হাটখোলার ঐশ্বর্য-বান মদনমোহন দত্তের দৌহিত্র ও হিন্দু কলেজের জিরোজিওর ছাত্র প্যারীচাঁদের পদস্খলন স্বাভাবিক ছিলো—তবু পিতার পাশ্চাত্ত্য-প্রীতির ইন্ধনসত্ত্বেও তিনি নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পেরে-ছিলেন। আমরা জানি, জীবনকে একেবারে তলিয়ে দেখতে গেলে

জীবনও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। প্যারীচাঁদ (ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর)—'আলালের ঘরের দুলালের' (১৮৫৮) লেখক—নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়ে জীবনকে একেবারে নীচু মহল পর্যন্ত চিনতে চাননি। নিজের খোলা চোখের বস্তুবোধ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের কালে জীবন তাঁর ওপর কোন প্রতিশোধ নিতে পারে নি। মতিলালের স্রষ্টা নিজেই মতিলাল হয়ে ওঠেন নি। আসল কথা, তখনকার শিক্ষা ও আদর্শের সঙ্কটের দিনে প্যারীচাঁদ ছিলেন—'a link of union between European and native society।'

সহ-গ্রন্থাগারিক থেকে প্যারীচাঁদ উন্নীত হলেন গ্রন্থাগারিকের পদে। এর ফলে তার আর্থিক সুবিধা হলো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি সুবিধা হলো বিদ্যাচর্চার। আঠারো বছর পরে এই বৈতনিক পদে তিনি ইস্তফা দিলেন, কিন্তু অবৈতনিক সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করে জ্ঞান-জগতের সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষুণ্ণ হতে দিলেন না। শুধু গ্রন্থরাজ্য নয়, শিক্ষার আরও নানা দিগন্তে তাঁর ছিলো সজাগ দৃষ্টি। The Society for the Acquisition of General knowledge, Bengal British India Society, British Indian Association, Bethune Society ইত্যাদির সঙ্গে কোন-না-কোন সূত্রে তিনি ছিলেন যুক্ত—কোথায়ও সহযোগী, কোথায়ও বা মধ্যমণি। ভারতের প্রজাসাধারণের বাস্তব অবস্থা ও সঙ্গত দাবি কখনও তাঁকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, কখনও পশুক্লেশের মর্মান্তিকতা তার মমতা জাগ্রত করেছে, কখনও বা সামাজিক বিজ্ঞান তাঁর জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তিকে করেছে উজ্জীবিত। আসল কথা, জীবনের নানা ক্ষেত্রে একজন শিক্ষিত মানুষের যে সামাজিক দায়িত্ব—তা-ই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন প্যারীচাঁদ।

প্যারীচাঁদ শুধু জ্ঞানী পুরুষ নন, কর্মী পুরুষও বটে। ব্যবসায়ে রামগোপাল ঘোষের মতোই তিনি ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। বাণীর

বরপুত্রের এই লক্ষ্মীলাভ নিশ্চয়ই প্যারীচাঁদের পুরুষার্থের নিদর্শন। আশ্চর্যের বিষয়, এক সময়ে তাঁকে কৃষিবিশেষজ্ঞ বলে গণ্য করা হতো—এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ এণ্ড হর্টিকাল্‌চারাল্‌ সোসাইটিতে তাঁর কার্যকলাপ এই বিষয়ে আগ্রহের প্রমাণ। স্বীকার করতেই হবে, এগ্রিকাল্‌চার্‌ থেকে কাল্‌চারে উত্তরণ মানসিক স্থিতিস্থাপকতার অপেক্ষা রাখে। প্যারীচাঁদের একটি স্থিতিস্থাপক মন ছিলো বলেই তিনি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন নিজের মনের শিকড়।

তাঁর আর একটি কীর্তি—'মাসিক পত্রিকার' প্রতিষ্ঠা। রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় তিনি পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন; উদ্দেশ্য—'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবর্তা, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞপণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটারে' প্যারীচাঁদের দান অনস্বীকার্য, কিন্তু মাসিক পত্রিকায় যে আদর্শের উচ্চকিত ঘোষণা, তা তাঁর প্রগতিশীল মনেরই প্রকাশ। কথ্যভাষার ব্যবহারে আত্মনিয়োগ ও স্ত্রীজাতির সাহিত্য-পিপাসায় মনোযোগ তখনকার পক্ষে সাহসিক তো বটেই, প্রায় অসমসাহসিক।

তাহলে প্যারীচাঁদ সম্পর্কে মূল কথাটা দাঁড়ালো—তিনি ছিলেন বিচক্ষণ কর্মী পুরুষ, তাঁর মনের প্রবণতা ছিলো নানা দিকে। তাঁকে দেখা গেছে উভয়কেটিক আদর্শের মাধ্যমিকতায়, তাঁর মধ্যে পেয়েছি কল্যাণকামী জীবনের মানবিকতা। এক কথায়, প্যারীচাঁদ উনিশ শতকের রেণেসাঁসের তটস্থ সন্তান। তাঁর কানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো দুটো প্রশ্ন—একটা সামাজিক, অন্যটা সাহিত্যিক। সামাজিক প্রশ্নটা ছিলো, জীবনকে কোন্‌ পথে পরিচালিত করবো? তখনকার পারিপার্শ্বিক জটিলতার জন্ম নবাগত য়ুরোপীয় জীবনাদর্শের সংঘাতে। সংঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সংযোগের প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু সেদিনের সামাজিক সংঘাত সুন্দর সংযোগে সরলীকৃত ও প্রাণবান

হতে সময় নিয়েছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' সেই জটিল সমস্যায় নিমগ্নচেত প্যারীচাঁদের বক্রভাষণ, সামাজিক মর্মজ্বালার অম্লমধুর প্রকাশ।

আলালের ঘরের দুলাল—বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবুর ছেলে মতিলাল—একে একে গুরুমশায়, পণ্ডিত, মুন্সী ও সাহেবের কাছে পাঠ নেওয়ার চেষ্টা করলো,—কিন্তু শিক্ষিত হলো না। কুসঙ্গে পড়ে বেলাল্লাপনা করার অপরাধে হাজত বাস—তবু তার চৈতন্য কই! ইতর আমোদে তার মন মজলো, অভদ্র ও অসৎ কাজে তার সঙ্গী জুটলো অনেক, এমন কি ভদ্রকন্যার প্রতি অত্যাচারেও তার দ্বিধা নেই। অথচ ভাই রামলাল তার মতো 'বাবু' হয়নি, বরদাবাবুর সুশিক্ষায় মানুষ হলো। কিন্তু মতিলালের অধঃপতনের জন্য দায়ী কে? প্রধানতঃ সপরিষদ বাবুরাম ও শিক্ষকবর্গ। তার ওপর কোন মহৎ চরিত্রের প্রভাব অলক্ষ্য—অন্ততঃ তার জীবনের গড়ে-ওঠার সময়ে। তাই তার দুর্গতির অন্ত দেখিনে। নানা বিপর্যয়ের পর মতিলালের অন্তরে সত্যবোধের সঞ্চার—বারাণসীতে গুরুর সৎসঙ্গে ও বরদাবাবুর সহৃদয়তায় অবশেষে মতিলাল শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে সপরিবারে সৎভাবে জীবন পরিচালনায় রত হয়। 'আলালের ঘরের দুলালের' এই কাহিনীতে যে সামাজিক চিন্তার প্রকাশ দেখি, সে-সম্পর্কে প্যারীচাঁদ বলেছেন—'It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education on self-formation and religious culture, and is illustrative of the condition of Hindu Society customs, & c. and partly of the state of things in the Moffussil.' সংস্কৃত সাহিত্যের মধুর রসের বদলে এই ব্যঙ্গাত্মক নিম্বফলের তিক্তস্বাদ আমদানী করে প্যারীচাঁদ সত্যিই বাঙলা সাহিত্যের রুচিবদল ঘটালেন। এবং খাতবদলও বটে।

কাকবৃত্ত প্যারীচাঁদের দ্বারা বাঙলা সাহিত্যের খাতবদলের কথা পাই বঙ্কিমের বিশ্লেষণেও—'তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই যে, তিনি প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি ও সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলালের ঘরের দুলাল।'

সত্যি, প্যারীচাঁদের আগে বাঙলা গদ্যে রস-সাহিত্য ছিলো বটে, কিন্তু তার কোনটাই মৌলিক (ভবানীচরণের লেখা ছাড়া) নয়। ফোর্ট উইলিয়ামী গদ্যপ্রচেষ্টায় গল্প ও উপকথার পন্ধান পাই—কিন্তু তাদের মধ্যেও মৌলিকতা নেই, সমসাময়িক জীবনের প্রতিচ্ছবি নেই, নেই দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের অন্তরঙ্গ কাহিনী। বত্রিশ সিংহাসন, ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট, তোতা ইতিহাস, পুরুষ-পরীক্ষার মতো গ্রন্থগুলির গল্পসূত্র ফারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী উৎসে নিহিত। এর মধ্যে 'তোতা ইতিহাসের' একটু স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছে তার আদিরসাত্মক মানবয়ীতা—বোধ করি সেই রস বিদ্যাসুন্দরের আমল থেকে ছড়িয়ে ছিলো বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে। কেরী সাহেবের 'কথোপকথনে' একটা বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টির সমুৎসারণ আমাদের খুশি করে, সন্দেহ নেই—কিন্তু আমাদের বাইরের জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র খেলায় অস্তিত্বের যে প্রাণবান সামগ্রিকতা, তার আদিগন্ত রসরূপ সেখানে উদ্ঘাটিত হয়নি। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় মানবিক দৃষ্টিপাত মাঝে মাঝে চিত্তাকর্ষক, তবু বাঙালীর পুরো জীবনের রূপ-বিচিত্রা তিনি রচনা করতে পারেননি। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' বৃহত্তর অর্থে বাঙলা দেশেরই কাহিনী। মোগল যুগের পটভূমি থেকে নবাবী আমলের চালচিত্র বই দুটোতে পাই—কিন্তু ঐতিহাসিক-তার সঙ্গে গাল্পিকতার সংমিশ্রণে বাঙালীর বস্তুনিষ্ঠ জীবনবোধ

অস্পষ্ট থেকে গেছে। বিদ্যাসাগর তাঁর কথাকাহিনী খুঁজেছেন সংস্কৃত আর ইংরেজী সাহিত্যে—তারাশঙ্কর তর্করত্নরা তাঁরই সমধর্মা। একমাত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নক্সাগুলিতে সমসাময়িক জীবনের প্রতিচ্ছায়া আছে, তাঁর কথাকাহিনীর মর্ম-মূলে রস সঞ্চার করেছে বাঙলা দেশের কালগত জীবন-প্রেরণা। সংস্কৃত সাহিত্যের কল্পলোক নয়, ইতিহাসের অস্পষ্ট দিগন্তও নয়, দেশের সতেজ জল-বায়ু-মাটিতে তাঁর নিরিখ নিবদ্ধ। সত্য বটে, তাঁর লেখায় স্কেচ্ আছে, পোট্রেট্ নেই; নক্সা আছে, ছবি নেই—তবু তা কথাসাহিত্যই এবং তাতে ঘরের কথাই ফুটে উঠেছে। সুতরাং প্যারীচাঁদ বাঙলা দেশের ঘরের কথার প্রথম কথাকার, বাঙালীর সমকালীন জীবনের আদি রূপকার—বঙ্কিমের এ মতে পুরো সত্য নেই।

তবে প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব অন্যত্র দেখতে পাই। তাঁর লেখায় বাস্তব জীবনের খণ্ড ছবি ঘটনাধারার ধারাবাহিকতা ও পূর্বাপর কাহিনীর স্বয়ংসম্পূর্ণতায় উপন্যাসের রূপ নিয়েছে। আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির কাঁচা পয়সা ও সংস্কৃতিহীন ভূস্বামীর বিলাসের সূত্রে যে বাবুর জন্ম, তার মধ্যেই লুকিয়ে ছিলো এক নায়ক, একটা মানুষের কঙ্কাল। অন্যদিকে কাহিনীর অসংলগ্ন বয়ন দেখি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়—আজগুবি খবর আর মুখরোচক কেচ্ছা, চমকপ্রদ ঘটনা আর কৌতুকজনক তথ্য, সামাজিক ঘোঁট আর নৈতিক অনাচারের কতোই না সংবাদ! এই সব অসম্বদ্ধ উপকরণেই উপন্যাসের প্রাথমিক পত্তন—তার অগোছালো খসড়া-রচনা। 'বাবুর উপাখ্যানের' মধ্য দিয়ে সেই খসড়া অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত রূপে নিলো 'নববাবুবিলাসে।' কিন্তু এখানে সমাজের নানা ঘটনা ব্যক্তিমানুষকে অস্থিমজ্জায় জীবন্ত করে তোলেনি, ব্যক্তিচরিত্র স্ফুরণের প্রয়োজনে সামাজিক পরিবেশ রচনার চেষ্টা নেই—তাই একে উপন্যাস বলা যায় না। কিন্তু প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস রচনার প্রথম সজ্ঞান প্রয়াস। লেখক নিজেই

গ্রন্থটিকে—'original novel in Bengali being the first work of the kind।' তাঁর মুখে আরও শুনেছি,—এদেশের লোকের বই পড়ে সময় কাটাবার অভ্যাস নেই বলে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন, কারণ উপন্যাস পড়তে প্রায় সকল দেশের লোকই ভালোবাসে।

সত্যিই, উপন্যাসের স্বরূপ-লক্ষণ 'আলালে' অনেকটা পরিস্ফুট। লেখকের নানামুখিন দৃষ্টি জীবনকে দেখেছে নানা পরিপ্রেক্ষিতে—কখনও কাছে থেকে, কখনও দূরে সরে গিয়ে। মননশীল ব্যক্তি-মানুষের বিচারপ্রবণতা আর সহৃদয় সামাজিকের তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা নিয়ে অগ্রসর হওয়ায় প্যারীচাঁদের কাহিনীতে গভীরতর রূপ, রস ও রঙের সমাবেশ ঘটেছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাস্তব বর্ণনায় তিনি ব্যর্থ নন। তাছাড়া, মতিলালের জীবনের অংশ-বিশেষ নয়, মোটামুটি সমগ্র জীবন উপন্যাসটিতে রূপায়িত। যে সমস্ত বাইরের ও ভেতরের কারণে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাঙে গড়ে—তার সম্পর্কে একটা কাজ চালাবার মতো জ্ঞান প্যারীচাঁদের ছিলো। তাই একদিকে তাঁর ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম ও বক্রেশ্বর, অন্যদিকে বেণী ও বেচারাম ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। ঠকচাচার পরিকল্পনায় একটা অনন্যতা আছে–তার কথা ও আচরণে বুদ্ধির ঝিলিক। কিন্তু উপন্যাসে তাঁর ষড়যন্ত্র ও সত্য-মিথ্যার ভেদাভেদ সম্পর্কে মোহমুক্তি তাকে মধ্যযুগীয় ভিলেনে পরিণত করেছে। আসল কথা, শঠতা ও চক্রান্তের মধ্যেই তার মনোজীবনের লালাক্ষরণ ও লতাতন্তুজাল রচনা—আদালতের পোষাক থেকে বাগ্‌ভঙ্গি পর্যন্ত সবই যেন তার মনের দর্পণ। আরও আশ্চর্য ঠকচাচী—স্বামী বুদ্ধির জোরে রোজগার করে, স্ত্রী বিদ্যার জোরে (তন্ত্রমন্ত্র, গুণকরণ, বশীকরণ, মারণ, তুকতাক, জাদু ও ভেল্কি তার বিদ্যা)। এমন স্বাম-স্ত্রীর মিলনকেই তো রাজ-যোটক বলে!

আর বাঞ্ছারাম? সে এটর্ণী বাটলার সাহেবের সাকরেদ,

ঠকচাচার দোস্ত, নানা মতলবের মনসবদার। আসলে স্বার্থ-সাধনায় সে নির্বান্ধব হতেও প্রস্তুত—তা না হলে ঠকচাচার সর্বনাশে তার পৌষ মাস হবে কেন? কিন্তু বক্রেশ্বরের কোন মেরুদণ্ড নেই, শুধুই কেঁচোর মতো মাটি-খাওয়া অস্থিমজ্জাহীন তার জীবন। খোসামোদে তার দিন কেটেছে, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধ হয়নি। বেণী ও বেচারাম চরিত্রাদর্শে এদের বিপরীত, জীবনের অনেক পরীক্ষায় তারা চরিত্রশক্তিতেই সসম্মানে উত্তীর্ণ, বাবুরাম ও ঠকচাচার চাপ তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে পারে নি। তবে বরদাবাবু ও রামলাল, কোন এক খ্যাতনামা সমালোচকের মতে, চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে ম্লান ও বিশেষত্ববর্জিত, কতগুলি সদ্‌গুণের যান্ত্রিক সমষ্টি মাত্র। ঠকচাচার গ্রেপ্তারে বেচারামের উল্লাস সত্ত্বেও বরদাবাবুর সমগ্র পরিবারের জন্য দুঃখ প্রকাশ অবাস্তর আদর্শের অতিরঞ্জিত প্রকাশ, সন্দেহ নেই—কিন্তু এ সব হচ্ছে মতিলালের নৈতিক অধঃপতনের প্রতিক্রিয়া। উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসে একদিকের caricature-প্রবণতায় অন্যদিকে idealism-এর অতিরেক দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সংসারে শয়তানি যতটা সক্রিয় ও সজীব আদর্শবাদ ততটা নয়; তাই মন্দ লোকেরা স্বভাবতঃই জীবন্ত হলেও আদর্শবাদীদের কেমন যেন নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়। বরদাবাবুদের চরিত্রের বিচারে একথা স্মরণ্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে প্যারীচাঁদের মোটামুটি প্রশংসা করতে হয়। জীবনের গভীরে অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে তারণ ও চারণ ঘটেছে বলেই সিদ্ধি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়নি।

চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে যেমন, তেমনি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আলাল উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। বইটি পড়লে প্যারীচাঁদের ভাবাবেগমূলক পক্ষপাত ধরা পড়ে নিশ্চয়, কিন্তু তবু তিনি বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেন নি—বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতিও সুবিচার করেছেন। আর জীবন-রস-রসিকতার চেয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য যেখানে প্রধান,

সেখানে ভাবগত পক্ষপাত কার না ধরা পড়ে ? আমারতো মনে হয়, ব্যঙ্গাত্মক মনোবৃত্তিই প্যারীচাঁদকে বিদ্বেষের পঙ্ককুণ্ডে পড়তে দেয়নি—কারণ বিদ্রূপের প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিলে সে শত্রু মিত্র কাউকে ছাড়ে না, ছাড়তে পারে না। তাই প্যারীচাঁদের তূণ থেকে তীক্ষ্ণাগ্র ব্যঙ্গাস্ত্র যেমন বাঙলা সংস্কৃতের গুরুমশায়ের দিকে তেমনি ইংরেজী মাষ্টারের দিকেও নিক্ষিপ্ত।

এবার আলালের ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। 'মাসিক পত্রিকায়' যে আদর্শের অঙ্গীকার, টেকচাঁদের উপন্যাসে তারই সাহসিক প্রয়োগ। পণ্ডিতী গদ্যের সর্বাত্মক প্রসারে প্রতিরোধ ছিলো অনেক দিন থেকে—সংস্কৃতের দাসত্বের প্রশ্নে রসিক চিত্তে দ্বিধা ছিলো, ক্ষোভও ছিলো—ভাষার সাধুরীতির ত্রুটি বিবেকবান সংস্কৃতিবিদ্‌দের অজানা ছিলো না। চুক্তিপত্র, ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ, লিপিমালা এবং এমনিতর আরও কোন কোন ক্ষেত্রে কথ্যভাষার সন্ধান মেলে। কিন্তু এসবই সাহিত্যিক সৃষ্টি নয় বলে কথ্যভাষার সপক্ষে নজীর হিসেবে দুর্বল। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ও বিদ্যাসাগর ? তাঁরা পণ্ডিতী রীতির লেখক, ওস্তাদ সাধুভাষী। তাঁদেরও কলম থেকে পাওয়া গেছে কথ্য ভাষা—কোথায়ও পুরো চেহারায়, কোথাও বা অস্পষ্ট আদলে। এক আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ কথ্যভাষার সন্ধান দেখি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকায় ; কোন্ মনোভাবে কি বিষয়ে এই ভাষার প্রয়োগ সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে পণ্ডিতের চিন্তায় ও লেখায় কথ্যরীতির প্রতি কৌতূহল প্রকাশ। বিদ্যাসাগরেও পাই—

'গৌতমী…কহিলেন, বাছা ! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল ; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে ? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি ! আজ বড় অসুখ হয়েছিল, এখন অনেক ভাল আছি। তখন গৌতমী…কহিলেন, বাছা ! সুস্থ শরীরে চির-জীবিনী হয়ে থাক। —শকুন্তলা।

এ আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, বাঙলা গদ্যের সাধু বা পণ্ডিতী রীতির মধ্যে কৃত্রিমতা আছে। মৃত্যুঞ্জয় ও বিদ্যাসাগরের মতো লেখকদের মনেও কথ্যরীতির ভাবনা জেগেছে, ক্ষেত্রবিশেষে কথ্য-রীতির সার্থকতা তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। অন্যদিকে বাঙালীর সাংস্কৃতিক মানসের ওপর সাধুভাষার আধিপত্য উপেক্ষণীয় কিছু নয়, তার সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকের সজ্ঞান প্রয়াস ছিলো। সে যুগের খ্যাতনামা পুরুষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বইয়ে অসাধু শব্দের এক প্রস্থ তালিকা দিয়ে তাদের পরিহার করতে বলেছেন, একমাত্র সংস্কৃত প্রতিশব্দের অভাবে ফরাসী ও ইংরেজী ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ার ও পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ করার ফতোয়া দিতেও তিনি ভোলেন নি। এমনিতর পরিস্থিতিতে পণ্ডিতী ভাষার প্রতিক্রিয়া রূপেই টেকচাঁদের (এবং হুতোমের) কথ্যভাষার আত্মপ্রকাশ, ভাষার পরিবর্তন-তরঙ্গের অবরোহণের দোলাতেই গ্রন্থ দুটির ঐতিহাসিক জন্ম।

টেকচাঁদী ভাষা বিচারের কালে খাঁটি বাঙলা (বা কথ্যভাষা) কাকে বলে বুঝে নেওয়া দরকার। 'এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যে ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি, যে ভাষায় আমরা ভাবনা চিন্তা সুখদুঃখ বিনা আয়সে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আস্‌ছি, এবং আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাঙলা ভাষা?' প্রমথ চৌধুরীর একথা প্যারীচাঁদ জানতেন এবং জানতেন বলেই স্বাভাবের 'অনন্ত ভাণ্ডার' থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রচনা করলেন আলাল। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি এনে দিলেন সর্বজনীনতা, সংস্কৃতের হ্রদ থেকে ভাষার মুক্তি ঘটলো সাধারণের চলমান কথার প্রবাহে। তাই প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব ঐতিহাসিক—সাহিত্যের সাধনায় নিজের শুদ্ধ সিদ্ধি তাঁর কাম্য ছিলো না, পুরনো ঐতিহ্যের বাঁক ফিরিয়ে ভবিষ্যতের সাহিত্য-সিদ্ধির পথ খননই ছিলো তাঁর অভীপ্সা।

আলালের ভাষা আদর্শ হওয়ার সুযোগও ছিলো না। কারণ

কোন বিরুদ্ধ শক্তির reflex action-এ যার জন্ম, তার মধ্যে এক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অনুস্যূত থাকে। এটা জানা কথা যে, নেতিবাচকতা থেকে মহৎ কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। জন্ম-মূলের ইতিধর্মিতার অভাবই আলালকে শিল্পসম্মত ভাষা-অবয়ব দেয়নি —শুধুই বিদ্রোহের উদ্ধত মূর্তি দিয়েছে। যে মানসিক প্রসন্নতা ও সৌন্দর্যানুভূতি ভাষার অঙ্গে লাবণ্য আনে, যে অনুশীলিত মননধর্ম ভাষাকে চতুর ও ধারালো করে, প্যারীচাঁদের লেখার ক্ষেত্রে তার অভাব দেখি। তিনি বাঙলার জনসমাজের ভাষাকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসিয়েছেন বটে, কিন্তু তার সভাশোভন শিল্পসম্মত রূপ দেননি, Artlessness-কে Art-এ পরিণত করতে চেষ্টা করেননি আদৌ। সুতরাং বাঙলা ভাষায় প্যারীচাঁদের স্থান খাতবদলের ঐতিহাসিক গুরুত্বে, স্বকীয় রচনার শিল্পগত সার্থকতায় নয়।

কিন্তু আলালের ভাষায় বিশুদ্ধির অভাব আছে—বঙ্কিমের এ মত বিচার সাপেক্ষ। ভাষার বিশুদ্ধি কাকে বলে? সংস্কৃত ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণে আলালী ভাষা নিয়মমাফিক নয় সত্য, কিন্তু বাঙলার বিচারে সংস্কৃতের সূত্রগুলিই কি একমাত্র অনুসরণীয়? বাগ্‌ভট্টালঙ্কার বলেছেন, অপভ্রংস্তু যচ্ছুদ্ধং তত্তদ্দেশেষু ভাষিতম্। অর্থাৎ সেই সেই দেশে কথিত ভাষা সেই সেই দেশের বিশুদ্ধ অপভ্রংশ। তা হলে বাঙলা দেশের কথিত ভাষাই (এবং সে ভাষা অবিমিশ্র সংস্কৃত উপাদানে গড়া নয়, তা মিশ্রভাষা) হচ্ছে বিশুদ্ধ অপভ্রংশ এবং সেই বিশুদ্ধ অপভ্রংশের বিচারে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানা চলে না।

তবে টেকচাঁদের লেখায় ক্রিয়াপদের বিশুদ্ধি বজায় থাকে নি। সাধু ও চলিত রূপের সম্পৃক্ত ও মিশ্র ব্যবহার আলালী ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ—

মিশ্ররীতি :

'আমরা শাঁকের করাত—**যেতে** কাটি, **আসতে** কাটি! যদি কর্তার পঞ্চত্ব **হইয়া** থাকে তবে তো একটা জাঁকাল শ্রাদ্ধ **হইবে**···।

সম্পৃক্তরীতি ঃ

'কোথাও বা সারজনেরা বুকের ছাতি ফুলইয়া মস্‌মস্‌ করিয়া বেড়াচ্ছে।...এক একবার বাবুরাম বাবুর হাত ধরিয়া টেনে লইয়া যান।'

সাহিত্যের মার্জিত শ্রীর দিক থেকে ক্রিয়াপদের এই মিশ্র ও সম্পৃক্তরীতি আপত্তিকর। কিন্তু বাঙলা দেশের কোন কোন অঞ্চলের কথ্যভাষায় এমনি রকমের মিশ্রণ আজও দেখা যায়—তাই আলালের কথ্যভঙ্গির ক্ষেত্রে এটা ত্রুটি কিনা চিন্তা করা দরকার। বিদ্যাসাগরও সংলাপে 'শুনিলাম'-এর পরে একই বাক্যে 'হয়েছিল' ব্যবহার করেছেন। তাই মনে হয়, তখনকার মুখের ভাষায়ও হয়তো এই মিশ্র ও সম্পৃক্তরীতির সমর্থন ছিলো। আলালের ভাষার যিনি স্রষ্টা, তিনি সাহসের অভাবে বা অজ্ঞানতার জন্য এ কাজ করেছেন বলে মনে হয় না।

প্যারীচাঁদ আলাল ছাড়া আরও কয়েকটি বই লিখে গেছেন—'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (৮৫৯), রামারঞ্জিকা (১৮৬০), 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) ও 'বামাতোষিণী' (১৮৮১)। এদের মধ্যে গীতাঙ্কুর গানের বই ; অভেদী (এ বইয়ে বেনিয়ানের "Pilgrims' Progress"-এর প্রভাব আছে বলে মনে করা যেতে পারে) ও আধ্যাত্মিকা উপন্যাস ; বামাতোষিণী ও মদ খাওয়া বড় দায় গল্প-গ্রন্থ ; অন্যগুলি প্রবন্ধের বই। প্যারীচাঁদের সমাজ-চিন্তা, নীতিবাদ ও আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন হিসেবে যেমন, তেমনি রসিকচিত্তের সৃষ্টি হিসেবে এই সব গ্রন্থের মূল্য কম নয়। সাধু রীতিতে লেখা অভেদী থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে বক্তব্য শেষ করতে চাই—'একদিকে মহিষের পাল বেগে চলিয়াছে। নিকটস্থ দুই একটা ভগ্নবৃক্ষ হইতে কীট অথবা শস্য অন্বেষণার্থে

পক্ষিরা এক একবার চুকবু চুকবু করিয়া ডাকিতেছে ও রাখাল বিশ্রামের জন্য মেঠো সুরে গান গাইতেছে।'

আলালের কথ্যভঙ্গির পাশে এ ভাষাভঙ্গি দেখে মনে হয়, ওস্তাদ খেলোয়াড়েরা এমন কি কাণাকড়ি নিয়েও খেলতে জানেন, তাঁদের হাত ডাইনে বাঁয়ে সমান চলে।

॥ ২ ॥

যে অগ্নিকণা গৃহকোণে প্রদীপশিখা জ্বালে, সে আবার দাবাগ্নিও প্রজ্বলিত করে। আগুনের এই বিচিত্র সম্ভাবনা কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিরিশ বছর মাত্র তিনি বেঁচেছিলেন—এরই মধ্যে একদিকে 'মহাভারতের' পরিশ্রমসাধ্য অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন, অন্যদিকে রচনা করেছেন হাল্‌কা সমাজচিত্র—'হুতোম প্যাঁচার নক্সা।' তাঁর দৃষ্টি কখনও পড়েছে টিকি মিউজিয়ামে, কখনও বা বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে। সেকালের সামাজিক জীবনের এমন কোন দিগন্ত নেই, যেখানে কালীপ্রসন্নের প্রতিভার আলো ছড়িয়ে পড়েনি। তাঁর মধ্যে আমরা দেখেছি অদম্য উৎসাহ, অফুরন্ত কর্মশক্তি, বিচিত্র বিপুল মনীষা। তাই তিনি আগুনের উপমা। বাঙলা সাহিত্যও তাঁর দাহ ও আলো থেকে বঞ্চিত হয়নি।

জোড়াসাঁকোর দেওয়ান বংশের নন্দলাল সিংহের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসন্ন। অগাধ বিত্তের প্রশ্রয়ের মধ্যে তাঁর জন্ম, পিতার প্রথম সন্তানের সৌভাগ্যের মধ্যে তাঁর বাল্য অতিবাহিত। দেশজ বাবুয়ানা বা বিজাতীয় ইংরেজিয়ানার রেওয়াজ যখন প্রবল ছিলো, তখন ছয় বছর বয়সে পিতৃহীন কালীপ্রসন্নের পদস্খলন ছিলো স্বাভাবিক। অথচ আশ্চর্য স্থিরপ্রজ্ঞায় তিনি আদর্শবাদের ক্ষুরধার পথ পেরিয়ে গেছেন। প্রচুর পয়সা হাতে পেয়েও তিনি প্রচুরতম বিলাসব্যসনকে জীবনে সর্বস্ব করে তোলেননি।

তনি ছেলেবেলায় তুখোড় ছাত্র ছিলেন না, হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে সুনাম অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু ইংরেজী ভালোই শিখেছিলেন, সংস্কৃত কলেজ থেকে দূরে থেকেও একজন পণ্ডিতের সহায়তায় সংস্কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'—তাঁর তের বছর বয়সের সৃষ্টি। তিনি দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক ও অধিনেতা ছিলেন। এতে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করা হতো, এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতো প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও গুণিজনসম্বর্ধনা (স্মরণীয়ঃ সভা কর্তৃক মধুসূদনকে প্রথম প্রকাশ্য সম্বর্ধনা)। কালীপ্রসন্ন শুধু সভা করেই কবিকে উৎসাহিত করেন নি, 'মেঘনাদবধকাব্য' বিশ্লেষণ করে কবির অনন্য প্রতিভাকে দিতে চেয়েছিলেন চিরায়ত প্রতিষ্ঠা। কেবল তাই নয়, সভার পক্ষ থেকে পাদরি লংকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও ইংরেজী 'নীলদর্পণ' প্রচারের দায়ে লংয়ের জরিমানা হলে তাঁর স্বেচ্ছায় হাজার টাকা দান, সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে অর্থসাহায্য দান কালীপ্রসন্নের সামাজিক চৈতন্য ও ব্যক্তিগত মহত্ত্বের অভিজ্ঞান, সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। আসল কথা, অর্থ থাকে অনেকেরই, মধ্যযুগীয় বদান্যতায় সেই অর্থের ব্যবহারও কেউ কেউ করে থাকেন —কিন্তু জীবনের যুগগত দায় ও প্রগতিশীল সামাজিক দায়িত্ব মেটাতে গিয়ে ব্যক্তিগত অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন ক'জন? কালীপ্রসন্ন সেই বিরলনামাদের একজন।

'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' বাঙলা নাটকের অভিনয়ে অন্যতম পুরোধা। ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক নয়, বাঙলা নাটকের অভিনয়ের প্রতি লেবেডেফ্ ও নবীন বসুর সাহসিক দৃষ্টিপাত ও বাঙলার রঙ্গমঞ্চকে তেমন সঞ্জীবিত করতে পারেনি—কিন্তু সাতান্নোয় আরো কয়েক জনের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সেই বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হলেন। তিনি রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে সংস্কৃত নাটকের

('বেণীসংহার') অনুবাদ করালেন, তার অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করলেন, প্রশংসা অর্জন করলেন অনেক। তারপর কালীপ্রসন্ন নিজেই অনুবাদ করলেন 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), পুরূরবার ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ও হলো উল্লেখ করার মতো। তাঁর মৌলিক রচনা 'সাবিত্রী সত্যবান নাটকও' (১৮৫৮) নাট্যকলায় তাঁর আত্যন্তিক উৎসাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিজের 'বঙ্গভাষায় বুৎপত্তি' হয়নি বলে যিনি মনে করতেন, সেই কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) বের করে মাতৃভাষার অনুশীলনের আর একটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেন। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি স্বয়ং ছিলেন সেকালের একজন 'বিদ্যাবন্ত ব্যক্তি'। প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা ও শিল্পসাহিত্যাদি আলোচনার উদ্দেশ্যে 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' (১৮৫৬) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ও 'পরিদর্শক' কিছুদিন সম্পাদনা করার সুযোগও কালীপ্রসন্নের হয়েছিলো। সুতরাং সাময়িক পত্রেও তাঁর আত্মবলয় সুস্পষ্ট।

মনে রাখতে হবে, এ সবই তিনি করেছিলেন তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে। তাই তাঁর অকাল মৃত্যু বাঙালীর সংস্কৃতির পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি, বাঙালী জাতির কাছে এক চরম শোক। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুতে 'ইণ্ডিয়ান মিরারের' সপ্রশংস উক্তি স্মরণযোগ্য ঃ 'Among the wealthy aristocratic classes of Calcutta there are few, young or old, that could equal the accomplishments of Kali Prossono Singh ...as he with increased years imbibed a taste for the pleasures of opulence and youth, he also imbibed higher and more refined tastes, and became such an ardent lover of literature and wit as few of his class have ever been.'

কালীপ্রসন্নের রচনাবলীর মধ্যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬১,

প্রথম খণ্ড) ও অনুবাদিত 'মহাভারত' (১৮৬০—৬৬) বিশ্রুতনামা। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' (১৯০২) ও 'বঙ্গেশজিয়' (অপ্রকাশিত ?) —এই যথাক্রমে অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ দুটির কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত। 'বিক্রমোর্বশী নাটক' ও 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' ছাড়া 'বাবুনাটক' (১৮৫৪) ও 'মালতীমাধব নাটক' (১৮৫৯) কালীপ্রসন্নের নামে প্রচলিত।

এবার 'মহাভারত' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' কথা একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। এ দুটি বই দুটো স্বতন্ত্র ভাষা-রীতির পরিচায়ক। মহাভারতে কালীপ্রসন্নের সহায়ক ছিলেন কয়েকজন পণ্ডিত—তাই কেউ কেউ অনুবাদের বিদ্যাসাগরী রীতির কারণ খোঁজেন পণ্ডিতদের কলমের মধ্যে এবং কালীপ্রসন্নকে প্রাপ্য প্রশংসা থেকে বঞ্চিতও করতে চান। কিন্তু মহাভারতের অনুবাদের যে বিবরণ তাঁর কাছে পেয়েছি, তাতে 'পণ্ডিত কর্ণধারদের' কাছে ঋণের স্বীকৃতি আছে, আছে নিজের অসাধারণ শ্রমের কথার উল্লেখ—'১৭৮০ শকে সৎকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।' সুতরাং মহাভারতের অনুবাদের কৃতিত্ব থেকে কালীপ্রসন্নকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রশ্ন ওঠে না। তবে অনুবাদের ভাষারীতির কারণ হচ্ছে—মূলের প্রতি বিশ্বস্ত ভাষাবোধ, পণ্ডিতদের অনুবাদে সহযোগিতা ও বিদ্যাসাগরের অবকাশানুসারে অনুবাদের তত্ত্বাবধান। কিন্তু কালীপ্রসন্ন স্বয়ং 'বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন' পেয়েছিলেন বলে তাঁর অনুবাদের ভাষা মহাভারতের বিদ্যা-সাগরী অনুবাদের ভাষার চেয়ে সহজ ও সরল—বিশেষ করে

ক্রিয়াপদ, সমাস ও যৌগিক শব্দসমষ্টির ক্ষেত্রে তো বটেই। সত্যিকারের অনুবাদকের দৃষ্টি ছিলো কালীপ্রসন্নের। তিনি মূল মহাভারতের কোন অংশই বাদ দেননি, অথচ বাদ দিয়েছেন আপাতরঞ্জন অমূলক অংশগুলি। বিভিন্ন পুথির পাঠ-ভেদের দরুণ অনুবাদের কাজ সহজসাধ্য ছিলো না, বহুস্থলের বিরুদ্ধভাবের মীমাংসা ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণেরও প্রয়োজন ছিলো। কালীপ্রসন্ন পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সঠিক পাঠ ও অর্থোদ্ধার করেছেন।

তবে বাঙলা গদ্যে মহাভারতের জন্য নয়, হুতোম প্যাঁচার নক্সার জন্যই কালীপ্রসন্ন অধিকতর স্মরণীয়। আলালের মতো হুতোমও সমাজের ব্যঙ্গচিত্র—ছদ্মনামের আড়াল থেকে তিনি দেশের নানা দুষ্ট ক্ষতের ওপরে—তার হুজুকপ্রিয়তা আর ভণ্ডামি, মূর্খতা আর বাবুয়ানা, কুসংস্কার আর ইতরামির ওপর শর নিক্ষেপ করেছেন। এদের উদ্দেশ্য এক বটে, কিন্তু আঙ্গিক আলাদা। আলাল উপন্যাসধর্মী, হুতোম নক্সাজাতীয়। টেকচাঁদের লেখায় চরিত্রের ক্রমবিকাশ আর কাহিনীর পারম্পর্যের ওপর জোর, আর হুতোমের জোর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্র ও বর্ণনার ওপর। তাই একজন বিদগ্ধ রসিক কালীপ্রসন্নের নক্সাটিকে বলেছেন—চিত্রশালা, পিক্চার গ্যালারী। এতে উপন্যাস নয়, রম্যরচনার রস আছে। অতএব হুতোম প্যাঁচার নক্সাকে সামাজিক উদ্দেশ্য ও সাহিত্যিক সিদ্ধি উভয় দিক থেকে বিচার করতে হবে এবং সে-বিচার হবে আলাদা-ভাবে নয়, একই সঙ্গে।

হুতোম কলকাতার বাবুসমাজের বিলাস আর নীতিহীনতার নক্সা। এ নিছক গালগল্প নয়, ঈর্ষা বা ক্রোধসঞ্জাত কাহিনীও নয়,—এ হচ্ছে সহৃদয় সামাজিকের দৃষ্টিতে সমুদ্ভাসিত একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের রঙ্গরূপ; এর পেছনে আছে সুবুদ্ধির প্রণোদনা, বৃহত্তর কল্যাণের নীলদিগন্ত। অবশ্য লেখকের দৃষ্টি এখানে তির্যক; সমাজের আলো তাতে প্রতিফলিত (reflected) নয়, প্রতিসৃত

(refracted)। আঘাত যাতে জোরালো হয়, যাতে রসাকর্ষণ হয় দ্বিগুণতর, তারই জন্য হুতোমের কলম বাঁকা রেখা নিয়েছে, অতিরঞ্জন ও অতিকথনে অধঃকৃতদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে একটা প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ। নক্সার এই সামাজিক উদ্দেশ্য বিফল হয়নি। হুতোমের নিজের মুখেই শুনতে পাই—'যেগুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদসা, তারা "দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কি না ?" কিংবা "কি গাল দিয়েছে" বলেও অন্ততঃ লুকিয়ে পড়েছে ; সুদু পড়া কি,—অনেকে শুধ্‌রেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েছে ও প্রকাশ্য বেলাল্লাগিরি, বদমাইসী, বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েছে।' একথা সত্য, অন্ততঃ তার লিখিত প্রমাণ আছে। হুতোমের নক্সার অনুকরণে বটতলায় প্রায় শ দুয়েক চটি বই বেরোয়, আর 'বদ্‌মায়েসরা' চমকে গিয়ে উতোর গাইতেও দ্বিধা করেনি। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' হুতোমের প্রত্যুত্তর। কিন্তু কালীপ্রসন্নের কাছে যেদিন ভোলানাথ ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিজের বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছায়, সেদিন বিরোধীদের প্রতিবাদ পরিণত হয়েছিলো পরাজয়ে। আসল কথা, হুতোমে সাহিত্যিক কুরুচি নয়, সামাজিক সুরুচির জয়যাত্রা।

নক্সায় অলীক বা অমূলক কিছু নেই, এ-দাবিও মেনে নেওয়া যায়। এতে তখনকার দিনের অনেকের চেহারা দেখি—কোথাও কোথাও বেনামে, কোথাও বা সামান্য মাত্র আড়াল রেখে। কালীপ্রসন্নের চোখ ছিলো খোলা, ইন্দ্রিয় ছিলো সচেতন—সংসারে যা ঘটতো তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো না। এই খোলা চোখের সাধনা হুতোমে এনেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসাবেশ, বস্তুনিষ্ঠ আবহাওয়া ও অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত কৌতুকের স্বাদ। এই তন্নিষ্ঠতা-প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের উক্তি স্মরণযোগ্য—'সত্যই বটে, অনেকে নক্সাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক

সেটি যে তিনি নন, তা আমার বলা বাহুল্য। তবে কেবল এই মাত্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই, অথচ সকলেরই লক্ষ্য করিচি। এমন কি, স্বয়ংও নক্সার মধ্যে থাকৃতে ভুলি নাই। অর্থাৎ বাস্তবাশ্রিতকে বাস্তবাতীত, ব্যক্তিগতকে নৈর্ব্যক্তিক, বিশেষকে নির্বিশেষ করতে তাঁর চেষ্টার ক্রুটি ছিলোনা; তাই তাঁর লেখায় পরিচিত ছবির মধ্যেই বৃহত্তর সামাজিক ছবি ফুটে উঠেছে, ব্যক্তি-প্রসঙ্গ সর্বজন-অধিগম্যতা না হোক রসবেত্তা-অধিগম্যতা লাভ করেছে। এবং তাতেই হুতোমের সাহিত্যিক সিদ্ধি।

হুতোমের এই সামাজিক উদ্দেশ্যপ্রাণতা ও বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে তার অতিরঞ্জনপ্রবণতার যাথার্থ্য বিচার করতে হবে। ব্যঙ্গরচনায় অতিরঞ্জন স্বাভাবিক—কারণ তাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মনে আঘাত আসে বেশি, সত্যের সঙ্গে কল্পনার মিশেল দিলে তাদের পক্ষ থেকে জোরালো প্রতিবাদ দেখা দেয়। ফলে বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে যে আলোড়ন জাগে, তা-ই নির্দেশ দেয় অনুসরণীয় পথের, আচরণীয় কর্তব্যের ও আকাঙ্ক্ষণীয় সিদ্ধির। যেমন অতিরঞ্জন, তেমনি অতিকথনেও' বিদ্রূপের রস ও কষ জমে ওঠে—কারণ তাতে নানা বাক্যজালে ব্যূহ রচনা করে আক্রমণের কূটকৌশল অবলম্বন করা যায়। ব্যঙ্গের তৃতীয় অস্ত্র বক্রোক্তি—সোজাভাবে বললে যে ফল ফলে, তার চেয়ে বেশি ফল ফলে বাঁকা কথায়। কালীপ্রসন্ন তাঁর সামাজিক বিদ্রূপের তূণে এই তিনটি ব্রহ্মাস্ত্রই সন্নিবেশ করেছেন এবং প্রয়োজন মতো তাদের ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। অতিরঞ্জনের একটা উদাহরণ ধরুন। বাবুসমাজ ব্যভিচারী, এটা সত্যভাষণ; কিন্তু 'মাহেশের স্নানযাত্রায়' গুরুদাসের আপন বিধবা পিসিকে নিয়ে বেলেল্লাগিরি নিষ্ঠুর অতিরঞ্জন। মেয়েমানুষ পাওয়া গেলো না জেনে কেদারের মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার কথা ঠিক, কিন্তু বিষয়টাকে আরও একটু টেনে নিয়ে কালীপ্রসন্ন মন্তব্য করলেন: 'জয়কেষ্টো মুখুজ্জে জেলে যাওয়াতে তাঁর প্রজাদের এতো দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে রামের কাটামুণ্ড দেখে অশোকবনে

সীতে কত বা দুঃখিত হয়েছিলেন ?' কেদারের রিরংসাপ্রবণতাকে আঘাত করবার জন্য এই তুলনামূলক বাক্যবিস্তার, এই অসংলগ্ন অতিকথন। বক্রোক্তির অজস্র নমুনা ছড়িয়ে আছে হুতোমে। 'কৃশ্চানি হুজুক'-এর বর্ণনায় পড়ি—'সেই হিড়িকে একজন স্কুল মাষ্টার, কালীঘেটে হালদার, একজন বেণে ও কায়স্থ কৃশ্চান দলে বাড়লো—দুচার জন বড় বড় ঘরের মেয়েমানুষও অন্ধকার থেকে আলোয় এলেন !' শেষ বাক্যাংশটি বাঁকা ছুরির মতো বুকে এসে লাগে।

কিন্তু এই তীব্র স্যাটায়ারে শুধু ইস্পাতের তীক্ষ্ণ ঝকঝকে ফলাই নেই, আছে প্রচ্ছন্ন সমবেদনার ফল্গুস্রোত। মনে রাখতে হবে, ব্যঙ্গে থাকে একটা বুদ্ধির ব্যায়াম-কৌশল, শুদ্ধবুদ্ধির চর্চাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু কালীপ্রসন্ন এখানে সহৃদয় সামাজিক, দেশের কল্যাণব্রতী, সত্যিকারের প্রগতিশীলতার সমর্থক। তাই যেখানে অন্যায়, অসত্য, ব্যভিচার ও ইতরামি দেখেছেন—দেখেছেন মূর্খতা, ভণ্ডামি ও বিভ্রান্তি—সেখানেই তিনি খড়্গহস্ত। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রোশ বা সমষ্টিগত বিদ্বেষ থেকে নেতিবাচক ধ্বংসের মনোভাব নিয়ে তিনি অগ্রসর হননি, তিনি এখানে অধঃপতিত সম্প্রদায়ের সংশোধনপ্রয়াসী, পরিবর্তনকামী। এই সদিচ্ছাই হুতোমকে মহত্ত্ব দিয়েছে, শ্লেষশিল্পীর সৃষ্টিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। 'বদমায়েসদের' তিনি দণ্ড দিয়েছেন, কিন্তু দণ্ডদাতার নিজের চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে ; চাবুক তুলতে গিয়ে তিনি নিজের বুকেও তুলেছেন দীর্ঘশ্বাস। এই সহানুভূতি ও সহৃদয়তা বিদ্রূপের সহগ হয়েছে বলেই 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' মহাভারতের অনুবাদক ছোট হয়ে যাননি, বরং দেশবাসীর আত্মশুদ্ধির যজ্ঞে হোতা হয়ে উঠেছেন।

স্মরণ করুন, মিউটিনির প্রসঙ্গ। 'রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জান্‌তে পারে, সেইরূপ মিউটিনির উপলক্ষে গভর্ণমেণ্টও বাঙ্গালী শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জানতে অবসর

পেলেন ; "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" আশা ও মানভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বলতেছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঙ্গালীদের দেখতে লাগলেন— আমরাও স্কুল ছাড়লেম। আঃ। বাঁচলেম—গায়ে বাতাস লাগলো'। কালীপ্রসন্ন বাঙালীর কাপুরুষতাকে এখানে ক্ষমা করেননি, তাদের ঝোপ বুঝে কোপ ফেলার পটুত্বকে করেছেন উপহাস—তবু শেষ বাক্যটির মধ্যে স্কুল ছেড়ে বাঁচার কথায় যেন সুখের নয়, এক পরম দুঃখের ব্যঞ্জনাই বেজে উঠেছে। 'রেলওয়ে' চিত্রে তিনি বাবাজীদের হরিনামের ঝুলিতে সকৌতুকে উঁকি মেরেছেন, হরিনাম করতে করতে তাদের গলা শুকিয়ে উঠলে ঝুলির মিষ্টান্ন দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের কথা বলতেও ছাড়েন নি—তবু রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কষ্টের কথা ভুলতে পেরেছেন কই! বারোয়ারি পূজোর প্রসঙ্গে বীরকৃষ্ণ দাঁকে ঘিরে লেখকের শানানো ছুরি ঝিকমিক করে ওঠেছে, কিন্তু সেই ঝিকিমিকিতে ঢাকা পড়েনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে জেলে-যাওয়া আমমোক্তার কানাইধনের পরিবারের মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত করার ইতিহাস। তাই হুতোম গভীরতর উপলব্ধির পটে কৌতুকের হাল্‌কা মেঘের মেলা।

হুতোমের আলোচনায় সুরুচির প্রশ্ন উঠেছে। অশ্লীলতা, স্থূলতা ও পাঁক ঘাটার উৎসাহ বইটিতে সুস্পষ্ট বলে অনেকে মনে করেন, তাই অপরুচির দায়ে তাঁদের কাছে কালীপ্রসন্ন অভিযুক্ত। কিন্তু রুচি জিনিষটা কালগত এবং আরো অনেক কিছুর মতোই তারও ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতি ঘটে। তাছাড়া, রুচির কোন স্থির মান নেই, কোন বাঁধাধরা চরিত্র নেই ; একজনের পক্ষে যা রুচি-সম্মত, অন্যের পক্ষে তা-ই রুচির বিকার। নীলদর্পণের তোরাপের মুখে যা মানায়, নবীনমাধবের মুখে তা মানায় না। হুতোমের অশ্লীলতা ও স্থূলতাকে ধিক্কার দেওয়ার আগে একথাগুলি মনে রাখা দরকার। বীরকৃষ্ণ দাঁ, পদ্মলোচন দত্ত, গুরুদাস গুঁই ইত্যাদির টাকা ছিলো, কিন্তু রুচি ছিলো না। রুচির অনুশীলন যে শিক্ষা

বা পারিবারিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে, এরা তার নাগাল পায়নি। সুতরাং এদের নেশা ও কামাতুরতার বর্ণনায় কম-বেশি স্থূলতা অনিবার্য; কারণ এ-স্থূলতা রয়েছে তাদের চরিত্রে, তাদের জীবনের পাশে পাশে। গুরুদাসের নৌকাবিলাস কিংবা রামহরি বোসের প্রসঙ্গে সোনাগাছির চিত্র প্রক্ষেপ নয়, সমগ্র চরিত্র ও পরিস্থিতির সঙ্গে তা জড়িত। একমাত্র গুরুদাস গুঁইয়ের (মাহেশের স্নানযাত্রা) আপন বিধবা পিসিকে নিয়ে কামাতুরতা আমাদের চিরাগত রুচি-ঐতিহ্যের বিরোধী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে,—হুতোমে স্থূলতা আছে, পাঁকের বর্ণনায় অসংযমের পরিচয় আছে, কিন্তু বিরল ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র অশ্লীলতা নেই। ব্যঙ্গরচনা বলেই অতিরঞ্জনের সূত্রে অসংযমের আত্মপ্রকাশ, তবে সেই রস-সাহিত্যের অভাবের যুগে ব্যঙ্গটাকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর দরকার ছিলো।

আগে বলেছি, হুতোম উপন্যাস নয়, খণ্ডচিত্রমালা। সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিলো না, রঙের বিন্যাসেও তিনি মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর হাতে ছিলো ব্রাশ, তারই দু'চারটে টানে তিনি ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু সরল রেখার চেয়ে তির্যক রেখার দিকে দৃষ্টি ছিলো বলে তাঁর ছবিতে নূতনত্ব আছে। আবার কোথাও রঙ ও রেখার অতিরেক দেখতে পাই, ঝোঁক দেখতে পাই খুঁটিনাটি বর্ণনার (details) দিকে। সে সমস্ত ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বেশ সজীব ও সরস দৃশ্য ফুটে উঠেছে—কিন্তু সুশৃঙ্খলায় সমগ্রভাবে কোন রূপাবয়ব ব্যক্ত হয়নি। 'কলিকাতায় চড়ক পার্বণ', 'হঠাৎ অবতার' ইত্যাদি এই ধরণের অগোছালো রচনা। অন্যদিকে কয়েকটি নক্সায়—'রথ,' 'ভূত-নাচানো', 'জষ্টিস্ ওয়েলস্', 'মিউটিনি', 'মহাপুরুষ' প্রভৃতিতে পরিমিত পরিসরে রচনা-সাহিত্যের নিটোল রসরূপ প্রস্ফুটিত। 'মাহেশের স্নানযাত্রা' সেকালের বাবুর উপাখ্যান—তাই যতটা নববাবুবিলাস ও আলালের সমধর্মা, ততটা রচনা-

সাহিত্য (literary essay) নয়। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হয় খোলামেলা খুশিমাফিক অবিন্যস্ত লেখায় নয় পরিমিত সংযত জীবন্ত বর্ণনায়, স্থানে চাপা হাসির ব্যঞ্জনায়—স্থানে উচ্চকিত ব্যঙ্গের ক্রূর আঘাতে হুতোম কম-বেশি রচনার ধর্ম লাভ করেছে। যদি রুচিকে আর একটু শোভন, দৃষ্টিকে অধিকতর অনাবিল, ভাষাকে সুষ্ঠুতর ও বর্ণনাকে আরও শিল্পসম্মত করতে পারতেন, তবে কালীপ্রসন্ন হতে পারতেন সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাকার।

হুতোমের ভাষাকে আলালের ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করতে হবে। টেকচাঁদ-প্রসঙ্গে ভাষার কথ্যভঙ্গি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি। কালীপ্রসন্নের নক্সাটি কলকাত্তাই কথ্য ভাষায় রচিত, তাতে আলালী ঢঙের ক্রিয়াপদের মিশ্র বা সম্পৃক্তরীতির ত্রুটি নেই। ব্যাকরণের দিক থেকে বিশুদ্ধতর নয়, ব্যঙ্গাত্মক রচনার পক্ষে অধিকতর উপযোগী ভাষা প্রয়োগের কৃতিত্ব তাঁকে দিতে হবে। নিছক কলকাত্তাই কথ্য ভাষার ব্যবহার করে তিনি ভুল করেন নি, ভুল করেছেন তার মার্জিত ও শিল্পসম্মত রূপ না দিয়ে। অবশ্য তার জন্য বাঙলা গদ্যকে প্রমথ চৌধুরীর কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু প্যারীচাঁদের মিশ্র ও সম্পৃক্ত রীতির অনুসরণে যে সাহসিক পরীক্ষা (bold experiment) অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, কালীপ্রসন্নের লেখায় আছে তারই পূর্ণতর পরিচয়।

আলালের মতো হুতোমও পূর্ববর্তী গদ্যরচনার ত্রুটি স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেকদিন সাধারণের রসপিপাসার খোরাক গদ্যসাহিত্য সরবরাহ করতে পারেনি, তা প্রাকৃত জনের বোধ ও বুদ্ধির নাগালের বাইরে এক মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত হয়ে রইলো। বৈচিত্র্য ও নানামুখিনতারও অভাব ঘটলো সাহিত্যে। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের গভীরে, নিজের দেশ ও সমাজের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত না করে শুধুই সংস্কৃতের এবং কিছুটা ইংরেজীর কুণ্ডে

গদ্যসাহিত্য সীমায়িত থেকে গেলো। তাতে প্রাকৃত জন খুঁজে পায়নি আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর, সংসারের বিচিত্র সমস্যার রূপচিত্র ও পরিবর্তমান সমাজ-মানসের কথাভাষ্য। আলালের মতো হুতামও বাঙলা গদ্যের সেই অভাব ঘুচিয়েছে। তাতে ভাষার কৌলীন্য না থাক, ঠমক আছে; শুদ্ধশ্রী না থাক সজীব প্রাণ আছে; গাম্ভীর্য না থাক, সরসতা আছে। হুতোম-আলাল বাঙালা গদ্যের লোকসান ঘটায়নি, তারা এসেছিলো বলেই বঙ্কিমের অমন সপ্রাণ গদ্য আমরা পেয়েছি।

৮ ঈশ্বর গুপ্ত

কাঁঠালী চাঁপা ঈশ্বর গুপ্তের উপমা। সে না ফুল না পাতা এবং দু'মনা করাই তার দুর্গতির মূল। আমাদের অবুঝ চোখ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তেমনি ঈশ্বর গুপ্ত না সেকালের না একালের এবং সেই ত্রিশঙ্কু অবস্থাতেই তাঁর অজনপ্রিয়তার কারণ নিহিত। এক তরুণ সমালোচক বলেছেন, তিনি গ্রীক পুরাণের জেনাস্—তাঁর এক মুখ গত দিনের দিকে, আর একটি মুখ অনাগত দিনের দিকে। দেবতার মহিমায় কটাক্ষ না করেও বলা যায়, পৌরাণিক কল্পনায় জেনাসের অবস্থাটা খুব সুদৃশ্য ও সুখাবহ হয়ে ওঠে নি। ঈশ্বর গুপ্তও দু'মনা করেছিলেন—অতীতকে ছাড়তে চাননি, অথচ ভবিষ্যৎকে ঠিক ধরতে পারেন নি। ফলে তাঁর বিসদৃশ দশা সুস্পষ্ট। এবং তাতে পাঠকের বিদ্রূপ না হোক অবজ্ঞার অভাব ঘটেনি।

অথচ ঈশ্বর গুপ্ত সেকালের অনন্য সাহিত্যগুরু। তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরের' পৃষ্ঠায় অনেক কবিযশঃপ্রার্থীর হাতেখড়ি। কবিবাক্য অনুসারে গুরুর চেয়ে গুরু বস্তু আর না থাকলেও গুরুর ধর্ম গৌরব-বর্জিত। ঈশ্বর গুপ্তের অনুরাগীর দলে ছিলেন—বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু, রঙ্গলাল, অক্ষয় দত্ত, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (পরে বিরুদ্ধবাদী) এবং আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ খ্যাতি অর্জন করেছেন বিস্তর, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন পেয়েছেন—শুধু ঐতিহাসিক মূল্যে নয়, নিছক সাহিত্যিক মূল্যে। অথচ গুরু ঈশ্বর গুপ্ত রইলেন প্রায় অবজ্ঞাত। এ কিছুটা ভাগ্যের পরিহাস, কিছুটা গুপ্তকবির

স্বয়ংকৃত অপরাধ। সে অপরাধ কোথায় তা বিচারের আগে তাঁর জীবনটা একটু জেনে নেওয়া দরকার।

শেয়ালডাঙ্গা কুঠির আট টাকা মাইনের কর্মচারী কাঁচরাপাড়ার হরিনারায়ণ গুপ্তের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। পিতা দরিদ্র—তাই তাঁর শৈশবে সচ্ছলতার আস্বাদ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। দশ বছর বয়সে মাকে হারিয়ে বিধাতার দান মাতৃস্নেহ থেকেও বঞ্চিত হলেন তিনি। মামার বাড়িতে তাঁর স্থান হলো—কারণ বিমাতার গঞ্জনার চেয়ে তা মন্দের ভালো, কিন্তু স্নেহ কতটুকু পেলেন বলা শক্ত। কারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর যে লেখাপড়া হলো না, তা কি যত্ন ও শাসনের অভাবে নয়? পনের বছর বয়সে ঈশ্বর গুপ্ত বিয়ে করলেন, অথচ স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করার সুখ ভোগ করেননি কোন দিন। এক কথায়, সংসার—বিশেষ করে নারী তাঁকে বঞ্চনা করেছিলো, পারিবারিক মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর প্রাপ্য পান নি। |এই সুখহীন প্রেরণাহীন পারিবারিক আবহাওয়াই হয়তো যন্ত্রণায় তাঁকে পরিহাস-চটুল ও ব্যঙ্গপ্রবণ করেছে। ব্যঙ্গের জন্ম এক ধরণের নিরাসক্তি থেকে, একথা মনে রাখলে ঈশ্বর গুপ্তকে বোঝার সুবিধা হয়।|

ঈশ্বর গুপ্ত ছেলেবেলা থেকেই স্বভাব-কবিত্বের অধিকারী। মুখে মুখে ছড়া কাটা ও কবির দলের গান বাঁধাতেই সে-কবিত্ব তখনকার মতো সীমাবদ্ধ ছিলো। তারপর আঠারো শ' একত্রিশে বন্ধু (পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর পরিবারের) যোগেন্দ্রমোহনের উৎসাহে 'সংবাদ-প্রভাকরের' আবির্ভাব। উনিশ বৎসর বয়স্ক ঈশ্বরচন্দ্র হলেন সম্পাদক। দীর্ঘজীবী প্রভাকর কখনও সাপ্তাহিক, কখনও বারত্রয়িক, কখনও দৈনিক পত্র হিসেবে বাঙলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। মাঝে কিছুদিনের জন্য বন্ধ হলেও তার জয়যাত্রা ঈশ্বর গুপ্তের উৎসাহে ছিলো অব্যাহত। এই পত্রটিকে কেন্দ্র করে এক লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলা তাঁর কৃতিত্বের নিদর্শন। প্রাচীনপন্থীরা এর সমর্থক ছিলেন, কিন্তু নবীন-

পন্থীরা একেবারে বিরূপ ছিলেন না। যদি তাঁরা বিমুখ হতেন, তবে প্রভাকরের অনুরাগীর তালিকায় গুপ্তকবি রেভাঃ কৃষ্ণমোহন, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির নাম উল্লেখ করতেন না। বিষয় ও মর্জির দিক থেকে রঙ্গলাল ও অক্ষয় দত্ত দু'জনেই আধুনিক, অথচ তাঁরা প্রভাকরে তাঁর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেছিলেন। বঙ্কিম মনে করিয়ে দিয়েছেন—'ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিসদিগের একটা কীর্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিস ছিলেন।' সুতরাং বাঙলা সাহিত্যের অনুশীলনে প্রভাকরের সম্পাদক গুপ্তকবির নিরন্তর উৎসাহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু তাঁর নিজের দিক থেকেও পত্রিকাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কবিগানের বাঁধনদার যে সাহিত্য-গুরু হলেন, তার মূলে দেখতে পাই প্রভাকরের আশীর্বাদ। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই প্রভাকরের কোলে ভূমিষ্ঠ। একখানি বহু-প্রচারিত কাগজের অবারিত দ্বারের সুযোগ না পেলে ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা হয়তো গুপ্ত থেকে যেতো, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট হতো না। প্রভাকর ছাড়া তিনি আরও তিনটি পত্র সম্পাদনা করেন—'সংবাদ রত্নাবলী', 'পাষণ্ড পীড়ন', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'। তিনটিই সাপ্তাহিক, কিন্তু এদের কোনটিই প্রভাকরের চেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করতে পারে নি।

গুপ্তকবি শুধু সাহিত্যবৃত্তে নয়, সেকালের নানা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জড়িত ছিলেন। ধর্মসভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, নীতিতরঙ্গিণী সভা, নীতিসভা ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উপেক্ষণীয় নয়। সর্বত্র, বঙ্কিমের মতে, তাঁর সম্মান ও সমাদর ছিলো। তিনি শুধু 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' কবিতা ছেপে নয়, নববর্ষের দিনে প্রভাকর কার্যালয়ে সাহিত্যসভা আহ্বান করে ও পুরস্কার দিয়ে তরুণদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার্হ।

কিন্তু গুপ্তকবির জীবনের আলোচনায় তাঁর মনোভাবের ক্রম-

বিকাশ বিচার করে দেখা দরকার। সূচনায় বলেছি, তাঁর দোটানার কথা। প্রচলিত ধারণা তিনি যুগসন্ধির মানুষ। মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদক ও সামাজিক জীবনের শুরু সংরক্ষণধর্মের দীক্ষা নিয়ে। বত্রিশ সালে প্রভাকর-সম্পাদকের ওপর 'বেঙ্গল হরকরার' আক্রমণ ও নব্যপন্থী হিন্দুকলেজ-কর্তৃপক্ষের তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, তিনি ধর্মসভার আরেক জন সভ্য জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের আনুকূল্যে 'সংবাদ রত্নাবলী' সম্পাদনা করেন। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের অনুমান, আটত্রিশ সাল থেকে গুপ্তকবির মনোভাবের পরিবর্তন হতে থাকে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন,...Prubhakar ..is supported by the influence of the liberal party.। দেবেন্দ্রনাথ, তত্ত্ববোধিনী সভা, ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজসংস্কারমূলক নানা কাজের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগও তাঁর মনোভাবের অনতিক্রুত পরিবর্তন সূচিত করে। বারো শ' আটত্রিশে যে প্রভাকর-সম্পাদক, 'সমাচার-চন্দ্রিকার' মতানুসারে, ধর্মসভার পক্ষে ছিলেন, সেই গুপ্তকবিই বছর সতেরো পরে ধর্মসভার বিপক্ষে প্রভাকরে মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন নি। সতীদাহ-সমর্থক ধর্মসভার এই বিশিষ্ট সভ্যের মুখেই সতীদাহ-নিরোধের সমর্থনের কথা আমরা শুনেছি। অতএব ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাবের ক্রম-পরিবর্তন তথ্যভিত্তিক সত্য—একথা অস্বীকার করিনে।

কিন্তু সমস্ত বিষয়টাকে শুধু রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতায় দ্বিধাবিভক্ত করে ঈশ্বর গুপ্তের চিত্তসঙ্কটের ছবি আঁকার বদলে অন্যভাবেও বিষয়টাকে পরিবেশন করা যায়। রক্ষণশীলতা আসলে তাঁর ঐতিহ্যবাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দূরাগত জাতীয় ঋদ্ধিকে ঐতিহ্য বলা হয়, কিন্তু কালানুক্রমে সেই ঐতিহ্যের ওপর অর্বাচীন ছাপ পড়ে। অবশ্য যতক্ষণ শুধুই ভাঙ্গা-গড়ার আলোড়ন, ততক্ষণ নয়—কিন্তু ভাঙ্গাগড়ার মধ্য থেকে

কতগুলি স্থির মূল্যবোধ দেখা দেওয়ার পরে ঐতিহ্যেরও নতুন উপকরণ দেখা দেয়। আঠারো শ' একত্রিশে নতুন কালের অভ্যন্তরে নতুন মূল্যবোধ ঈশ্বর গুপ্তের চোখে ধরা পড়েনি সত্য, কিন্তু পঞ্চম দশকের শেষদিকে তা অনেকটা নির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে। তাই তাঁর প্রথম দিকের ঐতিহ্যবাদে দূরের প্রতি আকর্ষণ প্রধান হলেও শেষ দিকে নিকট-সত্যের উপকরণও তাতে স্থান লাভ করে। এক কথায়, ঈশ্বর গুপ্তের মতান্তরে প্রবেশের কালটা হচ্ছে নতুন কালের মধ্য থেকে ঐতিহ্যের নতুন উপাদান সৃষ্টির কাল। এবং সে দিক থেকেই তাঁর মানসিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা ভালো।

গুপ্তকবির এই ঐতিহ্যবাদ আসলে লৌকিক। পৌরাণিক ঐতিহ্য তাঁর মনোহরণ করলে তিনি হয়তো ভবানীচরণের মতোই অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকতেন। বাঙলা দেশের লৌকিক ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন মনের ঠাঁই। সাহিত্যে সেই জনগণের ঐতিহ্যকে তিনি দেখেছিলেন কবি ও আখড়াই গানের মধ্যে। সুশিক্ষার সুযোগহীন জীবনে লোকসঙ্গীতের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিলো তাঁর। তাই কবিগানের উৎসাহদাতা যোগেন্দ্রমোহন হলেন তাঁর বন্ধু, কবির দলের বাঁধনদার প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ হলেন প্রভাকরের লেখক, কবি জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক হলেন তাঁর সাহিত্যজীবনের আশ্রয়দাতা। পারিবারিক ক্ষেত্রেও ছিলো লোক-সঙ্গীতের অনুকূল। জনজীবনের চলমান প্রবাহে যিনি রসরুচির খোরাক খুঁজেছিলেন, পরিবর্তনের স্রোত তাঁর কাছে অস্বাভাবিক নয়।

তাঁর এই লৌকিক ঐতিহ্য-পূজার গভীরতর সাহিত্যিক তাৎপর্য এবার ব্যাখ্যা করা যাক।

ঈশ্বর গুপ্ত সুশিক্ষিত ছিলেন না। অশিক্ষিতপটুত্বের পুরুষার্থ নিয়ে আবিভূ্ত হয়েছিলেন বলেই উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর নির্বিচার ভাববিলাসের দাসত্ব তাঁকে করতে হয়নি। বাঙলা দেশে

ইংরেজ শাসনে বুর্জোয়াতন্ত্রের অপূর্ণতায় যে সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্ম, তাতে স্বাধিকারবোধের প্রশ্রয় থাকলেও বৃহত্তর সামাজিক সমর্থন ছিলো না। তার ফল, আজকের দিনেও মনে হয়, সর্বথা ভালো হয়নি। শিক্ষিতদের অর্বাচীন সাংস্কৃতিক অন্বেষণে দেশজ মনোবৃত্তি আর লোকচৈতন্যের সূত্র স্বীকৃত হলো না—ক্লাসের (class) সঙ্গে মাসের (mass) যুক্তিসম্মত সম্বন্ধক্ষেপের শুভবুদ্ধি ও সুস্থ মনোভাব তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অথচ তখনও জন-জীবনের দৃষ্টির আশ্চর্য ফলন দেখি যাত্রা, পাঁচালী ও কথকতার আসরে—পট, পুতুল ও আল্পনার শিল্পচর্চায়—ব্রতকথা, ছড়া আর রূপকথার লৌকিক সাহিত্যকর্মে।

এই পূর্বাগত ঐতিহ্যের দায়ভাগ থেকে বঞ্চিত বলেই আমাদের উনিশ শতকের সংস্কৃতি নিতান্তই শিক্ষিত সমাজের অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রামমোহনের চিন্তা, কর্ম ও রচনায় যতখানি শুদ্ধবুদ্ধির চর্চা ও দৃষ্টির আবিলতার নিরাকরণ, ততখানিই তিনি নবযুগের অগ্রদূত—কিন্তু তিনি 'সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্র' অর্থাৎ পৌরাণিক ঐতিহ্যের অনুশীলনের দ্বারা নয়া কালের নতুন ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর মতো স্বচ্ছ-দৃষ্টি ভগীরথের চোখে বাঙালীর চিরাগত লৌকিক জীবনের সঙ্গে বর্তমান প্লুতগতি জীবনের সাযুজ্য-রক্ষার দায় ধরা পড়লো না কেন ভাবতে অবাক লাগে। অথচ সেই ঈপ্সিত সম্বন্ধবিন্যাসে—সেই কর্মঠ, প্রত্যক্ষপন্থী ও জীবনোৎ-সারিত প্রাকৃত কন্ভেন্সনের সঙ্গে মননসমৃদ্ধ ও বৈদগ্ধ্যমার্জিত আধুনিক সফিস্টিকেসনের বিবাহযোগে সৃষ্টির সার্থকতার প্রমাণ দেখি অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। তাই উনিশ শতকী রেণেসাঁসের প্রারম্ভে বিরোধ অনিবার্য ছিলো—ঐতিহ্যের চেনাপক্ষের সঙ্গে নবাগত প্রাণচৈতন্যের।

ঈশ্বরগুপ্ত সেই বিরোধে, সেই অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার বিভ্রান্তির যুগে দেশজ উত্তরাধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই চেনাপক্ষ নিরাপদ ও দায়িত্ববর্জিত বলেই গুপ্তকবির আশ্রয়স্থল ছিলো

না—তাঁর মতো বস্তুবাদী জীবনরসিক চক্ষুষ্মান কবি-সম্পাদকের কাছে তা আশা করা স্বাভাবিক নয়। |আসল কথা, যে শ্রেণীগত ও ভাবগত সংঘাত-সংযোগে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা পরিবর্তমান ও প্রাণবান, তাতে সচেতন মানুষমাত্রকেই একটা পক্ষ নিতে হয়—কিংবা দোটানায় বিধ্বস্ত হতে হয়।| ঈশ্বর গুপ্ত ঐতিহ্যের চেলাঞ্চল ধরেছিলেন, কারণ এতেই তাঁর প্রত্যয়ের স্ফূর্তি ছিলো সুনিশ্চিত। অন্য দিকটাও তাঁর চোখে পড়েছে, কোথায়ও কোথায়ও সমর্থন করতেও তিনি দ্বিধা করেননি—কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপের দাবিতে ও নিজস্ব ঐতিহাসিক চেতনায় তিনি পূর্বাগত উত্তরাধিকারে মনের ঠাঁই খুঁজে পেয়েছিলেন। তখনকার উচ্ছৃঙ্খলতাও বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় তাঁকে রক্ষণশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, কখনও সেই উচ্ছৃঙ্খলতা মর্মের দাহনে তাঁকে হাসিয়েছে—তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নির্মম হয়ে উঠেছেন। সুতরাং নিজের সামাজিক প্রাণের গরজ আর ইতিহাস-চেতনার দাপটেই ঈশ্বর গুপ্ত সংরক্ষণশীল, নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্বাসের জন্য নয়। তাঁর কবিতা ও কবিজীবনীসংগ্রহ বিচারের কালে একথাগুলি স্মরণ রাখতে হবে।

॥ ২ ॥

কবি ঈশ্বর গুপ্তের এই দেশজ মনোবৃত্তি ও লৌকিক ঐতিহ্য-বাদের কথা তাঁর 'কবিজীবনীসংগ্রহ' ও কাব্যপাঠের ভূমিকায় স্মরণীয়। নতুন সমাজের আদলের ওপর লোকায়ত ঐতিহ্যের আঁচড় টেনে শিক্ষিত লেখকদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া একটা ঐতিহাসিক কাজ। অনাধুনিক সাহিত্যের ঐতিহ্য ভারতচন্দ্রের পর থেকে একটা নতুন বাঁক নেয়, দেবমহিমাকীর্তন নিতান্ত কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়, বিদ্যাসুন্দরের আদিরস এমন কি দেবদেবীর নামের আশ্রয়ে সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়ে। যে

ধর্মচেতনা প্রত্যক্ষভাবে প্রাচীন কাব্যে অনুস্যূত, তার মৃত্যু ঘটেছে ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই। মুকুন্দরাম বা চণ্ডীদাসের ধর্মপ্রাণতা রামপ্রসাদ ছাড়া আঠারো শতকের অন্য কবির মধ্যে নেই, থাকতেও পারেনা। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে বাঙলা দেশ প্রায় অরাজক; ভূস্বামীদের প্রতাপ নেই, বিলাস আছে; সাধারণ প্রজার কৃষিজীবিকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অথচ নতুন জীবিকার সন্ধান নেই। দিশি শিল্পও পেয়েছে প্রচণ্ড আঘাত। সেই স্থানীয় অর্থনীতির ভাঙনের সুযোগে দেখা দিলো নতুন এক আর্থিক সম্প্রদায়—কোম্পানীর প্রসাদপুষ্ট বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির দল। এই আর্থিক বিপর্যয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাঙনের দিনে প্রতাপহীন ভূস্বামী ও বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিদের মনোরঞ্জন করে রুজির ব্যবস্থা করতে গিয়ে কবি ও খেউড় প্রবর্তন করে নিম্নশ্রেণীর এক দল লোক। আখড়াই গান ছিলো কিছুটা পরিমাণে বিশুদ্ধ সঙ্গীতশিল্প, কিন্তু কবিগানের মিশেল নিয়ে তা-ও শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় হাফ আখড়াইয়ে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—কবিগান, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই ইত্যাদি তখনকার দিনের জনজীবনের আশ্চর্য প্রতিফলন। আর সেই জনসাধারণ নাগরিক হলেও মূলতঃ কৃষি ও শিল্পজীবিকাবঞ্চিত গ্রামীণ মানুষ। দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকেরাও নাকি কবিগানের আসরে ভিড় করতো। সে যাই হোক, এসব লোকসঙ্গীতে উচ্চ আদর্শ বা বলিষ্ঠ নীতি প্রকাশের সুযোগ ছিলো না; কারণ সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে তখন বিকৃতি ও অন্তঃসার-শূন্যতা। ভবানীবিষয়ক গানে ঐশ্বর্যভাবের তত্ত্ব পেয়েছে ঘরোয়া ছোঁয়াচ, তার পৌরাণিক মহিমা নিছক তত্ত্বের জগৎ থেকে নেমে এসেছে সাধারণ জীবনের আটপৌরে আঙিনায়। কবিরা ভক্তি চেয়েছেন, কিন্তু সংসারকে এড়িয়ে যেতে চান নি। আর আগমনী গানের সামাজিক পটভূমিকা ও করুণমধুর মানবিকতা বাঙালীর প্রাণের সুরে বাঁধা, সন্দেহ সেই। কিন্তু ভবানীবিষয়ক

গানগুলিও সামগ্রিক ভাবে উর্ধ্বায়িত আদর্শ বা পৌরাণিক মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। আর রাধাকৃষ্ণের গানে সামাজিক অধঃ-পতন থেকে জীবনের ক্লেদ যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। খেউড় রুচি-বিকারের সৃষ্টি, কিন্তু 'সখীসংবাদ' ও 'বিরহ' কম ক্লেদাক্ত নয়। অত্যন্ত সাধারণ লৌকিক ভাষায় কামান্ধ মানুষের বীভৎস প্রেমা-কুলতা ও প্রাকৃতজনোজিত কেলিবিলাস রাধাকৃষ্ণের নামে প্রচারের চেষ্টা স্থূল ও ন্যক্কারজনক। | কিন্তু ভুললে চলবে না, বলিষ্ঠ জীবন-প্রেরণা ও তত্ত্বাদর্শবর্জিত এই গানগুলি তখনকার অধঃপতিত জীবনযাত্রার শিলালিপি, মানসিক অবক্ষয়ের রক্তাক্ত স্বাক্ষর। |

কিন্তু অষ্টাদশ শতকেই এই অমার্জিত লোকসঙ্গীত রচনার প্রয়াস সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার জের চলেছে উনিশ শতকের ঈশ্বর গুপ্তের যুগ পর্যন্ত। রামমোহন ও হিন্দুকলেজের আমলে নতুন জীবন ও সাহিত্যের অভীপ্সা জেগেছে, কিন্তু বাবুসমাজ তখনও লুপ্ত হয়নি। বাবুর উপাখ্যান, নববাবুবিলাস, আলালের ঘরের দুলাল ও হুতোম প্যাঁচার নক্সায় যে চরিত্রমিছিল দেখতে পাই, তার প্রত্যক্ষ উপকরণ ছড়িয়ে ছিল বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেও। শুধু বাবুদের কথাই বা বলি কেন, কবিগান ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষক ধর্মসভার নেতাদের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। তারা পুরুষানুক্রমে বা ব্যক্তিগতভাবে যে অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন, তার পেছনে শ্রম ও সংগ্রামের কোন ইতিহাস ছিলো না। তাই চিত্তবিনোদনের লঘু উপকরণের দিকে ছিলো তাদের আকর্ষণ। ঈশ্বর গুপ্ত, আগেই বলেছি, কবিগানের বাঁধনদার ছিলেন। তাঁর বন্ধু ও পৃষ্ঠ-পোষকদের মধ্যেও কবিগানের সমাদর লক্ষণীয়। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত যে লোকসাহিত্যের উত্তরসাধক হয়েছিলেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তবে কবিগানের মতো লোকায়ত শিল্প থেকে গুপ্তকবি কি জাতীয় লৌকিক ঐতিহ্য আহরণ করেছিলেন বিচার করে দেখতে হবে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, কবিগান স্বয়ম্ভু বা

আকস্মিক নয়, তা বহুকালাগত পদগীতিরই ভগ্নরূপ। শুধু রূপের দিক থেকে নয়, ভাবের দিক থেকেও আঠারো শতকের কবিগান প্রাচীন বাঙলা কাব্যের কালানুক্রমিক সাংস্কৃতিক পরিণতি। তখনকার দিনে ধর্মবৃত্তের ভাঙন ও মানসিক স্থূলরসপ্রিয়তার বাস্তব কারণ ছিলো। সুতরাং কবিগান ইত্যাদিতে বাঙালীর ধর্মগত ঐতিহ্যের অস্বীকৃতি নেই, আছে তার স্বাভাবিক ক্ষয়িষ্ণু (decadent) প্রকাশ। অন্যদিকে অনাধুনিক সাহিত্যের ঐতিহ্যে আমরা যে জীবন-রস-রসিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতার সন্ধান পেয়েছি (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য), মঙ্গল, বৈষ্ণব ও লোকায়ত সাহিত্যে বহির্জগতের প্রতি যে সুস্থ মনোযোগ দেখেছি—আঠারো শতকের বিকৃত লোকসাহিত্যেও তার অসদ্ভাব ঘটেনি। এই মানবিক বস্তুনির্ভরতা স্থূল হয়েছে, কুরুচিপূর্ণ হয়েছে, হয়েছে প্রাকৃতজনোচিত —তবু তার উত্তরাধিকার উপেক্ষিত হয়নি। ঈশ্বর গুপ্ত কবিগানের দেশজ ঐতিহ্য থেকে আহরণ করেছিলেন তাঁর বস্তুনিষ্ঠতা, সহজ মানবিকতা ও বহিরাশ্রয়ী দৃষ্টির সরস স্বাভাবিকতা।

প্রথম ধরা যাক প্রকৃতির বর্ণনা। গরমের দিনে খরতাপে আমাদের অবস্থা দুঃসহ, বনের পশু থেকে অন্দরের নারী পর্যন্ত সকলেই তপ্ত দগ্ধ। মেয়েদের লজ্জার আবরণ না হলে চলে না, অথচ—

সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে অঞ্চলে না রাখে॥

এখানে শেষ পর্যন্ত কবির দৃষ্টির কৌতুক নিদাঘের তপ্তশয্যার ওপর শীতল আবরণ বিছিয়ে দিয়েছে। আর বর্ষায়—

সোনার দামিনী হার, গলায় দুলিছে তার,
আহা মরি কত শোভা তায়।
শেফলিকা প্রস্ফুটিত, অতিশয় সুশোভিত
জরির লপেটা লতা পায়॥

মেঘমালার গলায় দামিনী হারের বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘনিয়ে

আসে সৌন্দর্যের রস, কিন্তু সে রস স্থায়ী হওয়ার আগেই 'জরির লপেটা লতার' কল্পনা পাঠককে উপহাস করতে থাকে। আসল কথা, প্রকৃতি-বর্ণনায় কবি কোন সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে চান না, কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দিকেও তাঁর মন নেই—তিনি খোলা চোখে ঋতুরঙ্গ লক্ষ্য করেন, আর সময় বুঝে সংসাররঙ্গের দিকে পাঠকের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে একটু হাসির অবকাশ খোঁজেন। সে হাসিতে কোথায়ও কোথায় মিশে থাকে একটু হাহাকার, কবি ঠোঁটে হাসি নিয়েও দেখতে ভোলেন না সংসারের বাস্তব রূপ—

অনিবার হাহাকার, অর্থবল যত।
ঋণজালে বদ্ধ হয়ে অর্চ্চনায় রত॥

শরতের সঙ্গে জড়িত দুর্গোৎসব, সেই দুর্গোৎসবের ছবির মধ্যে ঋণজালের আভাস দিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত প্রমাণ দিয়েছেন নিজের চক্ষুষ্মানতার। শীতের কামড় তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—'চিরজীবী ছেঁড়া কাঁথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা, এতক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।' কবির জীবন-রস-রসিকতার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ সে যুগে আর কি হতে পারতো?

দেশ জুড়ে নীলকরদের অত্যাচার। গরীব চাষী আর ভূমি-নির্ভর প্রজার দুর্দশার অন্ত নেই। দেখে শুনে কবির বুকের মর্মজ্বালা শাসক ও শাসিতকে ঘিরে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস॥

*　　*　　*

আমরা ভুষি পেলেই খুসী হব,
ঘুষি খেলে বাঁচব না॥

নীলকরদের নিয়ে চিতেন গাইতে যাওয়ার সীমাবদ্ধ চেতনাকে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে ঈশ্বর গুপ্তের বিস্তৃত সমাজবোধ ও মানবিক সহানুভূতির পরিচয় পাই।

পোড়া আকালে নাকাল করে,
ডামাডোল পেড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া, শিক্ষে ধোরে
ভিক্ষে করে বেড়াই সবে।

এ কবিতা কবির যুগমানসের বাঙ্ময় প্রকাশ, তাঁর উত্তেজনাধর্মী প্রাথমিক চিত্তবৃত্তির তির্যক অভিব্যক্তি।

ঈশ্বর গুপ্তের সমাজচিন্তা নিয়ে অনেকগুলি লঘুচপল কবিতার জন্ম।। কৌলীন্যপ্রথা তাঁর মনোহরণ করেনি, স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে চিরাচরিত আদর্শের বিকৃতিতে তাঁর অন্তর হয়েছে ব্যথিত, সাহেবিয়ানার অনুকরণ ও দিশি আচারের অবজ্ঞায় তিনি ছিলেন মর্মাহত। জমিদারদের অনাচার, নির্বিচার গোহত্যা, খৃষ্টানদের কার্যকলাপ ও ইয়ংবেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা ঈশ্বর গুপ্তকে যন্ত্রণায় হাসিয়েছে। কিন্তু বিদ্রূপের শানানো অস্ত্র হাতে নিয়েও তিনি চোখ বুজে ছিলেন না, তাই তাঁর কবিতায় একটা অবজেকটিভ্ দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃ- রূপায়ণ আমাদের খুশি করে। বিজাতীয় শিক্ষায় আমাদের অসূর্যম্পশ্যারা আলোতে এসেছেন, কিন্তু সেই আলোকিত রূপ—

শ্বেতপদে শিলিপর, শোভা তায় মাখা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে, গলদেশ ঢাকা॥

* * *

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে॥

এদেশের নসী, যশী, ক্ষেমী ও রামীদের পরিবর্তনের ছবি এখানে তির্যক হলেও সুস্পষ্ট। কোথায়ও কোন আব্ছা ভাব নেই, কবির অনুভূতি সর্বত্রই সাকার হয়ে উঠেছে। ভাবী সমাজে নারীর চালচলনও তাঁর কল্পনায় রূপরসবিশিষ্ট—

লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া!
ঠাটঠমকে চালাক চতুর

সভ্য হবে থোড়া থোড়া !
আর কি এরা এমন করে
সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে ?
আর কি এরা আদর করে
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে ?

এতো গেলো চোখের দৃষ্টির কথা। তার সঙ্গে রসনার যোগ হয়েছে যেখানে, সেখানে যেন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের আসর বসে গেছে। নয়ন দিয়েছে রূপ, জিভ দিয়েছে রস—স্পর্শ ও শ্রবণও নির্লিপ্ত থাকেনি। কবির নানা ইন্দ্রিয়ের এই ভোজসভায় একালের সূক্ষ্মদর্শী সুরসিকের হয়তো ডাক পড়বেনা—কারণ এতে একটা অমার্জিত স্থূলতা আছে, কিন্তু ভোজনবিলাসীরা একেবারে অভুক্ত থাকবেন না। ঈশ্বর গুপ্ত সে সব জায়গায় ছবি এঁকেছেন—শুধু চোখে-দেখা ছবি নয়, আঘ্রাণ, আস্বাদ, অনুভব ও শ্রবণের ছবিও।

(১) রসভরা রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥

* * *

তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান।
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান॥
(পাঁটা)

(২) অপরূপ হেরে রূপ, পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক, গন্ধে পেট ভরে॥
(তপস্যা মাছ)

(৩) রূপের সহিত গুণ, সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে, ত্রিভুবনময়॥
নাহি করে মুখভঙ্গি, কথা নাহি কয়।
সৌরভ গৌরবে দেয়, নিজ পরিচয়॥
(আনারস)

আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। ঈশ্বর গুপ্তের অবজেকটিভ্

দৃষ্টিভঙ্গি, বস্তুনির্ভর সহজ বুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সাধারণ জন-সুলভ কৌতুকপ্রিয়তার অনেক উদাহরণ দেখলাম। ভালোমন্দ মিশিয়ে এই হচ্ছে আমাদের জীবন ও সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং সেই ঐতিহ্য আত্মসাতের কাজে সেকালে গুপ্তকবির জুড়ি নেই। তবে যুগধর্মের মধ্য থেকে নতুন মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের নতুন উপকরণ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গপ্রবণতার উৎস তিনটি। আগে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নিরাসক্তির কথা বলেছি। বিশেষ করে নারীর সঙ্গসুখের অভাব থেকে যে নিরাসক্তির জন্ম, তা তাঁকে খানিকটা পরিমাণে বিদ্রূপের পূজারী করে তুলেছিলো। দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রবহমাণ জনজীবনে একটা পরিহাসপ্রবণতা ও রঙ্গ-প্রিয়তার সরস স্বাস্থ্য আছে। সেই সরসতার প্রকাশ দেখি বিজয় গুপ্তের ভিখারী শিবের শ্বশুরালয়ে আসার বর্ণনায়, মুকুন্দরামের মুরারী শীল, ভাঁড়ু দত্ত ও মাছের মুড়োর জন্য মেয়েমানুষের বিড়ালের পেছনে পেছনে ছোটার ছবিতে। জনজীবনের এই পরিহাসপটুতার অনুশীলিত রূপই ফুটে উঠেছে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে। কিন্তু কবিওয়ালারা ভারতচন্দ্রীয় মার্জিত হাস্যরসকে আবার স্থূল রূপেই ব্যক্ত করেছেন তাঁদের গানে। ঈশ্বর গুপ্ত এসবই জানতেন, জানতেন—'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তব রঙ্গভরা।' তৃতীয়তঃ সমকালীন শিক্ষিতদের অনাচারপ্রিয়তা ও অশিক্ষিত বাবুসমাজের বিলাস-ব্যভিচার তাঁকে মর্মের দহনে দগ্ধ করেছে, তাঁর মধ্যে জ্বালা ধরিয়েছে—তাই তিনি খেলেছেন স্যাটায়ারের তরবারী খেলা। এই স্যাটায়ার,—তার ঢঙ ও লক্ষ্য কিছুটা আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত, বিদেশী রীতিসম্মত। ঈশ্বর গুপ্তের আধুনিকতা এই স্যাটায়ারে যতটা স্বপ্রকাশ, ঠিক ততটা পরিমাণে তাঁর লেখায় নতুন ঐতিহ্যের স্বীকৃতি।

তাছাড়া পরিহাসচ্ছলে তিনি তাঁর কাব্যে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা এতকাল বাঙলা সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয়

ছিলো। নিধুবাবুর বিশুদ্ধ প্রেমের গানের আধুনিকতা বাদ দিলে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গমূলক কবিতার বিষয় প্রথম আধুনিকতার পরিচায়ক। রসিকতার সূত্রে সাহিত্যে তার অনুমোদন, তবু তার মূল্য কম নয়। তপ্‌সী মাছ, পাঁটা, আনারস ও পৌষপার্বণের পিঠে-পুলি নিয়ে যে কবিতা লেখা যায় একথা গুপ্তকবির আগে কে ভেবেছে? সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর যুগধর্মী আধুনিকতা অনস্বীকার্য। যদি এর পেছনে সত্যিকারের প্রগতিশীল মন কাজ করতো, তাতে আমরা আরও বেশি খুশি হতাম; কিন্তু যা পেয়েছি তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি।

বিষয়গত আধুনিকতা ঈশ্বর গুপ্তের নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর কবিতার আবহাওয়ায় মুক্ত মাঠের মিষ্টি হাওয়া নয়, নগরের দেয়াল-ঘেরা সঙ্কীর্ণ হাওয়া ছড়িয়ে আছে। তিনি মানুষকে দেখেছেন রাজপথের দীপের মিছিলে, ইট-পাথরের বাড়ির গবাক্ষ-লণ্ঠনের আলোয়;—তার চোখ ঠিক দেখেও দেখেনি বেলাশেষের নারকেল পাতায় সূর্যের পতাকা, সাত সকালে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরে বনতুলসী আর ঘেঁটু ফুলের স্নান। শৈশব থেকেই তিনি বড়ো হয়েছেন সেই সহরের বুকে—যেখানে 'poverty and pride side by side'। তাই ঈশ্বর গুপ্ত রাঢ়ের গেরুয়া মাটির মুকুন্দরাম নন, মৈমনসিংহ গীতিকার গ্রাম্য কবিও নন, তিনি নিতান্তই নাগরিক কবি। বাঙলা সাহিত্যে তিনি ছড়িয়ে দেননি ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ আর ভিজে মাটির মতোই নরম মনের সুবাস। ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজ রাজত্বে গড়ে-ওঠা আথিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র কলকাতার নাগরিকতার প্রথম ভাষ্যকার। তাঁর আমলেই বাঙলা সাহিত্য সর্বতোভাবে নগরকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

স্মরণ করুন,—

ঢল ঢল ঢল ঢল, বাঁকা ভাব ধোরে।
বিবিজান চলে যান, লবেযান কোরে॥

সাড়ীপড়া এলোচুল, আমাদের মেম।
বেলাক নেটিব লেডি, শেম শেম শেম ॥

গুপ্তকবির কবিতায় বেহুলা, লহনা, খুল্লনা ও রম্ভাবতীর বদলে এ কাকে দেখলাম ? ইনি হচ্ছেন নাগরিক বাঙলার নারী সমাজের আধুনিকতম প্রতিনিধি ঊর্মিলা, অচলা, কেটি আর মক্ষিরাণীর পূর্বপুরুষ। ঈশ্বর গুপ্তের বাঁকা চোখের তির্যক আলোয় যাদের প্রথম অভিষেক, আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যে তারাই আজ স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিতা।

আর ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় নাগরিক বাঙলার প্রথম দিকের পুরুষ-প্রতিনিধিকে দেখুন—

যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরেজী কয় বাঁকাভাবে।

*   *   *

হোয়ে হিন্দুঁর ছেলে, ট্যাঁসের চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।

আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে কবি যা দেখতে পাবেন বলে মনে করেছিলেন, আজ আমরা সহরের পথে ঘাটে, সাহিত্যের আনাচে কানাচে তাদের নিত্যই দেখছি।

নাগরিক বিষয়বস্তুতে নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ স্বাভাবিক, কিন্তু গ্রামীণ বিষয়ে নাগরিকতার ছাপ আরও বেশি তাৎপর্যময়। আগে দেখেছি, বর্ষার প্রস্ফুটিত শেফালিকা কবির নয়ন আকর্ষণ করেছে, কিন্তু সেই সুশোভন ফুলের লতায় লপেটার উপমা আবিষ্কার ঈশ্বরচন্দ্রের নাগরিক মনের কারসাজি। ধরা যাক পৌষ-পার্বণের পিঠে-পুলির রসের কথা। সে রসের ভিয়েনে বুড়ো কর্তা থেকে তরুণী-পরিবৃত জামাইয়ের ভিড় আমাদের পল্লীবাঙলার রসনা-বিলাস স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত 'সহরের কেনা দ্রব্যে' পৌষ-পার্বণের জাঁক বাড়াতে ভোলেন নি—

প্রবাসী পুরুষ যত, পোষড়ার রবে।
ছুটি নিয়া ছুটাছুটি, বাড়ী এসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে, বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেয়েদের ডাক॥

|আসল কথা, গুপ্তকবির রসভোজের নিমন্ত্রণে সহর-নগর বাদ পড়েনি। পল্লীগ্রাম এখানে নায়ক, কিন্তু সহর-নগর উপনায়ক না হোক অন্ততঃ সমাদৃত অতিথি তো বটেই। সমস্ত বর্ণনার মধ্যেই, আমার মনে হয়েছে, একটা প্রচ্ছন্ন যন্ত্রণা আছে, একটা বেদনাভর সূক্ষ্ম ধ্বনি আছে। এবং সেই ব্যঞ্জনা নাগরিক জীবনের অভাববোধ থেকে উৎসারিত।|

|এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় একটা নগরচেতনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিব্যক্তি দেখতে পাই। যুগ-যন্ত্রণা মাত্রই মানুষের আধুনিক বোধের বৃন্তে জন্ম নেয়; গুপ্তকবি যতখানি যুগ-যন্ত্রণার কবি, ততখানিই তিনি আধুনিক। তাঁর আমলে যুগ-যন্ত্রণা বিদেশী শাসনপুষ্ট নাগরিক সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে জড়িত, তখনকার আধুনিকতা নাগরিকতারই নামান্তর মাত্র। অচৈতন্য থেকে চৈতন্যের দিকে, অনুভূতি থেকে বুদ্ধির দিকে, স্বভাবসৌন্দর্য থেকে বৈদগ্ধ্যের দিকে আমাদের উত্তরণের ইতিহাস আসলে গ্রামীণ সংস্কৃতির নাগরিক সংস্কৃতিতে পরিণতির কাহিনী। গুপ্তকবি সেই যুগসন্ধির ঐতিহাসিক মুহূর্তে নাগরিকতাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন ঐতিহ্যের নতুন উপকরণ হিসেবে। নতুন মূল্যবোধ, ভুললে চলবেনা, ঐতিহ্যের বিরোধী নয়, বরং তারই পরিপূরক।|

ঈশ্বর গুপ্তের এই নাগরিকতা তাঁর সর্বব্যাপী মানবিকতারই যুগানুগ অভিক্ষেপ (projection) ছাড়া কিছু নয়। কালের পথে চলতে চলতে কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সভ্যতা নাগরিক সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে, মানুষ হয়ে উঠেছে বুদ্ধিবৃত্ত। কৃষিসভ্যতার আশ্রয়ে মানুষের হৃদয়বোধ ও সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ, কিন্তু

নাগরিক সভ্যতায় মানুষের বুদ্ধির অনুশীলন। ঈশ্বর গুপ্ত বুদ্ধিবাদী কবি; সামাজিক ব্যঙ্গে তিনি যে ধারালো অস্ত্রের সৈনিক, বুদ্ধির ঘর্ষণেই তাঁর তীক্ষ্ণতা ও ঔজ্জ্বল্য। উইট্ আর স্যাটায়ার যদি বুদ্ধির ব্যায়াম-কৌশল (intellectual exercise) বা বপ্রক্রীড়া, তবে সমকালীন নাগরিকতা থেকেই তার ঐশ্বর্য ঈশ্বর গুপ্তে সঞ্চারিত। কিন্তু তাঁর নাগরিকতার পশ্চাতে ছিলো মানবিকতার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত। তার প্রমাণ আছে গুপ্তকবির সামাজিক ব্যঙ্গের অভ্যন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধে। তিনি চেয়েছিলেন দেশের মানুষ সুস্থ থাকুক, স্থিতধী থাকুক, সুখী হোক, জাতীয় লক্ষ্যের অনুবর্তী হোক। যেখানে দেখেছেন এই কল্যাণকর আদর্শের ব্যভিচার, সেখানেই তাঁর বেদনাবোধ বিদ্রূপের তির্যক ভঙ্গি নিয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের আর্তনাদ শুনতে পাই—

মনের মানুষ কোথা পাই ?
মানুষ যদ্যাপি হবে ভাই !
যাহা বলি কর তবে তাই,
দ্বিপদ হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা,
জগতে মানুষ কেহ নাই !
মনের মানুষ কোথা পাই ?

তবে একথা ঠিক, গুপ্তকবির মানবিকতা কখনও বিশ্বপ্রেমে উল্লসিত হয়নি, তা জাতীয় প্রেমের কুণ্ডসীমায় আবর্তিত। তাই বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুর তাঁর চোখে বড়ো, মাতৃ-ভাষার প্রতি অনুরাগের সোচ্চার ঘোষণায় তিনি মুখর, স্বদেশের চিন্তায় তাঁর মনে ঘনিয়ে আসে স্বপ্ন—

স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥

ঈশ্বর গুপ্তের এই স্বদেশপ্রেম বাঙলা কাব্যে নতুন সুর, কবির

ঐতিহ্য-চেতনার আধুনিক পরীক্ষা, বিদেশী ভাবের স্বাদেশিক আত্তীকরণ।

এ আলোচনা থেকে মনে হবে, বৃহত্তর বা সীমাবদ্ধে অর্থে মানুষ ঈশ্বর গুপ্তের ধ্যানের বিষয়, জ্ঞানের বিষয় ও প্রেমের বিষয়। তাঁর ভাব-ভাবনা মানবকেন্দ্রিক, তাঁর দৃষ্টি ধূলি-ধূসর মৃন্ময় পৃথিবীর দিকে। তাঁর প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলি যেন তাঁর মানবধ্যানী চিত্তের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল—তাতে রসশাস্ত্রসম্মত ব্যক্তিচেতনাবিহীন বৈষ্ণবীর প্রেমের আধ্যাত্মিকতা নেই, মঙ্গলকাব্যের গার্হস্থ্য প্রেমের গতানুগতিকতাও নেই; তাতে আছে লোকসাহিত্যে উজ্জীবিত স্বাধীন ব্যক্তিপ্রেমের উত্তরসাধনা, নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীতের শুদ্ধ ব্যঞ্জনা। কিন্তু তাঁর পারমার্থিক ও নৈতিকবিষয়ক কবিতাগুলিতে তিনি ভিন্নতর ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন, তাতে স্পষ্টতঃই প্রত্যক্ষের অতীতে তাঁর অভিসার ঘটেছে। তাই অনেকে মানবিক তাৎপর্যের বাইরে এক অধ্যাত্মরঞ্জিত সত্যদর্শনের মধ্যেও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে প্রয়াসী।|

কিন্তু আমার মনে হয়, ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে এ সত্য বিচার নয়। মানবস্বীকৃতির অর্থ কি ঈশ্বরবর্জন? না, কখনই নয়। যদি তাই হতো, তবে য়ুরোপে রেণেসাঁস-যুগে ধর্মের নব অভ্যুত্থান ঘটতো না। আসল কথা, ডিভাইন-কেন্দ্রিক চিন্তাধারায় ঈশ্বরই জীবনের আদি ও লক্ষ্য, সমস্ত মানবিক কর্মকৃতির উৎস, মানুষের একমাত্র নিয়ন্ত্রণী শক্তি। কিন্তু রেণেসাঁসের পর থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরে এলো মানবশক্তির ওপর, মানবসমাজকে ঘিরেই চলতে লাগলো আমাদের চিন্তা ও কর্মের স্রোত। তাতে আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বর-বাদের একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিন্তু লোপ পায়নি।।আসল কথা, জোরটা (emphasis) সরে এসেছে ঈশ্বরের দিক থেকে মানুষের দিকে।||এই কারণেই ঈশ্বর গুপ্তের পারমার্থিক কবিতাগুলি তাঁর মানবধ্যানী দৃষ্টিভঙ্গির (humanistic outlook) পক্ষে নঙর্থক নয়।|

রেণেসাঁসের আমলে হিউম্যানিজম-এর যাদুস্পর্শে ঈশ্বরচিন্তায় পরিবর্তন দেখেছি য়ুরোপে। ঈশ্বর গুপ্তের ভগবৎ-চেতনায়ও তেমনি অভিনবত্ব আছে। তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন রূপের মধ্যে নয়, রূপাতীতে—বহুরূপে নয়, অদ্বৈতরূপে। এই একেশ্বরবাদের ভাবনা যুক্তিধর্মী, নবযুগের নতুন চিন্তার অনুগামী—রামমোহনের প্রসঙ্গে আমরা তা দেখেছি। শাস্ত্রে যা-ই থাক, আমাদের জীবনে একেশ্বরবাদের প্রভাব এতকাল দেখা যায়নি। খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে একত্ববাদকে, পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের পাশে ইসলামী অদ্বৈতবাদকে এবং বেদ-বেদান্তের জটিল ধর্মতত্ত্বের মধ্য থেকে ব্রহ্মবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে সমকালীন আধ্যাত্মিকতা তারই সংস্পর্শে ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বর-ভাবনায় নতুন চিন্তার ছায়াপাত। এখানে স্মরণ রাখতে হবে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত ও তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা। সে যা-ই হোক, ব্যক্তিগত বোধ ও বুদ্ধিতে ভগবৎ-সত্তাকে গ্রহণ করে গুপ্তকবি মধ্যযুগের প্রথানুগত্য ও ভক্তিরসমদিরতা থেকে নিজের অধ্যাত্মচেতনাকে উদ্ধার করেছেন, নির্গুণ অরূপের বন্দনায় দেশজ ধর্মঐতিহ্যের নতুন উপকরণের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁর নীতিবিষয়ক কবিতায়ও শাশ্বত সত্য নয়, চিরকালের আদর্শ নয়, নিজের দেশকালের সীমায় দুর্নীতিগ্রস্ত ও আদর্শভ্রষ্ট মানুষের জন্য কতকগুলি জীবন ও চরিত্রনীতি (code of conduct) নির্দেশিত। বলা বাহুল্য, তা-ও বাঙলাদেশের নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যে বিধৃত।

॥ ৩ ॥

একালের রুচিরসে গুপ্তকবির কবিতা হালে পানি পায়না। তার কারণ, তাঁর কবিতার আঙ্গিক, ভাবধারার প্রকাশরীতি।

অলঙ্কারশাস্ত্রের ফতোয়ায় ভাব ও রূপ অবিচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গি, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় এই শাস্ত্রীয় ফতোয়ার সমর্থন নেই। উনিশ শতকের নতুন চিন্তা তাঁর লেখায় দানা বেঁধেছে; যদিও বিদ্রোহের রাজটীকা ললাটে নিয়ে তারা আত্মপ্রকাশ করেনি, তবু নতুন ঐতিহ্যের পরিচয়ে নব্যকালের দৃষ্টিদিগন্ত তাতে সমুদ্ভাসিত। অবশ্য পুরো নয়, আংশিক; অভিনব ঢঙে নয়, বাঙালিয়ানার ঢঙে। কিন্তু আঙ্গিকে সেই পরিবৃত্তির ছোঁয়া নেই, নেই একালের জিজ্ঞাসার বহিরঙ্গীয় রূপ। প্রত্যেক চিন্তা বা অনুভূতিরই একটা আত্মসাধন-পন্থা আছে—স্বনিষ্ঠ ছন্দ, রঙ ও রেখায় তার বিশিষ্ট দ্যোতনা। এই ভাব ও রীতির পারস্পরিক মিশ্রণ—বৃত্তিসঙ্করতা—অনুপস্থিত বলেই ঈশ্বর গুপ্তের কলাকীর্তি হাল আমলে চিদ্‌ঘন আনন্দের সৃজন করেনা, রূপের বাধা ভাবের বেসাতিতে বিভ্রান্তি আনে। আত্মবলয়ের এই কলঙ্ক-চিহ্ন কবির স্বকৃত অপরাধ। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, ভাবের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নিছক বাঙালিয়ানা ও দেশজ ঐতিহ্যপ্রীতিও শিক্ষিত পাঠকের কাছে অপরাধের নামান্তর। বঙ্কিম তা বুঝতে পেরেছিলেন—'খাঁটি বাঙ্গালী কোথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।...মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না, জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।' অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্ত অকালে জন্মেছিলেন, নব্যশিক্ষিতদের নবতর রুচির পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন—কিন্তু সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। এই অকালবোধন ছাড়া গুপ্তকবির আরেকটি অপরাধ—তাঁর রুচির স্থূলতা। শিক্ষিত সমাজের নিরালম্ব ভাববিলাস ও কৃত্রিম রুচি-বৈদগ্ধ্যের পটভূমিতে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার রসনারোচন মালমসলা গ্রাম্য ও অমার্জিত মনে হবে, সন্দেহ কি।

গুপ্ত কবির কাব্য বহিরঙ্গে গতানুগতিক ও ব্যক্তিচিহ্নবর্জিত। পয়ার ও ত্রিপদীর বহুশ্রুত ধ্বনিতে যাঁর শ্রবণবিলাস, প্রথাসিদ্ধ

বর্ণনায় যিনি খোঁজেন পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ, যমক-অনুপ্রাসের ঘণ্টারব যাঁর কাছে কলাসঙ্গীত—তিনি রসবেত্তা শিল্পী নন, রূপের অঙ্গনে সিদ্ধকাম পুরোহিত নন,—তিনি সৃষ্টির আসরে অনিপুণ কারিগর (unskilled labour) মাত্র। সন্দেহ হয়, প্রকৃত কবিত্ব কাকে বলে তা তাঁর অজানা ছিলো। আর তাঁর স্বভাব-কবিত্বও ছিলো যতটা সাংবাদিকতাধর্মী, ততটা সৃষ্টিধর্মী নয়। সৌন্দর্য কবিমাত্রেরই অনন্য সাধনা এবং সেই সাধনার সার্থকতা ভাব ও রূপের সুঠাম সামঞ্জস্যে, বাক্যের পাদপীঠে সুন্দরের ধ্যানমগ্নতায়। কিন্তু গুপ্তকবি কবিওয়ালাদের সাহিত্য-সতীর্থ ছিলেন বলে ও সুশিক্ষার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে ঘটেনি সুন্দরের সম্মানিত অধিষ্ঠান। সে যুগে আর্টিষ্ট হওয়া কঠিন ছিলো, কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত সচেতন থাকলে অন্ততঃ আর্টিজান হতে পারতেন। 'উপমাই কবিত্ব' —একথা শুনেছি অর্বাচীন কবির বলিষ্ঠ বক্তব্যে, কিন্তু গুপ্তকবির অলঙ্কারপ্রিয়তা চিত্রধর্ম ও ভাবরসে সৌন্দর্যায়িত নয়, শাব্দিক চাতুর্য ও বাক্যকৌশলে নিকৃষ্ট কবিত্ব মাত্র।

ভাষার ক্ষেত্রেও ঈশ্বর গুপ্ত দুঃসাহসিক নন, বাঙালীর বিখ্যাত জেদের বশবর্তী। গদ্যের আধিপত্যের যুগে হুতোম ও আলালের কথ্য ঢঙ বিদ্রোহের উদ্ধত ভঙ্গি, সন্দেহ নেই; কিন্তু কবিওয়ালাদের উত্তরপুরুষ গুপ্তকবির কাব্যে খাঁটি বাঙলার সাহিত্যিক কৌলীন্য অসময়োচিত হলে হতে পারে, কিন্তু অসমসাহসিক নয়। এ যেন স্বীকৃত পুরাতনী, জনজীবনের মুখের কথার নির্বিচার অনুবৃত্তি। কিন্তু কবিওয়ালাদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের যোগাযোগ স্মরণ না রাখলে উনিশ শতকের সমগ্র সাহিত্যপ্রচেষ্টার অনুষঙ্গে এর একটা মূল্য আছে নিশ্চয়। দেশজ ঐতিহ্যের স্মৃতিবহ বস্তুমাত্রেরই ঐতিহাসিক তাৎপর্য সেই বিজাতীয়তার দিনে অনস্বীকার্য। আর ঐতিহ্যবাদ যাঁর কাব্যের অস্থিমজ্জায়, লৌকিক ভাষার অনুসরণ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙলা কাব্যে গদ্যের মতো কোন ভাষাগত আদর্শসঙ্কট দেখা দেয়নি বলেই (মধুসূদনের সময়ে কিছুটা দেখা

গেলেও ব্রজাঙ্গনায় মধুসূদন নিজেই যেন কমন্ স্পীচের দিকে অনেকটা ঝুঁকেছিলেন—তাই মেঘনাদবধের ভাষা পায়ের তলায় মাটি পায়নি) ঈশ্বর গুপ্তের কথ্য শব্দমালা ও বাগ্‌ভঙ্গিকে ততটা মর্যাদা দেওয়া যায় না।

৯ রঙ্গলাল

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনাধুনিক বাঙলা কাব্যের শেষতম কবি, প্রাক্-ইংরেজী যুগের সাহিত্যিক রুচি ও মর্জির কনিষ্ঠ প্রতিনিধি। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর আগেই তাঁর 'পদ্মিনীর উপাখ্যানের' জন্ম—এ শুধু একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, কবির জন্মপত্রিকার অমোঘ নির্দেশও বটে। পুরনো আমলের কাব্যরীতির অবসান উনষাট সালে—গুপ্তকবির মৃত্যুতে, মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভবের' আত্মপ্রকাশে। রঙ্গলাল সেই ক্রান্তিকালের শেষ পশ্চাদ্‌পট, পূর্বায়ত কাব্যকলার অন্তিম অভিক্ষেপ। এবং নতুন সাহিত্যরুচির কোল ঘেঁষে জন্মেছেন বলেই তিনি অনাধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক।

কবির সাহিত্যচিন্তায় পরিবৃত্তি (innovation) আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি আছে অনুবৃত্তি (convention)। এর কারণ খুঁজে পাই কবির পরিবেশে, তাঁর জীবনের ইতিহাসে, গুপ্তকবির শিষ্যত্বে। রঙ্গলাল আট বছর বয়সে পিতৃহীন হন, কিন্তু অপুত্রক মাতুলের স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ হওয়ায় পিতাকে হারানোর বেদনা তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। শুধু তাই নয়, তাঁর লেখাপড়ায়ও কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটেনি। প্রথমে স্বগ্রাম বাকুলিয়ার পাঠশালায়, তারপর স্থানীয় মিশনারী স্কুলে, সকলের শেষে হুগলী মহসীন কলেজে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা চলতে থাকে। এখানে ঈশ্বর গুপ্তের বাল্যকালের সঙ্গে রঙ্গলালের ছেলেবেলার পার্থক্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মাতৃহীন ঈশ্বরচন্দ্র যেখানে মাতুলালয়ের উপেক্ষায় অশিক্ষিত হয়ে রইলেন, সেখানে পিতৃহীন রঙ্গলাল জ্যেষ্ঠ

মাতুলের আনুকূল্যে এমনকি ইংরেজী শিক্ষার আশীর্বাদ থেকেও বঞ্চিত হন নি। ফলে অশিক্ষিত গুপ্তকবির ভাগ্যে ঘটলো কবিগানের অমার্জিত উত্তরাধিকার, কিন্তু রঙ্গলাল পেলেন ইংরেজী সাহিত্যের রসাস্বাদ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত রঙ্গলালের ইংরেজী শিক্ষা সাহিত্যের সোনার ফসল ফলাতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

সরকারী চাকুরে রঙ্গলালের কর্মজীবনের দুটো ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। প্রেসিডেন্সী কলেজে বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপনা তাঁর সারস্বত সাধনার অনুকূল ছিলো। এছাড়া উড়িষ্যায় অবস্থানের সময়ে উড়িয়া ভাষার চর্চা, উড়িয়া সংবাদপত্র পরিচালনা, উড়িয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন, নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা তাঁর মানসিক ঋদ্ধিলাভের সহায়ক হয়েছিলো। সাংবাদিক হিসেবেও রঙ্গলাল সেকালের অন্যান্য সাহিত্যকারের মতো স্মরণীয়। 'সংবাদ রসসাগর' এবং তার পরিবর্তিত নাম 'সংবাদ সাগর' সম্পাদনা কবির প্রথম সাংবাদিক প্রয়াস। 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহের' সঙ্গেও সম্পাদক হিসেবে ও অন্যান্য সূত্রে তিনি অনেক দিন জড়িত ছিলেন। 'উৎকল দর্পণের' কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

শৈশব থেকেই রঙ্গলালের মধ্যে শিল্পরসের তৃষ্ণা দেখতে পাই। গ্রামীণ পরিবেশে সে-তৃষ্ণা তিনি মেটাতেন যাত্রাগান শুনে। কবি-গান ও পাঁচালীতে তাঁর অনুরাগও অনুমান করা যায়। প্রথম জীবনে তিনি নিজে সঙ্গীত রচনা করতেন—'কাঞ্চী-কাবেরীর' পঞ্চম সর্গের পাদটীকায় তার একটি নমুনা আছে। কলকাতার নাগরিক জীবনে সেই শৈশবের শিল্পানুরাগের প্রেরণায় তিনি অঙ্গীকার করেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব। সংবাদ-প্রভাকরের পৃষ্ঠায় তাঁর শিক্ষানবিসির প্রমাণ আজও জাজ্বল্যমান। রঙ্গলালের সাহিত্য-জীবনে প্রভাকরের প্রভা আর ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাণনার বিপরীত দিকে দেখতে পাই মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের জন্ম সাহিত্য-সঙ্গ থেকে নয়, প্রতিবেশিত্ব থেকে। সাহিত্যের

ক্ষেত্রে তাঁদের মানসিক দূরত্ব অনেকখানি বলেই এ মন্তব্য অনিবার্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমধিক অনুশীলন সত্ত্বেও রঙ্গলালের কবিমন ছিলো দেশজ ঐতিহ্যাশ্রয়ী। তাঁর মনের গড়নে বিজাতীয় চিন্তার ছাপ গভীরতর হতে পারেনি, তাঁর ভাবমণ্ডলে আসেনি কোন চমকপ্রদ প্রাকৃতিক পরিবর্তন, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও শিক্ষার সংস্পর্শে তাঁর আন্তর জীবনের বস্তুপিণ্ড কোন নতুন রূপাবয়ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। বাল্যকালেরর যাত্রা, কবিগান ও পাঁচালী এবং পরবর্তীকালের গুপ্তকবির দেশজ আদর্শই যেন হয়ে রইলো তাঁর কবিজীবনের মুখ্য প্রাণ-প্রবর্তনা। সানাইয়ের বদলে ক্ল্যারিওনেট বাজলো বটে মাঝে মাঝে, হয় তো ভোজের আসরে টেবিল চেয়ারের অধিকারও স্বীকৃত হলো—কিন্তু সদর দেউড়িতে মঙ্গল ঘটের উদ্ধত অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেয় অন্দরমহলের অবগুণ্ঠনবতীর সসঙ্কোচ শুভদৃষ্টির কথা। কবি রঙ্গলাল সজ্ঞানেই প্রাচীন রীতির অনুবর্তন করেছিলেন, প্রতিভার অপ্রতুলতার জন্য নয়।

আঠারো শ' বাহান্ন সালে বীটন সোসাইটীতে হরচন্দ্র দত্ত যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় বাঙলা সাহিত্যের নিকৃষ্টতার কথা শুনতে পাই। আসল কথা, হরচন্দ্র ও কৈলাস বসুর মতো নব্যশিক্ষিতের রসরুচি বাঙলা কাব্যের আদিরসপ্রবণতা ও অস্ফুট কবিত্বে বিক্ষুব্ধ ছিলো। কিন্তু রঙ্গলাল এই জাতীয় মন্তব্য স্বীকার করতে পারেন নি; তিনি প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ হিসেবে সোসাইটীতে 'বাঙ্গলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২) পাঠ করেন। তাতে রঙ্গলাল শুধু কবিগানই সমর্থন করেননি, ভারতচন্দ্রের কাব্যে বায়রণীয় ভাবের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন—'ইউরোপীয়া কবিতা সতী আমারদিগের সম্ভ্রমের পাত্রী, সাধ্বী এবং লজ্জাশীলা স্ত্রীলোককে কদাচ ঘৃণা এবং উপহাস করা যায় না, কিন্তু আমারদিগের দেশীয় কবিতাকে আমরা অবশ্যই

প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আদর করিব।' সমগ্র প্রবন্ধটিতে রঙ্গলালের বিশ্বাসের এই জোর লক্ষ্য করি, যেন এক খাঁটি দেশপ্রেমিকের কণ্ঠ এখানে ধ্বনিত। কখনও উৎসাহে বিদ্যাসুন্দরকে তুলনা করেছেন সেক্সপীয়ারের 'Venus and Adonis'-এর সঙ্গে, কখনও বা ভারতচন্দ্র ও ওভিদের প্রভু-প্রশস্তিতে সমধর্মিতা খুঁজেছেন। আসল কথা, রঙ্গলাল 'ইংরেজী বিদ্যাপ্রভাবে...খাট খাট রাঙ্গা চুলের' প্রিয় হতে চাননি, তিনি বরং হিন্দুনারীর 'কালসর্পাকারে বিনোদ বেণীর' প্রেমিক হতে চেয়েছেন।

এ হলো রঙ্গলালের কবিমনের এক দিক। অন্য পিঠে দেখতে পাই নানা বিদেশী সাহিত্যে তাঁর অক্লান্ত বিচরণের স্মরণ-চিহ্ন। শুধু ইংরেজ কবির সৃষ্টির সঙ্গে নয়—হোমার, পেত্রার্কা, চসার, টেরেন্স ইত্যাদি অসংখ্য সাহিত্যশিল্পীর লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো। মহসীন কলেজের ছাত্র না হয়ে যদি হিন্দু কলেজের ছাত্র হতেন, তবে হয়তো তাঁর মনের গড়নে আরও বেশি পাশ্চাত্ত্য প্রভাব খুঁজে পেতাম। তবে পরিশ্রমী পাঠক হিসেবে বিদেশী সাহিত্যের যেটুকু স্বাদ তাঁর অধিগত, তাতেই তিনি তৃপ্ত। সমসাময়িক বাঙলা কাব্যের 'অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা' তাঁর মনোহরণ করেনি; বাসবদত্তা, রসতরঙ্গিণী, দূতীবিলাস, নববিবিবিলাস আর কামিনীকুমারের আদর্শ যেখানে বিশুদ্ধ কাব্যের নয়, সেখানে কামায়নের বিপরীত দৃষ্টান্ত রূপে বিদেশী সাহিত্যে তাঁর দৃষ্টিপাত স্বাভাবিক। তিনি 'পদ্মিনীর উপাখ্যানের' ভূমিকায় লিখেছেন— 'কিশোর কালাবধি কাব্যমোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষার কবিতা কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস।...আমার এস্থলে একথা লিখনের তাৎপর্য এই যে, উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে,...আমি ইচ্ছা-

পূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি।...ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতা অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবেক...।' এ-মন্তব্য থেকে কি মনে হয়না, রঙ্গলাল পাশ্চাত্ত্য কাব্যের অনুরাগী, বাঙলা কাব্যে সেই সব অতুল ভাবধারা গ্রহণের পক্ষপাতী ?

সুতরাং রঙ্গলালের কবিচিত্তের দুই পিঠ দ্বিবর্ণরঞ্জিত—এক দিকে দিশি মাটির রঙ, অন্যদিকে বিলিতি ফুলের রেণু। তবে কি তাঁর মধ্যে চিত্তসঙ্কট ছিলো ? আমার মনে হয়, না। অন্ততঃ তাঁর লেখা ও জীবনের ইতিহাস থেকে তা প্রমাণ করা যায় না। আসলে মধুসূদনের মতো আমাদের সাহিত্যের ধারাকে নস্যাৎ করে দিতে তাঁর বিবেকবুদ্ধি সাড়া দেয়নি ; যে লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যে তিনি লালিত, তার সত্যমূল্যে তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন না। তবে বিদেশী সাহিত্যের রসাস্বাদে তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন নতুন ভাবের আহরণে বাঙলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ। সুন্দরের আগমনে যেমন হীরা মালিনীর ভাঙ্গা মালঞ্চে ফুল ফুটেছিলো, তেমনি রঙ্গলাল চেয়েছিলেন ইংরেজী সংস্কৃতির সংস্পর্শে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে নতুন ফুল ফুটুক। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেলো, কবির সৃষ্টিতে বাঙলা কাব্যের জন্মান্তর ও গোত্রান্তর দূরে থাকুক, রূপান্তরও ঘটেনি। দু'চারটে রেখার বদল বা নতুন আঁচড় কি চেহারার কাঠামো একেবারে বদলে দিতে পারে ? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমন হলো ?

তার উত্তর হচ্ছে, রঙ্গলাল বিদেশী কাব্যের কয়েকটা লক্ষণ ধরতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু তার প্রাণের নাগাল পাননি। তাঁর ঐতিহ্যবাদ ও দেশপ্রেমই সতর্ক প্রহরীর মতো তাঁর দৃষ্টিকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সদর দেউড়ি পেরিয়ে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেয়নি। সাগর পারের কবির সৃষ্টিতে যে ভাবের সাধনবেগ, যে শিল্পসম্মত প্রসাধন কলা রঙ্গলালের প্রতিভা

ও সৃজনের ক্ষমতা তা আয়ত্ত করতে পারেনি। তাছাড়া রঙ্গলালের কবিচিত্তে একটা সঙ্কোচনমুখী অহমিকা ছিলো, স্বাদেশিক মনোবৃত্তির স্পর্শকাতরতা ছিলো ;—আর তাই বিদেশী কবিদের চিন্তা ও আর্ট বাঙলা কাব্যের আত্মবলয়ে পুরোপুরি গ্রহণের বিপক্ষে ছিলেন তিনি। এ যেন এক ধরণের আত্মনিগ্রহ ; মোহ আছে, সহানুভূতি আছে—কিন্তু ঔদার্য নেই। বাঙলা কাব্যের ললাটে পাশ্চাত্ত্য কবিতার উদ্ধত রাজটীকা সাহসের সঙ্গে পরিয়ে দিতে পারেননি বলেই রঙ্গলালের কাব্যকৃতি অসম্পূর্ণ। মোহিতলাল বলেছেন—'তাঁহার আদর্শ সম্পূর্ণ দেশী ; কেবল ইংরেজী কাব্যের যে কয়েকটি রচনা-কৌশল প্রবর্তন করিলে বাংলা কাব্য, বাংলা আদর্শ বজায় রাখিয়াই একটু সুমার্জিত হইতে পারে—সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ইংরেজী ছাঁচে ঢালাই না করিয়া, অন্য জাতে জাত না দিয়া, বাংলা কবিতার চিরন্তন রূপটি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা যায়—ইহাই প্রতিপন্ন করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন ; এবং অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় আপনার কৃতিত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন।...রঙ্গলাল নবীনকে (ইংরেজী কাব্যের আদর্শ) কিঞ্চিৎ মাত্র প্রশ্রয় দিয়া তাহার সহিত নামমাত্র সন্ধি স্থাপন করিয়া প্রাচীনকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু যুগ-দেবতার নিকট সে প্রতারণা ব্যর্থ হইয়াছিল।' রঙ্গলালের সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস প্রতারণামূলক, মোহিতলালের এ-মন্তব্য আক্রোশের কথা ; এর মূলে সদিচ্ছাও থাকতে পারে। কিন্তু তাতেও রঙ্গলালের নিস্তার নেই। আমার মনে হয়, গুরু ঈশ্বর গুপ্তের মতো নির্বিবাদ ঐতিহ্যপ্রীতি ও অবজেকটিভ্ দৃষ্টিভঙ্গির অনুবর্তনই যেন রঙ্গলালের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁর রক্তে ছিলো না বিদ্রোহের উতরোল, মনে ছিলো না মধুসূদনের বাঁধ-ভাঙা উন্মাদনা—তাই সাহিত্যের নতুন দিগন্তে দৃষ্টিপাত সমসাময়িক অর্ধ-শিক্ষিত পাঠকদের মনোরঞ্জন করা সত্ত্বেও সমালোচকদের

শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে নি। রঙ্গলাল, স্বীকার করতেই হবে, নতুন কাব্যের দুর্বল নায়ক, পুরানো ঐতিহ্যের কাঙাল ভাণ্ডারী।

রঙ্গলাল পাশ্চাত্ত্য কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু সেই পরিচয়ের পরিধি বন্ধু মধুসূদনকে খুশি করতে পারেনি। রাজনারায়ণকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন—'Rangalal is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore and Scott form the highest heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what hills peep over hills—what Alps on Alps arise!' মধুসূদনের এই আশা পূর্ণ হয়নি। তবু রঙ্গলালের কাব্য কতগুলি অনাস্বাদিত রসের আস্বাদ দেয়, নতুন উপকরণের সমাবেশে অপরিচিত ব্যঞ্জনার অনুভব আনে।

কবির প্রথম কৃতিত্ব কাব্যের বিষয় নির্বাচনে। ফোর্ট উইলিয়ামী যুগ থেকে আমাদের বোধ ও বুদ্ধিতে ধীরে ধীরে ইতিহাস-চেতনার সঞ্চার—অবশ্য গাল্পিকতার ধূম্রজাল ও কল্পনার মোহাবেশ থেকে ইতিহাসবোধের মুক্তি চল্লিশ সালের আগে আসেনি। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা এই নব চেতনার উদ্বোধনে অন্যতম নায়ক। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর ইতিহাসবোধের পরিচয় দিয়েছেন কবিজীবনীসংগ্রহে আর সমসাময়িক নানা ঘটনাশ্রিত কবিতায়। কিন্তু তাঁর অনেক আগে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভবানন্দ-মানসিংহের কাহিনীতে ইতিহাসের দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত। কিন্তু ধর্মমূলক মঙ্গলকাব্যের অঙ্গ হওয়ায় অন্নদামঙ্গলের ঐতিহাসিক অংশ তাৎপর্যহীন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের কাব্যে ইতিহাসের পদক্ষেপ নতুন চিন্তা ও চেতনার স্মরণ-চিহ্ন এবং তাতে রঙ্গলালের নাম প্রথম মুদ্রিত।

আমাদের যে দৃষ্টি ছিলো কল্পিত অমরাবতীর দিকে নিবদ্ধ, তাকে শুধু ধূলি-ধূসর পৃথিবীর দিকে নয়, পৃথিবীর মানুষের দ্বন্দ্ব-জর্জর নীরস ইতিহাসের দিকে ফিরিয়ে আনা সহজ নয়। কারণ আমাদের সত্যিকারের ইতিহাস কই। বিশেষ করে বাঙলা দেশের ইতিহাস তখন পর্যন্ত অজানা। তাই রঙ্গলালের চোখ ছুটলো বাঙলা দেশের বাইরে—রাজপুতনার ঊষর মরুভূমিতে। টডের গবেষণায় ততদিনে বীরত্বের মণিমাণিক্যভূষিত রাজস্থানের কীর্তিকাহিনী শিক্ষিত সমাজের গোচরীভূত। প্রকৃতির কৃপণতায় রাজপুতদের দেশ বর্ণবিরল, কিন্তু সেখানকার মানুষের জীবনের কথা বর্ণবৈচিত্র্যময়। রঙ্গলালের ইতিহাসলুব্ধ চিত্ত খুশি হলো, তাঁর মনের নবজাগ্রত দেশপ্রেম খুঁজে পেলো তৃষ্ণার জল। কারণ রামমোহন থেকে যে নব জাগরণের পালা শুরু, তা রঙ্গলালের সময়ে একটা রাষ্ট্রচেতনায় মুখর হয়ে উঠে। মূলতঃ ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে, গৌণতঃ নানা পারিপার্শ্বিক কারণে আমাদের সেই রাষ্ট্র-চেতনা পরিণত হয় স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধে। পরাধীন আয়র্ল্যাণ্ডের কবি টমাস মূর রঙ্গলালের প্রিয় কবি হয়ে ওঠেন। এমনিতর অবস্থায় বিস্তারমুখী মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামরত রাজপুতদের কাহিনী বাঙালী কবির মনোহরণ করবে, তাতে সন্দেহ কি। তাই 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২) ও 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮) সমকালীন বাঙালীর স্বদেশ-চেতনা ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় প্রকাশ, মূর্ত প্রতীক।

ইতিহাসাশ্রিত বাঙলা কাব্যরচনা রঙ্গলালের প্রধান গৌরব। দেশপ্রেম সেই গৌরবের অঙ্গভূষণ, রাজকণ্ঠে মণিমালার মতো। নিছক ইতিহাস তো নীরস কঙ্কাল মাত্র, কবির তাতে কিছুমাত্র লোভ থাকতে পারে না। কিন্তু সেই রহস্যাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি সুখ দুঃখের বিচিত্র দোলা সৃষ্টি করা যায়, যদি বিস্তার করা যায় ছল-চাতুরী আর ষড়যন্ত্রের মাকড়সার

জাল, পুরুষের বীর্যের সঙ্গে যদি মিশিয়ে দেওয়া যায় মনো-বিলাসিনীদের চতুরালি তবে ইতিহাসের ঘন অন্ধকারে রোমান্সের মায়া ছড়িয়ে পড়ে। কবি আর ঔপন্যাসিকের লোভ সেই রোমান্স-রসে। রঙ্গলাল বাঙলা কাব্যে ইতিহাসের ধূসর অবগুণ্ঠনের তলায় প্রথম রোমান্সের মায়াঘন রূপ ফুটিয়ে তোলেন। অবশ্য ইতিহাসের অঙ্গে অঙ্গে আবেগ ও উচ্ছ্বাস সঞ্চার করিতে গিয়ে তিনি স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রই উচ্চারণ করেছেন, বঙ্কিমের মতো নারীপ্রেমের নয়। তাছাড়া দুর্গেশনন্দিনীর স্রষ্টার প্রতিভা তাঁর ছিলো না, তাই তাঁর রোমান্টিক মানসপ্রবণতা 'প্রত্যূষান্ধকারে অকাল জাগ্রত একক বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলির ন্যায় অপূর্ণকণ্ঠ ও দ্বিধাগ্রস্ত।' সুন্দরীশ্রেষ্ঠা পদ্মিনী যেখানে স্বামীকে উদ্ধার করতে শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করেছেন, কিংবা স্বামীর পরাজয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন—সেখানে নাটকীয় চমৎকারিত্ব ও ঘটনাগত রোমান্স সৃষ্টির অবকাশ ছিলো। কিন্তু রঙ্গলালের কল্পনা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। 'কর্মদেবীতে' নায়ক সাধুর মল্লযুদ্ধ ও মাণিকদেবের কন্যার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ রোমান্সের সম্ভাবনায় ভরপূর, কিন্তু কবি তার উৎসমুখ পুরোপুরি খুলে দিতে পেরেছেন কি? 'কাঞ্চী-কাবেরীতে' উপপত্নীর সন্তানের রাজ্যলাভ, রাজাকে চণ্ডালের কাজ করতে দেখে কাঞ্চীরাজের কন্যাদানে অস্বীকৃতি, রাজার চণ্ডালের সঙ্গে পদ্মাবতীর (কাঞ্চী-রাজকন্যার) বিবাহ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ও যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে নিজের রাজ্যে আগমন ইত্যাদি ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে প্রচুর রোমান্টিক উপাদান আছে। সেই সব উপাদান নাটকীয় পরাকাষ্ঠায় দানা বেঁধে উঠেছে সেই মুহূর্তে যখন পদ্মাবতীকে দেখে রাজার মন মুগ্ধ হয়ে গেলো, অথচ চণ্ডালের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মন্ত্রী যেভাবে সঙ্কটের সমাধান করলেন তাতে রোমান্সের জয়জয়কার। কিন্তু এই কাব্যটিতে রোমান্টিকতার অধিকতর স্ফুরণ সত্ত্বেও রঙ্গলালের সৃষ্টিতে

রোমান্টিক চিত্তের অস্ফুট কাকলিই আছে, অবাধ আনন্দগান নেই।

রঙ্গলালের কাব্য পড়বার সময় আরেকটি দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। নারীনামবিজড়িত কাব্যের নামকরণ আধুনিক যুগের লক্ষণ এবং রেণেসাঁসের অন্যতম ফলশ্রুতি। য়ুরোপে রেণেসাঁসের সোনার ফসলের যুগে আমরা দেখেছি নারীসত্তার উদ্বোধন ও স্বমহিমায় তার প্রতিষ্ঠা। রঙ্গলালও রেনেসাঁসেরই সন্তান, তাই ইতিহাসের ঘোলা জল থেকে নারীকে উদ্ধার করে কাব্যে তাঁর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। দেবীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক প্রাচীন কাব্যের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য আছে। অবশ্য বাঙলা কাব্যে নারীচিত্তের রহস্যঘন সৌন্দর্যের প্রকাশ মধুসূদন পর্যন্ত অপেক্ষিত।

বিষয়-ভাবনায় রঙ্গলালের মৌলিকতার সঙ্গে বর্ণনায় তাঁর কিছুটা নূতনত্ব স্মরণীয়। ঈশ্বর গুপ্তে অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গির আধিপত্য অনাধুনিক বাঙলা কাব্যের বস্তুতান্ত্রিকতা ও স্থূল জীবন-রস-রসিকতার স্মৃতিবহ। এই ইন্দ্রিয়গম্যতা ও প্রত্যক্ষতার অনুগামী কবিদৃষ্টি হাল আমলে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী (introspective) হয়—তার প্রথম সার্থক প্রকাশ বিহারীলালে। ইতিপূর্বে রঙ্গলালেই তার অস্পষ্ট সূচনা। আমাদের প্রাচীন কাব্যে, এমন কি গুপ্তকবির কবিতায়, প্রকৃতির অন্তর্লীন সৌন্দর্যের জয়-ঘোষণা নেই। স্থায়ী ভাব বা সঞ্চারী ভাব উদ্দীপনে প্রকৃতির নেপথ্য-ভূমিকায় প্রাচীন বাঙালী কবিদের অবিশ্বাস ছিলো না, গৌণভাবে বর্ণনীয় বিষয়ের ভাবানুষঙ্গে প্রকৃতির অস্তিত্বও তাঁরা অস্বীকার করেন নি, তবু তাঁদের নিসর্গ-দর্শনে সূক্ষ্মদর্শিতা ও রহস্যের ব্যঞ্জনা কই! সংস্কৃত কাব্যের মতো মানব-মনের সঙ্গে প্রাকৃতিক লীলাবিলাসের নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপনে তাঁরা পরান্মুখ, ইংরেজী কাব্যের মতো প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বা জীবন্তসত্তার আবিষ্কারও তাঁদের ক্ষমতাতীত। নিতান্ত বস্তু-

নির্ভর বর্ণনা ও অলঙ্কারের খোঁচায় প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন রস উৎসারিত হতে পারে না। এমনি অবস্থায় রঙ্গলালের নিসর্গচিত্রে যেটুকু মনোগোচর সৌন্দর্য প্রতিভাত, তাতেই কবি প্রসংশার্হ। তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-কোলরিজ পড়েন নি, পড়েছেন ড্রাইডেন, পোপ, গোল্ডস্মিথ, গ্রে, মিল্টন, স্কট, মূর, বায়রণ প্রভৃতির কাব্য। তাই তাঁর খণ্ড কবিতা ('শরৎ, 'পদ্মপুষ্পের প্রতি' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) ইংরেজী ode জাতীয়, খাঁটি লিরিক নয়। সংস্কৃতের প্রকৃতি-বর্ণনা ও বাঙালী কবির স্বভাব-কবিত্বও তাঁর মনে ছিলো সক্রিয়। এই সমস্ত কথা মনে রেখে রঙ্গলালের প্রকৃতির বর্ণনা পঠনীয়।

(ক) আহা এইরূপ শোভা অতি অপরূপ !
উথলয় ভাবুকের কি ভাবনাকূপ !
সরসী সরিৎ সিন্ধু শেখর সুন্দর।
গহন গহ্বর বন নির্ঝর নিকর ॥

—পদ্মিনীর উপাখ্যান।

(খ) যথা ঘোর অমানিশা তমঃ পূর্ণ দশদিশা
আকাশে জলদ আড়ম্বর,
মেঘহীন একদেশে বিমল উজ্জ্বল বেশে
দীপ্তি দেয় তারকা সুন্দর।

—পদ্মিনীর উপাখ্যান।

(গ) দিবা অবসান হয় নভো লোক তমোময়
ধূসরবরণা দিগঙ্গনা।
স্থির নেত্রে দেখা যায় শোভা পায় দীপপ্রায়
দুই এক তারা খ-ভূষণা।
যেন নায়িকার আশে প্রেমিকা হৃদাকাশে
দুই এক ভরসার ভাতি।

—কর্মদেবী।

(ঘ) দশদিক্ অন্ধকার, হেরি ধায় একাকিনী,
পরিপূর্ণ জলাশয় কুল।
কুল-পদ্মিনী প্রায় পুষ্করিণী শোভা পায়,
কুলটা তটিনী ভাঙ্গে কুল ॥
দম্পতি বাঁধিয়া রসে, মানসে সুখ মানসে,
মরাল মণ্ডলী ধায় দ্রুত।

—কাঞ্চী-কাবেরী।

অন্যান্য বর্ণনায়ও মাঝে মাঝে রঙ্গলালের কৃতিত্ব ধরা পড়ে। অনেক সময় ইংরেজী কাব্য থেকে তিনি বর্ণনার ঢঙ গ্রহণ করতেন, কিন্তু অনুবাদে ঘটিয়ে দিতেন মূলের জন্মান্তর! যেমন—

অতুলনা রাজকন্যা ভুবনে ভামিনী ধন্যা
অগ্রগণ্যা রূপসী সমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ কি বর্ণিব অপরূপ।
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে।
কোন মূঢ় চিত্রকরে পদ্ম দেহ চিত্র করে
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?
কিংবা সেই কোকনদে মাখাইলে মৃগমদে
অতিসুখ লাভ মধু লোভে?
কষিত কাঞ্চন কায় কিবা কার্য্য জোছনায়
কিবা কার্য্য রসানের ছটা?
কোন মূর্খ আছে কে হে দিবে ইন্দ্র-ধনু-দেহে
অভিনব রূপরঙ্গ-ঘটা।

—পদ্মিনীর উপাখ্যান।

এই বর্ণনার আদর্শ—

To gild refined gold, to paint the lily,
To throw a perfume on violet,
To smooth the ice or add another hue,
Unto the rainbow or with taper light

To seek the beauteous eye of heaven to
garnish
Is wasteful and ridiculous excess.
—King John, Shakespeare.

আখ্যায়িকা-কাব্যে রঙ্গলালের নিকট-আদর্শ স্কট, মূর ও বায়রণ। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের প্রায়-রোমান্টিকদের (Semi-Romantic) কাব্যাদর্শ তিনি সার্থকভাবে অনুবর্তন করতে পারেননি। বায়রণের অদম্য শক্তি, স্কটের অতীতাশ্রয়ী কল্পনাপ্রবণতা ও মূরের বীরত্বমণ্ডিত দেশপ্রেম রঙ্গলালের মধ্যে আশা করা যায় না। মধুসূদন কবির মধ্যে দেখেছেন—'poetical feelings—some fancy, perhaps imagination'। কিন্তু তাঁর এই 'হয়তো' শব্দটিতে যে ত্রুটির ইঙ্গিত, রঙ্গলালের কাব্যের অসার্থকতার তা অন্যতম কারণ। বস্তুতঃ রঙ্গলালের কবিত্বশক্তি ঈপ্সিত পরিমাণ ছিলো না।

বর্ণনার নৈপুণ্যে, ঘটনাধারার ক্রমবিকাশে, কাহিনী-সংগঠনে ও চরিত্র-চিত্রণে রঙ্গলালের আখ্যায়িকা কাব্যগুলি ইংরেজী আদর্শ-গুলির মতো সার্থক সৃষ্টি নয়। প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন বাঙলা আখ্যায়িকা কাব্যের রূপকর্ম ব্যাখ্যা করেছি। তার সঙ্গে তুলনা-মূলক বিচারে দেখা যাবে, রঙ্গলাল নতুন আদর্শের পূজারী। তবে 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' যে সর্গবন্ধ নয়, তার মূলে আছে প্রাচীন পন্থার অনুসরণ। 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' ও 'কাঞ্চী-কাবেরীর' সর্গবন্ধ রূপাবয়ব মধুসূদনের প্রভাব ও ইংরেজী কাব্যের আঙ্গিক সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতার ফল।

'পদ্মিনীর উপাখ্যানের' ঘটনাধারার কোন কেন্দ্রবিন্দু নেই, তাই সমগ্র কাহিনী দ্বিধাবিভক্ত। উপকাহিনীর অভাবের জন্য ঘটনাগত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য মূল কাহিনীকে পরিপুষ্ট করেনি। ফলে অজস্র বিষয়ের সমাবেশ সত্ত্বেও পদ্মিনীর উপাখ্যানে সুসংহতি ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সৌন্দর্য অপ্রকট। 'শূর-সুন্দরীতে'

আখ্যানভাগ গৌণ, একটা বর্ণনাত্মক আঙ্গিক কবির লক্ষ্য। 'কর্মদেবীতে' দেশপ্রেমের বদলে মানবপ্রেম উপজীব্য; কিন্তু ভারতচন্দ্রীয় পন্থায় এবং কিছুটা মধ্যযুগীয় ইংরেজী রোমান্সের ছকে কাহিনী বিন্যাসের ফলে রচনাগত অভিনবত্ব অলক্ষ্য। রঙ্গলালের আখ্যায়িকা কাব্যগুলির মধ্যে কাঞ্চী-কাবেরী শ্রেষ্ঠ। এতে কবিত্বের স্ফুরণ ও সৃষ্টিনৈপুণ্য সমধিক। পুরুষোত্তম ও পদ্মাবতীর চমকপ্রদ সম্পর্ক-স্থাপনের ইতিহাসে ভক্তিভাবের মাধুর্য চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

কবিতার কারুকর্মেও রঙ্গলাল প্রাচীন আদর্শেরই অনুবর্তী। সেই গতানুগতিক পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ, বহুব্যবহৃত বাগ্‌ভঙ্গি, প্রথানুগত আলঙ্কারিকতা। তাঁর উপমায় নতুন ব্যঞ্জনা নেই, ভাষায় অদৃষ্টপূর্ব চটক নেই, নেই ছন্দোগতির অনন্যতন্ত্রতা। ব্যতিরেক অলঙ্কারের চিরাচরিত কৌশল ছাড়া তাঁর রূপের বর্ণনা সিদ্ধ হয় না, কেবল অনুপ্রাসের স্পষ্টশ্রুতিতে তিনি কাব্যধ্বনি খোঁজেন, অনেক সময় কল্পনার অভাবে তাঁর গদ্যাত্মক বাক্যগুলি নদীতে পিঠ-উঁচিয়ে-দেওয়ার চড়ার মতো শুক্‌নো ঠেকে। তবে মধুসূদনের প্রভাব—বিশেষ করে উপমা-উৎপ্রেক্ষায়—পরের দিকের কাব্যগুলিতে ধরা পড়ে। যদিও বেশি নয়। রঙ্গলাল মুখ্যতঃ দীর্ঘ ত্রিপদীর কারবারী, এই ছন্দের রূপায়ণ তাঁর হাতে প্রায় নিখুঁত হয়ে উঠেছে। দশ মাত্রার অন্তরার দ্বারা দীর্ঘত্রিপদীর স্তবক রচনা তাঁর মৌলিকতা। কখনও কখনও ত্রিপদীর সঙ্কোচনে রঙ্গলাল দ্বিধা করেন নি। তাতে এক ধরণের নূতনত্বের প্রকাশ। মোট কথা, প্রাচীন কাল থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত আমাদের কাব্যের যে রূপসাধনা, রঙ্গলাল তারই উত্তরসাধক মাত্র।

পরিশিষ্ট—১

কালানুক্রমিক লেখক-সূচী

রামমোহন	১৭৭৪-১৮৩৩ খৃঃ
ভবানীচরণ	১৭৮৪-১৮৪৮ ,,
ঈশ্বর গুপ্ত	১৮১২-১৮৫৯ ,,
প্যারীচাঁদ	১৮১৪-১৮৮৩ ,,
দেবেন্দ্রনাথ	১৮১৭-১৯০৫ ,,
বিদ্যাসাগর	১৮২০-১৮৯১ ,,
অক্ষয়কুমার	১৮২০-১৮৮৬ ,,
রাজেন্দ্রলাল	১৮২২-১৮৯১ ,,
রাজনারায়ণ	১৮২৬-১৮৯৯ ,,
ভূদেব	১৮২৭-১৮৯৪ ,,
রঙ্গলাল	১৮২৭-১৮৮৭ ,,
কালীপ্রসন্ন	১৮৪০-১৮৭০ ,,

পরিশিষ্ট—২

নামাবলী

রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীহাররঞ্জন রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, মনোমোহন ঘোষ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, কাজী আবদুল ওদুদ, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরতন মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, যদুনাথ সরকার, বিহারীলাল সরকার, সজনীকান্ত দাস, হরপ্রসাদ মিত্র, হুমায়ুন কবির, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামগতি ন্যায়রত্ন, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিহারীলাল সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিনয় ঘোষ, অরবিন্দ পোদ্দার, বিষ্ণু দে, শান্তি বসু, যোগেশচন্দ্র বাগল, ভবতোষ দত্ত ইত্যাদি বাঙালী লেখক এবং অনেক ইংরেজী গ্রন্থকার।

পরিশিষ্ট—৩

নির্ঘণ্ট

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA.